THE LAST FRONTIER

by Howard Fast

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

প্রথম পত্রপুট সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৪৯



পত্রপুট

প্রকাশিকা : আরতি চক্রবর্তী, পত্রপুট, ২/৩এ রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলি-৭০০০[illegible]

মুদ্রক : প্রণতি ঘোষ, জুবিলী প্রিন্টার্স, ১২৪ অখিল মিস্ত্রি লেন, কলি-৭০০[illegible]

পিতৃদেবের উদ্দেশে

যিনি আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন—শুধু অতীতের আমেরিকাকে নয়, ভবিষ্যতে যে আমেরিকা গড়ে উঠবে—তাকেও।

এ এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে নীতির ক্ষেত্রে যা অন্যায়, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা কখনও ন্যায় হতে পারে না। এই ব্যাপারে লোকের আত্মপ্রবঞ্চনা করা স্বাভাবিক, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল সব সময়েই এই নীতির সত্যতা প্রমাণ করে থাকে। সমান-অধিকার লঙ্ঘন কখনই সেইসব প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, যাদের ভিত্তি গড়ে উঠেছে সমান-অধিকারেরই উপর।

—কার্ল শূর্জ।

কথারম্ভ

বাষট্টি বছর আগে ওকলাহোমাকে বলা হত ইণ্ডিয়ান এলাকা। অসহ্য গরম, আর রোদে-পোড়া ধুলো-ওড়া একটানা শুকনো মাটি, মরানদী, হলদে ঘাস, আর ছোট ছোট পাইন গাছ—ইণ্ডিয়ান এলাকা বললে যা বোঝায়, এও ছিল তাই।

দু'শো বছর ধরে তরুণ দৈত্যের মত একটা মহাদেশের উপর নিজেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছিল আমেরিকা, এক সমুদ্র থেকে আর-এক সমুদ্রে, এক পাহাড়-চুড়ো থেকে আর-এক পাহাড়-চুড়োয়। তা শেষ হল ১৮৭৮ সালে। ডিঙিয়ে গেল পাহাড় চুড়ো, ভরে উঠল উপত্যকা। উঠে গেল সীমান্তের প্রাচীর, আর এরই মধ্যে সে-কাহিনী হয়ে উঠল গান কি উপকথার কামনা-করুণ রেশ।

উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম—সমতল অঞ্চল বাঁধা পড়ল রেললাইনে। দু' মিনিটে তার পাঠানো যায় ফ্রিস্কো থেকে নিউইয়র্কে, দু'দিনে রেল-গাড়িতে পেরিয়ে যাওয়া যায় সমতলের এক-প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত।

উইওমিং পাহাড়ের উর্বর উপত্যকায় তাদের গরু-ছাগল সরিয়ে নিয়ে গেল টেক্সাসের মানুষগুলো, আর লাঙলের ফালে ছিটকে-ওঠা সোনা-ফলানো তামাটে মাটির স্বাদ জানতে তৃণ-প্রান্তরে ভিড় জমাতে শুরু করল সুইডেন আর নরওয়ের লোকেরা।

সময়টা সত্যি সুন্দর। সাবালক হয়ে উঠেছে একটা জাতি। বিজলি-বাতি আবিষ্কার করেছেন টম এডিসন—চিরদিনের জন্যে দূর করে দেবেন অন্ধকার। ফিরে আসছে সুখ আর সমৃদ্ধি, যে-যুদ্ধকে ভুলতে পারাই মঙ্গল—শুকিয়ে আসছে তারই মর্মান্তিক ক্ষতগুলো; উদ্বোধনী-বক্তৃতা শেষ করছেন রাদারফোর্ড বার্চার্ড হেইয়েস এই কথা বলে:

> “যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি বলের বাধ্যবাধকতার উপরে নয়, এক স্বাধীন প্রেমের ঐকান্তিকতার উপরেই এর ভিত্তি; আর সমস্ত কিছুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, শ্রেষ্ঠ ও নিশ্চিততম ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এমনভাবে, যাতে শান্তি আর সুখ, সত্য আর ন্যায়, ধর্ম আর কর্তব্যবোধ আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে বংশ বংশ ধরে।”

সম্ভাব্য সর্বকালের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। আর সেও এমন কিছু বেশি দিনের কথা নয়, আজও যারা বেঁচে আছে, অনেকেই মনে করে রাখবে সে-কথা।

একটা গোটা দেশ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার ঘূর্ণাবর্তে মহাদেশের মধ্যে একটা দ্বীপের মত হয়ে ছিল ওকলাহোমা। সীমান্তের সমস্ত প্রাচীর উঠে গেলেও একটা চক্রাকার সীমান্ত তখনো ঘিরে ছিল ইণ্ডিয়ান এলাকাটা। বহু রাষ্ট্র আর এলাকায় ভাগ-করা

এই যে দেশ, ভগবান যাকে দিয়েছেন আমেরিকার মানুষগুলোর হাতে, আর আমেরিকার মানুষেরা যাকে তুলে দিয়েছে পৃথিবীর হাতে—এ-দেশে এককালে থাকত আর-এক জাতের মানুষ। তাদের রং ছিল লালচে, আর প্রথম যে শাদা-মানুষেরা পৌঁছতে পেরেছিল পৃথিবীর এই গোলার্ধে, ভৌগোলিক জ্ঞানের কিছুটা গোলমালে তারা নাম দিয়েছিল ইণ্ডিয়ান। তারা হয়ে গেল ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ানই তারা ...

তাদের জীবন ছিল সহজ সরল; তারা শিকার করত, মাছ ধরত, কখনো বা ফলাত ফসল, আবার কখনো কখনো খুনোখুনি করত একে অন্যের সঙ্গে,—কখনো কখনো অতি সামান্য কারণে, যেমন অতি সামান্য কারণেই খুনোখুনি করত শাদা মানুষেরা। সংখ্যায় তারা বেশি ছিল না। মাথাগুণতি করত না তারা। আমরা কিন্তু হিসাব করে বলতে পারি, গত তিন শ' বছরের কোন সময়েই তিন লক্ষের বেশি ছিল না তাদের সংখ্যা। গোষ্ঠীতে, পরিবারে, এখানে ওখানে ছড়ানো গ্রামে, অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত প্রায় গোটা দেশ জুড়েই থাকত তারা।

কিন্তু একটা দোষ ছিল তাদের, ক্ষমা করা যায় না সে-দোষটা। তারা যে-দেশে বাস করত, তারা মনে করত, সে-দেশটা তাদেরই। তারা বিশ্বাস করত, এর উপর তাদের অধিকার এতখানি যে স্বচ্ছন্দে লড়াই করা যায়, প্রাণ দিতে পারা যায় এর জন্যে। যারা তাদের মানুষ-খুনের বিদ্যার বহু মার্জিত কৌশল শিখিয়েছিল, আর তারই সঙ্গে শিখিয়েছিল চুলশুদ্ধ মাথার চামড়া ছুলে নেবার ভদ্র চারু-কলা—সেই শাদা-মানুষদের গালভরা সদুপদেশও বদলাতে পারেনি তাদের এই সরল বিশ্বাসটুকু।

তাই পাল্টা লড়াই চালিয়েছিল তারা, যেমন করে পাল্টা লড়াই চালায় অসভ্য জাতের মানুষেরা। তারই জন্যে তারা লড়াই করেছিল যাকে তারা দরদ দিয়ে বিশ্বাস করত নিজেদের আবাস-ভূমি বলে, তারা হেরে গেল, কারণ তারা ছিল অসভ্য এবং, একেবারে গোড়া থেকেই তারা ছিল সংখ্যায় ভীষণভাবে অল্প। তারা হেরে ... কারণ তাদের জীবন-ধারা ছিল প্রস্তর-যুগের। অবশেষে তারা স্বাক্ষর দিল অনেকগুলো সন্ধি-পত্রে, যাতে তাদের দেশের কোন কোন অংশে তাদেরই অধিকার থাকে। কিন্তু সে-সব সন্ধি-পত্র ছিঁড়ে ফেলা হল; আর জমি বেচাকেনার কোম্পানিগুলো বিকিয়ে দিল তাদেরই জমির একর কুড়ি সেণ্ট থেকে কুড়ি ডলার—যে-কোন মূল্যে।

উপনিবেশগুলো হয়ে উঠল একটা জাতি, আর সেই জাতি পশ্চিম দিকে ছুটল এমন প্রচণ্ড বেগে, আগে কোনদিন পৃথিবী তেমন বেগ দেখেনি। যাকে আমরা সীমান্ত বলি, তা ছিল যেন ঠিক বন্যার মুখে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত। গড়িয়ে চলল সে তরঙ্গোচ্ছ্বাস, থামল গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে। আর তখন সাবালক হয়ে উঠল আমেরিকা।

এই তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মুখে, এই সীমান্তে সব সময়েই ছিল কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা। তারা লড়ত তাদের ঘর-বাড়ির জন্যে, তাদের জীবন-ধারা রক্ষার জন্যে। প্রথম দিকে সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের নিষ্ঠুরভাবে; কিন্তু তারপর আমেরিকায় জেগে

উঠল—যাকে বলতে পারি এক ধরনের বিবেক ; অথবা, অনিবার্য পরিণতির বিরুদ্ধে কেবল লড়াই চালিয়েই যায় যারা, সেই মানুষদের সম্পর্কে সম্ভবত এক ধরনের ক্লান্তি।

তাদের যেতে হবে কোন জায়গায় ; আর সমাধানও তার খুঁজে পাওয়া গেল ফেলাহোমায়—সমতলের সবচেয়ে উষর আর অনাকর্ষক অঞ্চলে। তাই কংগ্রেসও বার ক করে রাখল তাকে ইণ্ডিয়ানদের জন্যে, নাম দেওয়া হল ইণ্ডিয়ান-এলাকা ; তখনো যে-সব ইণ্ডিয়ান-গোষ্ঠী স্বাধীন মানুষের মত ঘুরে বেড়াত, তাদের সেখানে পুনর্বাসনের জন্যে কংগ্রেস এগিয়ে এল পরিকল্পনা নিয়ে।

আমাদের কাহিনীর শুরুও সেখান থেকে। আমাদের কাহিনী একটা ঘটনাকে ঘিরে—একটা বিরাট জাতির ইতিহাসের ছোট্ট একটা ঘটনা।

প্রথম পর্ব

জুলাই, ১৮৭৮
ডার্লিংটনের ঘটনা

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি ওকলাহোমার আগুন-ঝরা একটি দিন। মেঘহীন দিন, গনগনে আকাশ, মনে হয় এখনই যেন খুলে দেবে গলিত সূর্যের আগল। তাপ আসছে সবদিক থেকে, আসছে আকাশ থেকে, সূর্য থেকে—দক্ষিণা বাতাসে উড়িয়ে আনছে টেকসাসের মরু-প্রান্তর থেকে; তাপ উঠছে একেবারে মাটির তলা থেকে। মাটির রস শুকিয়ে গিয়েছে, আর এখন সে-মাটি মিহি লালধুলো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দমকা বাতাসে। সেই লালধুলো ছড়িয়ে পড়ছে এধারে ওধারে, ঢেকে ফেলছে সব-কিছু। লালধুলোতে ঢাকা পড়ছে বেঁটে বেঁটে পাইন গাছ, হলদে ঘাস। ধুলো পড়ছে রঙ-না-দেওয়া বাড়িগুলোয়। যে-মাটি থেকে সদ্য আনা হয়েছে সেই মাটির রঙের মতই করে তুলছে দুমড়ানো কাঠগুলোকে।

সব-কিছু ঝকমক করছে অসহ্য উত্তাপে, দূর থেকে দেখাচ্ছে ট্যারা-বাঁকা। খোলা জায়গায় লাফিয়ে-ছুটে-যাওয়া খরগোসটাকে মনে হয় যেন গরম বাতাসে উড়িয়ে-নেওয়া মেটে রঙের একখানা চাদর।

এজেন্সি এলাকায় সকালবেলাকার রোঁদে বেরিয়েছিলেন এজেন্ট জন মাইলস, দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। পুরো ছ'বছর তিনি আছেন ইণ্ডিয়ান এল[illegible] ওকলাহোমার গ্রীষ্ম এখনো ধাতস্থ হয়ে উঠল না তাঁর। এবারের গ্রীষ্ম[illegible] ওবারের চেয়ে বেশি, কিন্তু তিনি হয়ত ভুলেই যান কত ভয়ঙ্কর ছিল গতবারের গ্র[illegible]

মাড় দিয়ে কড়া-ইস্ত্রি কলারের ভিতরে আঙুলটা চালিয়ে দিলেন সতর্কভাবে। এগারটা বাজে, আর দুপুরের মধ্যেই রোজকার মত শেষ ক্ষমতাটুকুও ফুরিয়ে গেছে মাড়ের, নরম ন্যাতার মত হয়ে পড়েছে কলারটা। গোটা গ্রীষ্মকাল ধরে কড়া-ইস্ত্রি শাদা কলার পরাটা যে কতদূর বোকামি বহুবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী লুসি। গলায় একটা রুমাল বাঁধা অনেক বেশি আরামের, আর অনেক বেশি কাজেরও; হাতের রুমালের কাজেও লাগে সেটা, মানের হানিও হয় না এতে।

শেষেরটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত নন তিনি। মান আর কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছে অনেকগুলো ছোট ছোট জিনিস একত্রে; এদের একটাকে ছেড়ে দিলে তৈরি থাকতে হবে সব-কটাকে ছেড়ে দেবার জন্যে। আর সভ্যজগৎ থেকে যত দূরে যাবে ততঃ প্রয়োজন হবে সেই ছোট ছোট জিনিসগুলোর।

শী-এন আর আরাপাহো ইণ্ডিয়ানদের এজেন্সি-এলাকা ডার্লিংটনের চেয়ে সভ্যজগৎ থেকে দূরবর্তী আর-কোন জায়গা আছে এমন কথা ভাবতে পারেন না তিনি।

রুমালটা বার করে তিনি মুখ মুছলেন। তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিলেন চারধারে কেউ তাঁকে দেখছে কিনা, তারপর নিচু হয়ে কালো জুতো থেকে মুছে ফেললেন লাল রঙের ধুলো। সতর্ক হয়ে ভাঁজ করলেন রুমালখানা, যাতে পকেট থেকে বার করতে গেলে ঢাকা থাকে ময়লা দিকটা। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন এজেন্সির ইস্কুল-বাড়িটার দিকে।

ইণ্ডিয়ান এজেণ্ট হবার পর তাঁর প্রথম দিককার মহৎকৃত্যের একটি ওই ইস্কুল-বাড়ি। এর জন্যে তিনি বিশেষ গর্বিত, ঠিক যেমন গর্বিত ড'র্লিংটনের অন্যান্য উন্নতির জন্যে। তবু তিনি এও জানেন যে, অতি দ্রুত নির্মমভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে তাঁর এ গর্বটুকু। তিনি কোয়েকার, কম বেশি গোঁড়াই, তাই সযত্নে ঢেকে রাখেন এ গর্ব। গর্ব যখন ধূলিসাৎ হয় তখন আসে নৈরাশ্য, তার সঙ্গে আসে আরও কিছু, প্রায় তৃপ্তিই সেটা।

তাঁর খেয়াল হল, আবার রঙ ফেরানো দরকার ইস্কুল-বাড়িটার। অন্য আবহাওয়ায় রঙ উঠে যায় শীতের ঠাণ্ডায়, কিন্তু এখানকার গ্রীষ্মের নির্মম উত্তাপ রঙ প্রায় গলিয়ে ফেলছে কাঠ থেকে। মাথা নাড়লেন তিনি ; খাবারের বরাদ্দই কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে যখন, রঙের বরাদ্দ বাড়ানোর অনুরোধ তখন যে নিরর্থক তা তিনি জানেন।

জড়ো-করা ধুলোর একটা গর্ত পেরিয়ে গেলেন, গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল তাতে। জুতো আর মুছে লাভ নেই। মাথা ছাড়িয়ে উঠল উড়ন্ত ধুলোর লাল ঘূর্ণি-মেঘ, কাশতে কাশতে হেঁটে চললেন তারই ভিতর দিয়ে।

পথ আটকে দাঁড়াল হলদে রঙের নোংরা কাঁথা-গায়ে, খালি পা, এক আরাপাহো। গড়গড় করে কি যেন বলে গেল একটানা তার কোমল ইণ্ডিয়ান ভাষায়। লোকটা বারবার পা নাড়ানোয় ধুলোয় ভরে উঠল দুজনের মাঝখানটা।

মাইলস্ চিনলেন লোকটাকে, ওর নাম রবার্ট 'চিল্লানো-বাজ'। সামান্য ইংরেজিও বলতে পারে। শী-এন অথবা আরাপাহো কোন ভাষাই মাইলসের বিশেষ বোধগম্য হয়ে ওঠেনি ছ'বছরে, মাঝে মাঝে ভাবেন বোধগম্য তাঁর ষাট বছরেও হবে না।

—'ইংরেজিতে বল হে বাপু।' মাইলস্ বললেন অধৈর্য হয়ে।

—'আমার পরিবার বলে মুরগিটা ডিম দিচ্ছে না, সেই খচ্চর মুরগিটা।'

—'বেশ তো, তার জন্যে মিঃ সেগেরের কাছে যাও।'

—'ডিমের ব্যাপার কানেই তোলে না জনি।' বোকার মত বলল ইণ্ডিয়ানটি।

—'আমি কথা বলে দেখব তার সঙ্গে।' জোর করে নিজেকে শান্ত রেখে বললেন মাইলস্।

—'খেয়ে নিয়েছি যে খচ্চর মুরগিটা।'

—'তাহলে মুরগি পাবে না আর আমাদের কাছ থেকে।' বলেই হাঁটতে শুরু করলেন মাইলস্।

ইস্কুল-বাড়ির বারান্দার ছায়ার নিচে এসে বেশ ভাল লাগল তাঁর। এখানে গরম

একটু কম, ধুলোর হাত থেকেও কিছুটা বাঁচায় বাড়িখানা। এরই মধ্যে দুই ভুরুর মাঝখানে জমাট বেঁধে উঠছে একটা মোচড়-দেওয়া বেদনা, এর মানে মাথা ধরবে তাঁর—দুপুরের শেষ দিকে, আর রোদ-লাগানোর জন্যে বকুনি খেতে হবে লুসির কাছে। তিনি ছাতা নিয়ে ঘুরবেন আর ইণ্ডিয়ানদের হাসির খোরাক হবেন, এই তো চায় সে। তবু তার বকুনির ওজরে তিনি তো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নিতে পারবেন খাবার আগে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ইস্কুলের ভিতর থেকে ভেসে-আসা বহু কণ্ঠের গুঞ্জন শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলেন দিনের শেষে ঠাণ্ডা জলে স্নান করার কথাটা। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে চোখে পড়ে মাটি ভেঙে পড়ছে কানাডিয়ান নদীর শুকনো চড়ায়, ধুলো আর নেতিয়ে-পড়া হলদে ঘাস, তারই বুকে কোনরকমে টিকে আছে বেঁটে বেঁটে পাইনের ঝোপ। তারও পেছনে, ওকলাহোমার লাল-হলুদ প্রাকৃতিক দৃশ্যপট সোজা গিয়ে ঢু মেরেছে ধাতব আকাশের গায়ে। তে-কোণা ঘরের ইণ্ডিয়ান গ্রামখানা জলের আশায় বৃথাই খুঁড়ে মরছে মরা নদীর চড়া। এক-দিকে শুধু রবার্ট 'চিল্লানো-বাজে'র চলমান মূর্তি ছাড়া আগুনে-ঝলসানো মাটিতে প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। অধিকাংশ ইণ্ডিয়ানই বেরিয়েছে গ্রীষ্মের বাইসন শিকারে, ফিরে আসবে তারা তিক্তমনে, শূন্য হাতে। বাকি যারা আছে, সূর্য না-ডোবা পর্যন্ত কিছুতেই বেরুবে না ঘরের আশ্রয় ছেড়ে।

ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ল। দরজাগুলো খুলে গেল, আর ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ের দঙ্গল হৈ হল্লা করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল হুড়মুড় করে। মেট্রন শ্রীমতী হাজিন্‌স্‌ যখন বেরিয়ে এসে দেখতে পেলেন মাইলস্‌ দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়, ততক্ষণে তারা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ঘাসের উপরে। ভদ্রমহিলার বিরাট চেহারা, শক্ত-সমর্থ দেহ, মোটাসোটা দুই উরু, বুকখানা কবুতরের মত ফোলানো, ঢিলে গাল দুটো, ছোট ছোট নীল চোখ, পাকা চুল। ঘাম ঝরতে লাগল তাঁর মুখ আর গলা বেয়ে, নোংরা হয়ে উঠল জামার কলারটা।

মাইলস্‌কে দেখেই হাততালি দিয়ে ডাকলেন তিনি সবাইকে, 'এই ছেলেমেয়েরা, এই ছেলেমেয়েরা, এজেন্ট মিঃ মাইলস্‌কে ঠিক ঠিক গুডমর্নিং কর তো দেখি।'

কয়েকটা থমকে দাঁড়াল শুধু, দৌড়ে পালাল আর সব কটা।

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' মাইলস্‌ বলে উঠলেন।

—'সত্যিই দুঃখিত আমি। এই গ্রীষ্মে সব-কিছুই কষ্টকর। যা গরম। গরমের চোটে মন দেবার উপায় নেই কোন-কিছুতে।'

সহানুভূতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন মাইলস্‌।

—'অভিযোগ পেশ করছি না কিন্তু আমি।' শ্রীমতী হাজিন্‌স্‌ বললেন।

ইতিমধ্যে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন আর দু'জন শিক্ষক। জোসুয়া ট্রু-ব্লাড আর তাঁর স্ত্রী মাটিল্ডা—তাঁরা দুজনেও কোয়েকার। ইণ্ডিয়ান এলাকায় এসেছেন কর্তব্যের

আহ্বানে, আর এই এলাকাও তাদের পিটিয়ে পিটিয়ে নরম কাদার মত পোষমানা করে তুলছে।

ছোট-খাট মানুষ ট্রু-ব্লাড, খুঁড়িয়ে হাঁটেন একটু, বিচুলি-রঙের একজোড়া গোঁফ। জীবনটা তাঁর দুর্বিষহ, আর ইণ্ডিয়ান ভীতিতে তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন একমাত্র তাঁর স্ত্রী। শিক্ষক হিসাবে তিনি অপদার্থ, চালিয়ে যান কষ্টে-স্পষ্টে। ইঁদুরের মত ভীত-সন্ত্রস্ত তাঁর স্ত্রী, অনেকটা তাঁরই ছায়ার মতন। এ-সব সত্ত্বেও, এক অদ্ভুত ধরনের নৈতিক বিশ্বাস তাঁদের আটকে রেখেছে এই এজেন্সিতে।

জোসুয়া বললেন, 'গ্রীষ্মেও ইস্কুল করতে হবে ওদের, লজ্জাকর ঠেকে ব্যাপারটা।'

—'তা জানি,' মাইলস্ মাথা নাড়লেন, 'দু'চার দিনের মধ্যেই ছুটি দিয়ে দেব ওদের। আমি চাইনি যে ওরাও সঙ্গে যাক শিকারে। বাইসন পাওয়া যায় না, অথচ এই পতিত অঞ্চলেই ছেলেপুলেকে সঙ্গে না নিয়ে বাইসন খুঁজে বেড়াচ্ছে বাপ-মা, এটাই তো ভাল না মোটেই।'

জিভ দিয়ে অস্ফুট শব্দ করলেন মাটিল্ডা, আর শ্রীমতী হাজিন্স্ বললেন, 'এই গরমে কষ্টকর সব-কিছুই।'

গা ঝাড়া দিলেন মাইলস্। মাথাটা ধরে উঠেছে তাঁর, বেশ একটু চেষ্টা করেই বারান্দার ছায়া ছেড়ে আসতে হল তাঁকে। বললেন, 'চললাম আমি, দুপুরে দেখা হবে খাবার সময়।'

ঢালু জমিটা ধরে নিজেকে যেন জোর করে টেনে নিয়ে চললেন তিনি ইণ্ডিয়ান গ্রামখানার দিকে। ক্ষেতগুলো পেরিয়ে গেলেন। এজেন্সির চাষীদের খবরদারিতে ইণ্ডিয়ানরা ক্ষেতে ফলিয়েছে যব, আলু আর কপির ফসল। ধুলোর চাদরে ঢাকা ক্ষেতগুলো, ঝেঁটিয়ে ফেলা ঘরের মেঝের আবর্জনার মত। এই রোদে ইণ্ডিয়ানদের বাইরে এনে কাজ করাতে পারে, এমন সাধ্য দুনিয়ায় কারো নেই। মুরগি চরছিল একপাল, তিনি এগিয়ে চললেন তাদের মধ্যে দিয়ে। ধুলো উড়িয়ে মুখ-চোখ ভরিয়ে দিল মুরগিগুলো, কাশতে শুরু করলেন মাইলস্। ব্যথায় যেন হাতুড়ি ঠুকছে তাঁর মাথায়। ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলেন তিনি, মুরগিগুলো খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করল ক্ষেতের মধ্যে।

বাড়ি ফেরার পথে নতুন তৈরি অনেকগুলো কাঠের ঘর পেরিয়ে গেলেন মাইলস্; এখনকার 'টিপি'র বদলে এগুলোতেই থাকবে ইণ্ডিয়ানরা। রঙ করা হয়নি ঘরগুলোয়, আর এর মধ্যেই কাঁচা পাইনের তক্তাগুলো কুঁকড়ে দুমড়ে গেছে গরমে, বেরিয়ে এসেছে খুঁটির সঙ্গে ঠুকে দেওয়া পেরেকগুলো। মাথা ঝাঁকালেন তিনি, বোকার মত মুখ করে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন ক্লান্ত পায়ে।

দুপুরে খাবার সময় জড়ো হলেন পাঁচজন—জন মাইলস্, তাঁর স্ত্রী লুসি, জোসুয়া আর মাটিল্ডা ট্রু-ব্লাড, আর এজেন্সির সর্বকর্মবিশারদ জন সেগের। কালচে চুল আর

চোখ সেগেরের, শক্ত-কঠিন চেহারা। মাইলস্ যতদিন আছেন এজেন্সিতে সেও প্রায় আছে ততদিন। প্রথমে সে এসেছিল ফুটফরমাস খাটবার লোক হিসাবে, কিন্তু এখন সে করে বেড়ায় সব-কিছু—ট্রু-ব্লাডদের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়লেই স্কুলে পড়ানো থেকে মদের চোরাকারবারীদের পাকড়াও করা পর্যন্ত।

ইণ্ডিয়ানরা তাকে ডাকে 'জনি তামাক-খোর' বলে। ইস্কুলে সে ছেলেমেয়েদের শিখিয়েছিল ছোট্ট একটা ছড়া, নামটা সেই ছড়ারই ধুয়ো থেকে। উপস্থিত সকলের মধ্যে সে-ই একমাত্র লোক—এখানকার কাজকর্ম যার পছন্দসই। ইণ্ডিয়ানদের সে বোঝে, ইণ্ডিয়ানরাও বোঝে তাকে।

খাবার ঘরে সে এসে ঢুকেছিল তেতে-পুড়ে ঘামতে ঘামতে; চটে কাঁই হয়ে ছিল সে; অনেকক্ষণ ধরে মাইলস্ প্রার্থনা না-করা পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখা প্রায় কঠিন হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে। তারপর, আরাপাহো ঝি আইডার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল এখানকার বাবুর্চি মিঃ বাঙ্ক। বড় একটা বাটিতে করে মটরশুঁটির গরম ঝোল আনছে মেয়েটি। যাতে ফেলে না দেয় সেই ভয়ে তার উপর নজর রেখে পাশে পাশে এল বাঙ্ক।

শ্রীমতী মাইলস্ বললেন, 'মনে হচ্ছে, এই গরমেও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ঝোলটা।'

—'তা হতে পারে, লুসি খুড়ি।' টেবিলের দিকে পিছন ফিরে ঘাড় নাড়ল বাঙ্ক, ঝোলের বাটিটা ঠিক জায়গায় না রাখা পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান মেয়েটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল না সে। বলল, 'তা হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি, দয়াল যিশুর দিব্যি, বড্ড গরম রসুইখানাটা। ঈশ্বরের দিব্যি, বেরিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে ঘর থেকে, নয়ত মাথা বিগড়ে যেত বেমালুম। ঈশ্বরের দিব্যি, এত বাবুর্চিদের যে মাথা বিগড়ে যায় তাতে অবাক হবার কিছু নেই।'

—'মনে হচ্ছে, কাল বৃষ্টি হবে, না হলে পরশু।' মিষ্টি করে একটু হাসলেন শ্রীমতী মাইলস্। 'প্রভুর নাম নিয়ে শুধু শুধু দিব্যি গালা তোমার উচিত নয়, বাঙ্ক।'

—'আমি দুঃখিত, লুসি খুড়ি, দিব্যি দিয়ে বলছি।' বাঙ্ক বলল, তারপর এপ্রনে হাত মুছে ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে ফিরে গেল রান্নাঘরে।

ঝোলটা ভাগ করতে শুরু করলেন শ্রীমতী মাইলস্। আর বেশিক্ষণ নিজেকে চেপে রাখতে পারল না সেগের, গর্জন করে উঠল সে, 'আজ দুটো বাইসন-শিকারীকে তাড়িয়েছি এখান থেকে।'

—'বাইসন-শিকারী?' মাইলস্ প্রশ্ন করলেন অস্বস্তিভরে। 'এখানে তো কোন বাইসন নেই—এজেন্সির ধারে কাছে কোথাও নেই বাইসন।'

—'বাইসন-শিকারীই বলি আমি ওদের।' শ্রীমতী মাইলস্ আর মাটিল্ডা ট্রু-ব্লাডের দিকে ঘাড় নেড়ে সেগের বলল, 'কি নামে যে ডাকব ওদের, তা ভগবানই জানেন। লোচ্চা, অসভ্য! ইতরের দল—জানেনই তো ওদের, গায়ে চামড়ার পোশাক। এক সময় হয়ত শিকার করত চামড়া, কিন্তু আর করে না ও-সব। বদমাস, গরু-চোর

আর ওঁচা-ডাকাতের সংখ্যা সবগুলো রাজ্যে মিলিয়ে যত, তার চেয়ে অনেক বেশি এখানকার এই এলাকায়।'

মাথা নাড়লেন মাইলস্। 'ওরা কি জন্যে এসেছিল বলে মনে হয়?'

মেয়েদের উদ্দেশে মাথা নোয়ালো সেগের, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ইণ্ডিয়ান মেয়েছেলে খুঁজতে।'

—'ভাল না এ-সব।'

—'হায় ভগবান, তা কি আর জানি না! তাও আবার এই গরমে। রাতে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখি ওদের ঠেকানো যায় কি করে। বাইসনের টিকিটি পর্যন্ত না দেখতে পেয়ে যখন ফিরে আসবে দলটা, অবস্থা তখন সঙিন হয়ে উঠবে আরও।'

—'খাওয়া শেষ করে নিই এসো।' মাইলস্ বলতে লাগলেন আস্তে আস্তে, ভেবে ভেবে বেছে নিতে লাগলেন কথাগুলো, মাথার ভিতরটা দব্‌দব্ করছে যন্ত্রণায়, তার মধ্যেই শুনতে চেষ্টা করলেন প্রতিটি কথা—'তারপর তো ঘোড়া ছুটিয়ে রেনো কেল্লায় যেতে পার তুমি, মিজনারকে বলে একদল সৈন্য পাঠাতে পার এখানে। স্বস্তি পাব আমরা তাহলেই।'

—'আমারও তাই মনে হয়।' নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে উত্তর দিল সেগের।

জানলার দিকে মুখ করে বসেছিলেন মাইলস্। খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় দেখলেন ঘোড়ায় চড়ে ইণ্ডিয়ানরা আসছে তাঁর বাড়ির দিকে। প্রথমে মনে হল ভুল দেখছেন চোখে, ওটা একটা মরীচিকা, গরমে উত্তাপে কোন রকম ভ্রান্তি হয়ত হবে। ইণ্ডিয়ানরা সংখ্যায় প্রায় জনাকুড়ি, অর্ধ উলঙ্গ, গায়ে রঙ মাখা। ঘোড়াগুলো জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার, বেশ খাপ খেয়েছে পিঠের সওয়ারগুলোর সঙ্গে। তারা আসছে ঘোড়ায় চড়ে রোদে-পোড়া ধুলোর ঢেউ ভেঙে,—লাল-ধুলোর মেঘের ভিতরে যেন পেট পর্যন্ত ভাসছে ঘোড়াগুলোর।

—'দয়া কর, হে ভগবান!' ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠলেন মাইলস্। তখনি সকলের চোখ গেল যেদিকে তিনি তাকিয়ে আছেন।

—'হে ভগবান, দয়া কর।' আবার বললেন মাইলস্।

আর বিড়বিড় করে উঠল সেগের, 'টিপটাপ নয়, মুষলধারেই নামল এবার।'

ইণ্ডিয়ানরা যখন সার বেঁধে দাঁড়াল ঘরের সামনে, তাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবাইকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সেগের। ইণ্ডিয়ানরা শী-এন গোষ্ঠীর। যারা তাদের চালিয়ে এনেছে সেগের চিনল তাদের—দুই বুড়ো সর্দার, 'ভোঁতা-ছুরি' আর 'ক্ষুদে-নেকড়ে'।

উত্তরাঞ্চলের শী-এনদের মধ্যে 'ভোঁতা-ছুরি'র দলই সবচেয়ে শেষে এসেছে এই শী-এন আর আরাপাহো এজেন্সিতে। তাদের আদিম দেশ উইওমিঙ আর ব্ল্যাকহিল অঞ্চলে। স্মরণাতীত কাল থেকে তারা বাস করেছে সেখানে, মাঝে মাঝে

নেমে এসেছে মণ্টানা আর উত্তর ডাকোটার সমতলে বাইসন-শিকারে। কিন্তু সব সময়ই ফিরে গিয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে তাদের দেশে ঘরে। শী-এন দলগুলোর মধ্যে তারাই সবচেয়ে পরে এসেছে সভ্যজগতের সংস্পর্শে। তাদের পাহাড়ে পর্বতে আর পাউডার নদীর উপত্যকায় তারা যা চেয়েছে, তার সব-কিছুই পেয়েছে। আর সেখানে আসতেও বিলম্ব ঘটেছে শাদা-মানুষদের।

১৮৬৫ সালে স্বাক্ষরিত হয় হার্নে-সানহর্ন সন্ধিপত্র। উত্তরের স্যু, শী-এন আর আরাপাহো ইণ্ডিয়ানরা যে অঞ্চলে থাকত, পাউডার নদীর সেই গোটা অববাহিকায় তাদের থাকবার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল এই সন্ধিপত্রে। এই অঞ্চল লিট্‌ল মিসৌরি নদী থেকে এগিয়ে গিয়েছে পশ্চিম দিকে—ব্ল্যাকহিল থেকে রকি-পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত। তখন মনে হয়েছিল এই বিরাট অঞ্চলে তারা বাস করতে পারবে পুরুষানুক্রমে। দেশটা বোঝাই ছিল শিকারের উপযুক্ত বন্যপশুতে, আর ছিল রেলপথের নাগালের বাইরে। গরু-ছাগলের দেশটা ছিল সেখান থেকে দেড় হাজার মাইল দক্ষিণে।

তারপর তৈরি শেষ হল ইউনিয়ন প্যাসিফিক্ রেললাইন। পাউডার নদীর উপত্যকায় এত উঁচু ঘাস জন্মাত যে একটা ঘোড়ার পিঠ পর্যন্ত ডুবে যেত তার মধ্যে! গরু-ছাগলের জন্যে এমন দেশ সারা দুনিয়াতেও মেলে না। দেড় হাজার মাইল উত্তরে গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে এল টেকসাসের লোকেরা, খুলে গেল চিসহোম-পথ-রেখা, আর ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে সরকার তৈরি করলেন কেল্লার সারি। পাল্টা আঘাত হানল ইণ্ডিয়ানরা। কংগ্রেস থেকে পাঠানো হল কূটনীতি-বিশারদদের,—হার্ন-সানহর্ন সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে। সবটা মিলে আবার সেই একই পুরনো কাহিনী, সেই গরু-ছাগল, রেল-পথ, সেই যত জমি বেচাকেনার কোম্পানি, এবং শেষ পর্যন্ত জায়গা ছেড়ে যেতেই হল ইণ্ডিয়ানদের।

অন্য সকলের চেয়ে 'ভোঁতা-ছুরি' আর তার দলই লড়াই চালিয়েছিল বেশি দিন। ১৮৭৭ সালের বসন্তকালের আগে পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করেনি জেনারেল ম্যাকেঞ্জি আর তাঁর ফৌজের হাতে। বলা হয়েছিল, মাতৃভূমি ছেড়ে তাদের যেতে হবে দক্ষিণে, সেখানে ইণ্ডিয়ানদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে একটা বিরাট এলাকা। আরও বলা হয়েছিল, সেখানে গেলেই সরকার দেখা-শোনা করবেন তাদের। তারা শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করতে পারবে। তাদেরই গোষ্ঠীর একটি শাখা দক্ষিণী শী-এনরা, ওকলাহোমায় বাস করে আসছে পুরুষানুক্রমে; আর দশটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল এই যুক্তিটাও। আর চূড়ান্ত যুক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সৈন্য। এই চূড়ান্ত যুক্তিই ঠেলে নিয়ে এল তাদের। তাই তারা এখন বছরখানেকের বেশি এসে রয়েছে এই সংরক্ষিত এলাকায়।

বছরটা মোটেই ভাল যায়নি তাদের। উত্তরে শুকনো সমতল আর পাহাড়ী এলাকা থেকে ম্যালেরিয়ায় ঘুণ-ধরা ইণ্ডিয়ান এলাকায় তারা নেমে এসেছে মারী-জ্বর

বয়ে-আনা মাছির ঝাঁকের মত। শিকারী আর মাংসাশী জাত তারা। বন্যপশু বোঝাই দেশ ছেড়ে তারা এসেছে এমন দেশে, সে-দেশ যেমন শ্রীহীন তেমনিই পশুহীন। তারা আসবার আগে থেকেই সব সময় ঘাটতি চলছিল মাইলসের খাদ্য-বরাদ্দের। আর বরাদ্দের পরিমাণ না-বাড়ায় হাতে যেটুকু আছে তাও চামড়ার 'টিপি'র মধ্যে দিনরাত গুম হয়ে বসে-থাকা এইসব বিধর্মী বর্বরদের পিছনে নষ্ট করার উপায় ছিল না তাঁর। তারা মরছে, উপোস করছে গোটা বছর ধরে, আজ শীর্ণ মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় যারা মরছে না খেয়ে এরা যেন তাদেরই প্রেতাত্মা সব।

এজেন্সির সামনে অবধি এসে ঘোড়া থামাল তারা। ঘোড়ার উপরেই সামনে ঝুঁকে পড়ে তাকাল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচজনের দিকে—প্রায় নিস্পৃহ, নিরাসক্ত তাদের সে চাউনি। বিষাক্ত 'পাফ-বলে'র ধোঁয়ার মত পাক খেয়ে উঠে আবার মাটিতে মিলিয়ে যেতে লাগল লাল ধুলোর রাশি।

—'ভেতরে নিয়ে যাও মাটিল্ডাকে।' মাইলস্ বললেন তাঁর স্ত্রীকে। মহিলা দুজনই ভিতরে চলে গেলেন, আর বিচলিত হয়ে বারবার পা বদলাতে লাগলেন জোসুয়া ট্রু-ব্লাড। 'ক্ষুদে-নেকড়ে' আর 'ভোঁতা-ছুরি', দুই সর্দারই এগিয়ে এল বারান্দা পর্যন্ত, তারপর নামল ঘোড়া থেকে। বৃদ্ধ দু'জনেই কিন্তু 'ভোঁতা-ছুরি'রই বয়স বেশি, একটু দুর্বল সে, আর আত্মবিশ্বাসও তার কম। বুঁটি দেওয়া আদিকালের ছেঁড়া জুতোর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তার পায়ের আঙুল, ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়েই সে তাকিয়ে রইল তার আঙুলগুলোর দিকে। 'ক্ষুদে-নেকড়ে' উঠে এল বারান্দায়, দীনতার কোন চিহ্ন নেই তার হাবভাবে।

সমতলের সমস্ত জাতের মধ্যে শী-এনরা মাথায় সবচেয়ে উঁচু। সে তুলনায় 'ক্ষুদে-নেকড়ে' বেঁটে। সেগেরের সমান হবে মাথায়; একটু কুঁজো, চওড়া কাঁধ, চিমড়ে-ধরনের মুখখানা, লম্বা পাকানো সুতোর মত চুল। মুখখানা সুশ্রী, বড় চোয়াল, ইণ্ডিয়ানদের তুলনায়ও চওড়া মুখের হাঁ, বড়সড় টিকালো নাক; বিজ্ঞতা আর মমতা মাখা কাছাকাছি-বসানো ছোট ছোট চোখ দুটো তলিয়ে গেছে বলি-রেখার ভিড়ে। দেখলেই মনে হয়, মানুষটা সারাজীবন কাটিয়েছে জলে-জঙ্গলে, লোহা বনে গেছে ঝড়-জল আর রোদের তাপে। তার মধ্যে একটা কিছু ছিল; বারান্দায় উঠে যেমন প্রশান্তভাবে সে হাত বাড়িয়ে দিল মাইলস্, সেগের আর ট্রু-ব্লাড পর পর সবাইকে, আর সম্ভবত তাতেই শান্ত হয়ে এল আতঙ্ক। শক্ত জোরাল হাতের চাপ তার।

'ক্ষুদে-নেকড়ে' কথা বলে গেল আলতো কোমল শী-এন ভাষায়, শোনাল ঠিক ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলার মত। তিনজনের কারুরই এমন কিছু ভাষাজ্ঞান ছিল না যে তার অস্ফুট কথাগুলো বুঝতে পারে।

—'ইংরেজি বোঝ?' প্রশ্ন করল সেগের।

—'একটু একটু।'

—'ওরা এখানে কেন এসেছে, কারণটা বার করতে চেষ্টা কর, জন্।' মাইলস্ বলে উঠলেন বিচলিতভাবে।

ভাঙা-ভাঙা শী-এন ভাষায় কথা বলতে শুরু করল সেগের। একদিকে, ঘাড় কাত করে কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করল বুড়ো-সর্দার; বারবার থামতে হল সেগেরকে, শেষ না করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'।—'সেই পুরনো কথা,' সেগের বলল মাইলস্কে, 'যতদূর বুঝতে পারলাম—খাবার কম, বাইসন নেই, অসুখবিসুখ, গরম, সেই পুরনো কাঁদুনি। হয়ত ঠিক বুঝে উঠতেও পারলাম না। তবে বুড়ো যে খচে আছে এটা ঠিক। আপনি বরং গুয়েরিয়েরকে ডেকে পাঠান ওদের সঙ্গে কথা বলতে।'

এডমণ্ড গুয়েরিয়ের এক দো-আঁশলা, থাকে এজেন্সিতে। কাজ তার নানা ধরনের; দোভাষীর কাজ করে, যোগাযোগ রাখে মাইলস্ আর ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। ইণ্ডিয়ানদের অনেকেই তার আত্মীয়-পরিজন। মাইলস্ ট্রু-ব্লাডকে পাঠালেন তাকে ডেকে আনতে। আর ঘরের ভিতরে এসে তামাক খেতে সর্দারদের নিমন্ত্রণ জানাল সেগের। ঘরে ঢোকার আগে শাদা-মানুষদের সঙ্গে করমর্দন করল 'ভোঁতা-ছুরি'। 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র মত আত্ম-প্রত্যয় নেই তার, বয়স আর গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তাকে দেখায় প্রায় ভীতগ্রস্ত শিশুর মত।

অফিস-ঘরে ঢুকে পাইপে তামাক ঠেসে আগুন ধরাল সেগের, কিন্তু বসলও না, তামাকও ছুঁল না সর্দারদের কেউ। গরম সত্ত্বেও গায়ে কাঁথা জড়িয়ে ছোট্ট ঘরের একটি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। গুয়েরিয়েরের জন্যে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো কাটতে লাগল শ্লথ মন্থর গতিতে; জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন মাইলস্, কঙ্কালসার ঘোড়ার উপরেই বোকার মত বসে আছে আর সব শী-এনরা। সেগের যেটুকু ভাঙা-ভাঙা শী-এন ভাষা জানে অথবা 'ক্ষুদে-নেকড়ে' যে সামান্য কয়েকটা ইংরেজি শব্দ জানে, তা দিয়ে কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই কোন।

এই সময়টুকুর মধ্যে শ্রীমতী মাইলস্ অফিস-ঘরে ঢুকলেন চিনির তৈরি এক প্লেট পিঠে নিয়ে। স্বামীর জন্যে একটু বিচলিত ছিলেন তিনি। কিন্তু যখন দেখলেন ঘরের ভিতর চুপচাপ, তখন হেসে গদগদ হয়ে সর্দার দু'জনের দিকে এগিয়ে দিলেন প্লেটখানা। তারা যখন প্রত্যাখ্যান করল, মনে হল তিনি অবাক হয়ে গেলেন যেন, আঘাত পেলেন মনে।

দুঃখিতভাবে তিনি বললেন, 'এর আগে ওদের কেউ আমার পিঠে ফিরিয়ে দিয়েছে, এমন তো মনে পড়ে না।'

—'উত্তরের এই শী-এনরা বুনো, অসভ্য ধরনের।' বুঝিয়ে বলল তাঁকে সেগের।

—'দেখলে তো মনে হয়, খিদে পেয়েছে খুবই।'

—'দেখ লুসি,' প্রতিবাদ করে উঠলেন তাঁর স্বামী, 'ঘোরাল হয়ে যেতে পারে ব্যাপারটা। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে আমাদের, দোভাষীর কাজের জন্যে ডাকতে পাঠিয়েছি এডমণ্ডকে, তুমি বরং ঘরের ভিতরে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর আমার জন্যে।'

—'তুমি যা বল। পিঠেগুলো রেখে যাব এখানে ?'

অন্যমনস্কের মত ঘাড় নাড়লেন মাইলস্, প্লেটটা ডেস্কের উপর নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রী। পকেট থেকে ওলকপির মত রুপোর ঘড়িটা বার করে অধৈর্য হ'য়ে দেখতে লাগলেন বারবার।

—'কোথায় আছে লোকটা ?' সেগেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

কাঁধটা ঝাঁকাল সেগের, তামাক টেনেই চলল সে। গুমট গরম, ঘরের মধ্যে ঠাপাচাপি। ঘোড়ার ঘাম, কাঁচা চামড়া আর পোড়া-কাঠের গন্ধ উঠতে লাগল সর্দারদের গা থেকে।

সেগের উঠে এগিয়ে গেল জানলার ধারে, তুলে দিল খড়খড়িটা। একটা পিঠে তুলে নিয়ে একটু একটু কামড়ে খেতে শুরু করলেন মাইলস্। তখনো টন্‌টন্ করছে তাঁর মাথাটা, পরিকল্পনা-মাফিক ঠাণ্ডা জলে স্নান করা হয়ে ওঠেনি তাঁর।

—'ওই যে ওরা আসছে।' বলে উঠল সেগের।

গুয়েরিয়েরকে ঘরের ভিতর এগিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল ট্রু-ব্লাড। 'গ্রামের ভেতর পর্যন্ত ছুটে যেতে হয়েছে,' দম নিতে নিতে সে বলল, 'আমি ভেবেছিলুম—'

দাঁতে দাঁত চেপে কুটিল হাসি হাসল সেগের। মাইলস্ বললেন, 'আমাদের কথাবার্তার বিবরণ লিখে নিতে আপত্তি আছে, জোস্যুয়া ?'

ঘাড় নাড়ল ট্রু-ব্লাড। ব্যস্ত হয়ে উঠল কাগজ-পেন্সিল নিয়ে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে। টুপির ভিতরকার ফিতে থেকে ঘাম মুছে নিল গুয়েরিয়ের, তারপর মুখের ঘাম মুছল। সর্দার দু'জনের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে কথা শুরু করল দ্রুত শী-এন ভাষায়। ভণিতা বাদ দিল সে, ভাবখানা দেখাতে চেষ্টা করল কাজের মানুষের—যেমন ধারা শাদা চামড়ার মানুষেরা করে থাকে।

—'জিজ্ঞেস কর, কি চায় ওরা এখানে ?' মাইলস্ বললেন। 'যদি খাবার চায়, বল, ওরা ক্যাম্পে ফিরে যাক, কিছু বাড়তি বরাদ্দ পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

—'খাবার নয়,' গুয়েরিয়ের বলল, 'ফিরে যেতে চায় ওরা।'

—'যাক না ফিরে। ওদের আটকে রাখছি না আমি এখানে। বল ওদের, যত তাড়াতাড়ি খুশি ফিরে যেতে পারে ওরা।'

—'ক্যাম্পে ফিরে যাবার কথা বলছে না ওরা,' বুঝিয়ে বলল গুয়েরিয়ের, 'ওরা বলছে দেশে—উইওমিঙে।'

—'তা এখন অসম্ভব।' টেবিলে চাপড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মাইলস্, 'এখন তা প্রশ্নেরও বাইরে। সত্যি বলতে কি, তা যে অসম্ভব ওরা জানেও তা। বলে দাও ওদের, ওয়াশিংটনের অনুমতি ছাড়া কেউ ইণ্ডিয়ান এলাকা ছেড়ে যেতে পারবে না। ভাল করে বলে দাও যে মহান শ্বেতাঙ্গ-পিতাও এ অনুমতি দেবেন না। চিরকালের জন্যে এইটেই হবে ইণ্ডিয়ানদের দেশ, ঠিক যেমন করে গড়ে তুলবে তারা তেমনটিই

হবে। তারা যদি অলস আর অপদার্থ হয়, সারা দিনমান যদি ঘরে শুয়েই কাটায় তাহলে তার ফল তাদেরই ভোগ করতে হবে। ভাল করে বুঝিয়ে দাও, এখানে থাকতেই হবে ওদের।'

গুয়েরিয়ের তর্জমা করে গেল, আর লিখে যেতে লাগলেন ট্রু-ব্লাড কথাগুলো। বোকার মত পাইপ টানতে লাগল সেগের। দো-আঁশলার কথা শেষ হলে সর্দার দু'জন তাকাল এ ওর মুখের দিকে। 'ভোঁতা-ছুরি'র সারা দেহে ফুটে উঠল নৈরাশ্য আর অনিশ্চয়তার অভিব্যক্তি। শ্রান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল, উঠে পড়তে চাইল সে। 'ক্ষুদে-নেকড়ে' কিন্তু বাধা দিল তাকে, মমতাভরে হাত দিয়ে চেপে ধরল তার হাতখানা।

বলতে শুরু করল 'ক্ষুদে-নেকড়ে' আর সোজাসুজি উত্তম-পুরুষেই তর্জমা করে গেল গুয়েরিয়ের। শী-এন থেকে ইংরেজিতে তাড়াতাড়ি তর্জমা করতে একটু আটকায় তার, নোটবইয়ে লিখে চলেছেন ট্রু-ব্লাড, সেই দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সতর্কভাবে শব্দ যুগিয়ে গেল সে।

—'আর কতকাল আমাদের থাকতে হবে এখানে?' একটানা বলে যেতে লাগল 'ক্ষুদে-নেকড়ে', একটুও চড়ল না তার গলার পর্দা, 'যতদিন না সকলে আমরা মরে শেষ হয়ে যাই? ঘরে বসে থাকে বলে আপনি বিদ্রূপ করেন আমার লোকদের; কিন্তু কি করাতে চান তাদের দিয়ে? কাজ? আমাদের কাজ তো শিকার করা। চিরকাল সেই কাজই তো করে এসেছি, কোনদিন উপোস করতে হয়নি আমাদের। যত কালের কথা মানুষ মনে রাখতে পারে, ততকাল ধরেই আমরা বাস করে এসেছি আমাদের নিজেদের দেশে, ঘাসে-ভরা মাঠ আর পাহাড় সে দেশে, উঁচু উঁচু পাইন গাছের জঙ্গল রোগ-ব্যামো ছিল না সেখানে, মরত যারা, তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এখানে আসার পর থেকেই রোগে ধরেছে আমাদের, মরে গেছে অনেকেই। উপোস করে আছি আমরা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে আসছে বাল-বাচ্চাদের কেউ যদি তার নিজের দেশে ঘরে ফিরে যেতে চায়, সে কথা কি সত্যিই এমন ভয়ানক? আপনি যদি যাবার অনুমতি দিতে না পারেন, তাহলে আমাদের কাউকে যেতে দিন ওয়াশিংটনে; গিয়ে বলি, কি দুর্ভোগ ভুগছি আমরা। নয়ত কাউকে পাঠিয়ে দিন ওয়াশিংটনে, আমরা সব মরে শেষ হয়ে যাবার আগে অনুমতি নিয়ে আসুক এ জায়গা ছেড়ে যাবার।'

বুড়ো সর্দারের সরল বাক্-ভঙ্গির কিছুটা সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল গুয়েরিয়েরের গলার স্বরে। হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কথা শেষ করল সে। মুহূর্তের জন্যে ছোট ঘরখানার মধ্যে জমাট হয়ে উঠল উষ্ণ নিস্তব্ধতা। তারপর কেটে গেল চমকটা। দুই আঙুলের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টুপির ভিতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল গুয়েরিয়ের। ট্রু-ব্লাড পড়তে শুরু করলেন লিখে-নেওয়া কথাগুলো। সেগেরের দিকে তাকালেন মাইলস্, সে বসে বসে পাইপ টেনেই চলল বোকার মত।

সেগেরের এই নিস্পৃহতায় ঈর্ষা জেগে উঠল মাইলসের মনে। শুধু বসে বসে দেখে গেলেই তার চলে। আর তিনি? একটা সভ্য জাতির নীতি কি করে বোঝাবেন তিনি বর্বরদের? তাদের কাছে এটা ন্যায়-অন্যায়ের সহজ একটা ব্যাপার। তারা বুঝতে পারে না যে, ইতিমধ্যেই পশু-শূন্য হয়ে উঠেছে তাদের সেই উত্তরের দেশ, দেশটা ভরে উঠেছে আবাদ আর 'রাঞ্চ' বাড়িতে। ডালিংটন এজেন্সিতে সভ্যতা বিস্তারের যে-স্বপ্ন একসময় তিনি দেখেছিলেন তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে কোন লাভও হবে না তাঁর পক্ষে। এ ব্যাপার নিয়ে ইণ্ডিয়ান দপ্তরকে বিরক্ত করাও অর্থহীন। তাঁকে নিজেকেই অথবা রেনো কেল্লার ফৌজ আর কর্নেল মিজনারের সাহায্য নিয়ে ব্যাপারটি আয়ত্তে আনতে হবে তাঁকে। ঘটনার সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টা করলেন তিনি।

—'তোমাদের এখন ওয়াশিংটনে যেতে দিতে পারব না আমি।' তিনি বললেন ভেবে-চিন্তে, 'পরে পারব বোধ হয়, কিন্তু এখন নয়। আর এক বছর চেষ্টা কর না কেন এই এজেন্সিতে। কথা দিচ্ছি, যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয়, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব ওয়াশিংটনে, সরকারি মহলে যাদের ধরা দরকার তাদের কাছেই তুলব ব্যাপারটা।'

মাথা ঝাঁকাল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। 'আর এক বছরে যদি আমরা মরে শেষ হয়ে যাই, লাভ কি হবে তাতে? আমাদের যেতে হবে এখনই। আপনাদের কথা মত যদি চলি, তাহলে উত্তরে ফিরে যাবার মত কেউই বেঁচে থাকবে না।'

—'আমার জবাব আমি দিয়ে দিয়েছি তোমাদের।' কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলেন মাইলস্। মাথার ভিতরে তাঁর ঢাক পিটতে লাগল। চোখের সামনে সর্দার দু'জনকে মনে হতে লাগল যেন উত্তাপের মুখোশের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা, কেঁপে কেঁপে ওঠা, হাস্যকর দুটো মূর্তি। ওদের সম্পর্কে কোনরকম ঘৃণা পোষণ না করার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি, যুঝতে লাগলেন নিজের সঙ্গে, চেষ্টা করতে লাগলেন ওদের অভিযোগের ন্যায্যতাটুকু বুঝতে।

কিন্তু গুলিয়ে গেল সব-কিছু; ওদের জন্যেই আটকে আছে তাঁর ঠাণ্ডা জলে স্নান, একমাত্র ওই স্নানেই আরাম পাবেন তিনি মাথাধরার। এই ধুলো, এই গরম, নতুন তৈরি ঘরগুলো থেকে গজাল খসিয়ে-ফেলা তক্তাগুলো, খাদ্য বরাদ্দের ঘাটতি, ডার্লিংটনের নিঃসঙ্গতা, যে আদর্শে তিনি বিশ্বাস করতেন তার বিরুদ্ধে তাঁর মানসিক সংগ্রাম—সব-কিছু মিলে একাকার হয়ে গেল তাঁর মনে।

—'বলে দাও ওদের কোন-কিছু সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না আমি। খেঁকিয়ে বলে উঠলেন তিনি গুয়েরিয়েরকে।

স্তব্ধভাবে উত্তরটা শুনল সর্দার দু'জন। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে ঘরের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে তারা করমর্দন করল যন্ত্রের মত। করমর্দন ব্যাপারটা তাদের অপরিচিত, কিন্তু করমর্দন করে গেল যথাযথ, কেতাদুরস্ত ভাবে—শাদা-মানুষদের যে একটিই অনুষ্ঠান তারা জানে, সেটাকেই যেন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে

চায় তারা। অভিব্যক্তিহীনতার মুখোশ আঁটা 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র মুখে, কিন্তু দুঃখে আর নৈরাশ্যে 'ভোঁতা-ছুরি'র চোখ দুটো লাল।

তারা ঘরের বাইরে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মাইলস। সেগের কিন্তু পিছনে পিছনে গেল বারান্দা পর্যন্ত; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারা গিয়ে উঠল কঙ্কালসার ঘোড়ার পিঠে। আগের মতই একভাবে অপেক্ষা করছিল আর সব যোদ্ধা; তেমনি একই ভাবে কাত হয়ে বসে, কাঁচা চামড়া দিয়ে তৈরি জিনের দাঁড়ার উপরে সামনের দিকে ঝুঁকে। তারপর যেমনভাবে এসেছিল তেমনভাবেই চলে গেল সারবন্দী হয়ে। পুরু লালধুলোর উপর একটুও যেন শব্দ হল না ঘোড়ার খুরের। তাদের নিচে থেকে গুঁড়োমাটির দম-আটকানো মেঘ উড়তে উড়তে একসময় আবার মনে হল, তারা যেন ভাসছে সেই ভয়াবহ লাল মেঘের মাঝখানে।

চিন্তিত মনে পাইপ টানছিল সেগের, এমন সময় দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে মাইলস্ বললেন, 'আমি এখন ঠাণ্ডা জলে নাইতে যাচ্ছি, জন্। একটু নজর রাখবে সবদিকে?'

মাথা নাড়ল সেগের।

—'ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল, তাই মনে হয় না কি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মাইলস্।

সেগের মাথা ঝাঁকাল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'এই তো সবে শুরু।'

দ্বিতীয় পর্ব

আগস্ট, ১৮৭৮

পলাতক তিনজন

মাইলসের কাছে পলাতক তিনজনের খবর নিয়ে এল একজন আরাপাহো, নাম তার 'জিমি ভল্লুক'। এজেন্সি থেকে উত্তরে গিয়েছিল সে শিকারের খোঁজে। ঘটনাটা কয়েক সপ্তাহ পরের। বৃষ্টির তখন দেখা নেই, তাপ কমেনি একটুও। ওকলাহোমারই মানুষ সে, কিন্তু এমন গ্রীষ্ম দেখেনি কখনো। মাটি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মানুষের মুখ নাক চোখ বুজিয়ে দিতে পারে ধুলোর চোটে, এমনটি আর কখনো দেখেনি সে। দুদিন ধরে সে শিকারের সন্ধানে ঘুরেছে; প্রখর উত্তাপে মাটি তরঙ্গিত আন্দোলিত হয়ে উঠলেও এই সময়ের মধ্যে জ্যান্ত কিছুই চোখে পড়েনি তার।

দুপুরের দিকে অসহ্য বোধ হওয়াতে সে গুড়িসুড়ি মেরে বসেছিল হলদে ঘাসের মধ্যে, ঘোড়ার পেটের ছায়ার আড়াল নিয়েছিল রোদের তাপ বাঁচাতে। বাইসনের শুকনো সাদা একটা মাথার খুলিতে আঙুল ছোঁয়াতেই এত গরম লেগেছিল যে যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছিল।

তারপরই চড়ে বসেছিল ঘোড়ার পিঠে, পা কেটে গিয়েছিল জিনে লেগে, তাতানো ছুরিতে যেমন করে কাটে।

—'হায় রে ভগবান, এমন রোদে মরে যাব আমি।' সে চেঁচিয়ে উঠেছিল আর্তনাদ করে। লোকটা খ্রীস্টান, এত ইংরেজি বলতে পারে যে আর-সব ইণ্ডিয়ানরা তাকে ডাকে 'নিজের জবান-ভোলা লোক' বলে।

এমনও হতে পারে যে শী-এন তিনজনকে সে যখন জোরকদমে উত্তরমুখে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছিল, অসহ্য গরমের তাপে তখন তার মাথাটা প্রায় খারাপই হয়ে গিয়েছিল। প্রথম মনে হয়েছিল যে ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে মেরে ফেলবে ওরা; পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, ওভাবে উত্তরমুখে ঘোড়া ছোটানোর নির্ঘাত কোন কারণ আছে, মরবে সে তো নিশ্চিতই—তা সে আগেই মরুক আর পরেই মরুক। তাদের পিছনে সেও ছুটিয়ে দিয়েছিল ঘোড়া, তারপর দেখতে পেয়েছিল ওদের ঘোড়াগুলো ঘুরিয়ে নিতে। এমন বে-পরোয়ার মত ওরা তার দিকে তাকিয়েছিল যে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে, হয়ত একটা কথা বলার আগেই তাকে গুলি করে বসত। খ্রীস্টান তো নয়—জংলি ওরা, উত্তরাঞ্চলের শী-এন, 'ভোঁতা-ছুরি'র দলের লোক।

—'কোথায় চললে তোমরা?' চিৎকার করে সে জিজ্ঞাসা করেছিল তাদের চাষাতেই।

—'উত্তরে।' জবাব এসেছিল তার।—'যেখান থেকে আমরা এসেছি।' তারপর আবার ঘুরিয়ে নিয়ে উন্মত্তের মত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছিল তারা।

যেখানে তারা চলেছে সেই সেখানকার মিঠে হাওয়া আর পাতায় ঢাকা সবুজ গাছের কথা এজেন্সিতে ফিরে আসার পথে ভাবতে ভাবতে মাথাটাই প্রায় খারাপ হয়ে উঠেছিল তার।

আরাপাহোটাকে খুব ভালভাবে জেরা করতে লাগলেন মাইলস্, ভাবতে লাগলেন সেই সঙ্গে, 'এ-সব বলার কি দরকার ছিল ওর? তিনজনই হোক আর দশজনই হোক, ওরা পালাক আর জাহান্নমে যাক, তার জন্য পরোয়া করি আমি?' কিন্তু তিনি জানেন যে কথাটা আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এজেন্সির সর্বত্র। এ-সব কথা ছড়িয়ে পড়ার একটা বিশেষ ধরন আছে। এই অসহ্য গরমে দাবানল জ্বালাতে একটা ফুল্‌কিই যথেষ্ট।

—'তুমি ঠিক জান, ওরা 'ভোঁতা-ছুরি'র দলের তিনজন?' মাইল্‌স্ প্রশ্ন করলেন।

ঘাড় নাড়ল 'জিমি ভল্লুক'। হাতটা পাতল সে, গুনে গেল আঙুলগুলো, 'এক, দুই, তিন।'

—'ঠিক জান, ওরা উত্তরেই গেল?' গোঁ ধরে রইলেন তিনি।

—'ঈশ্বরের দিব্যি, ঠিক জানি,—পাগলের মত ঘোড়া ছোটাচ্ছিল ওরা।'

—'নাম কি ওদের?'

কাঁধ ঝাঁকাল আরাপাহোটি। 'ওরা যে উত্তরের শী এন—'

কিছুটা সন্দেহ রয়েই গেল মাইলসের। ভাবলেন, সেগের অফিসে হাজির থাকলে ভাল হত। সেগের যে তাঁকে সিদ্ধান্তগ্রহণে সাহায্য করতে পারত তা নয়; কিন্তু সেগের বসে বসে পাইপ টানত আর দমিয়ে রাখত ইণ্ডিয়ানটাকে চোখ পাকিয়ে। তাঁর ধারণা, তাঁর চেয়ে সেগেরের কাছেই যে-কোন ইণ্ডিয়ান সত্যি কথাটা বলে ফেলে তাড়াতাড়ি।

—'যদি ওদের নাম না জান, তাহলে কি করে জানলে ওরা উত্তরের শী-এন?'

এমন ভঙ্গি করল আরাপাহোটি যে তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনোভাব। চোখ দুটো কুঁচকে তাকাল মাইলসের দিকে, যেন তিনি একটা আহাম্মক।

এমন সময় এক প্লেট চিনির পিঠে আর জগে করে ঠাণ্ডা শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকলেন লুসি। প্লেটটা নামিয়ে রাখলেন ডেস্কের ওপর। হাত দুটো জড়ো করে ইণ্ডিয়ানটি উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল মাইলসের মুখের দিকে। মাথা নাড়লেন মাইলস্, আর সে মুখে গুঁজতে শুরু করে দিল পিঠেগুলো।

—'ভাল হয়েছে ওগুলো জিমি?' লুসি খুড়ি হাসলেন একটু।

ঘাড় নাড়ল সে, খাওয়া কিন্তু বন্ধ করল না। তাকালও না শরবতের দিকে। প্লেট খালি না হওয়া পর্যন্ত গোগ্রাসে গিলে চলল পিঠেগুলো।

—'মিষ্টি শরবতটা এবার খেয়ে দেখবে না একটু?' লুসি জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে পড়ল সে, পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। মাইলস্ বললেন, 'হয়ে গেছে, এবার তুমি যেতে পার।' লোকটা চলে গেলে তিনি শুরু করলেন, 'ওদের খাওয়াতে তোমার এত ঝোঁক কেন, লুসি?'

—'ওরা যে আশা করে থাকে।'

—'আশা করা উচিত নয় ওদের। এখানে যখনই আসবে তখনই মণ্ডামেঠাই গিলবে, এ আশা করা উচিত নয় ওদের। ওদের বরাদ্দ আমি সম্পূর্ণ ন্যায্য আর সঙ্গত-ভাবেই ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে চেষ্টা করি।'

—'আমি দুঃখিত, জন্।' ক্ষমা চাইলেন লুসি।

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আর সামনের কাগজের টুকরোয় ছোট ছোট বৃত্ত আঁকতে আঁকতে অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়লেন মাইলস্। 'সেগের কোথায় আছে বলতে পার?'

—'গোলাবাড়িতে মনে হয়।'

টুপিটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে মাইলস্ বেরিয়ে এলেন। আস্তে আস্তে চললেন গোলাবাড়ির দিকে। গতকাল যে একটু মূর্ছার ভাব দেখা দিয়েছিল তাতেই শিক্ষা হয়ে গিয়েছে তাঁর। তিনি যদি জ্বরে পড়েন, হালবিহীন জাহাজের মত বানচাল হয়ে যাবে গোটা এজেন্সি। দেখতে পেলেন, গোলাবাড়ির সামনে বসে আছে সেগের, আরাম করে ছায়ায় বসে ভাঙা জোয়ালের চামড়ার দড়িটা জোড়া লাগাচ্ছে সে। তাঁর হিংসে হল লোকটার রোদে-পোড়া পাথরের মত কঠিন দেহের শক্তি দেখে। মাইলস্ আসছেন সেগের তাকিয়ে দেখল, ঘাড় নোয়াল, কিন্তু কাজটা বন্ধ করল না।

জিমির কাহিনী মাইলস্ যতক্ষণ ধরে বললেন, চামড়ায় মনঃসংযোগ করে সেগের ততক্ষণ করেই গেল কাজটা। মাইলস্ থামতেই সে বলল নিচু গলায়, 'তিনজনে আর এমন কিছু ইতরবিশেষ হবে না।'

—'তিনজন যদি পালিয়ে যেতে পারে সাজা না পেয়ে, তাহলে একটা গোটা দলও পারে।'

—'এখনও তো পালায়নি তারা।' সেগের বলল।

—'সন্ধ্যের মধ্যেই সারা এজেন্সিতে রাষ্ট্র হয়ে পড়বে এটা।'

—'এটা আপনার নিজের ব্যাপার। বলতে পারেন, ওদের যেতে অনুমতি দিয়েছেন আপনি।'

—'সকলেই ওরা অনুমতি চাইবে।' হতাশ কণ্ঠে মাইলস্ বললেন। 'যেখান থেকে ওরা এসেছে, প্রত্যেকটি ইণ্ডিয়ানই ফিরে যেতে চাইবে সেখানে।'

—'আমি হলে মাথা ঠুকে দিতাম আরাপাহোটার,—আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দিতাম ওকে, মুখ বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করতাম।'

মাইলস্ বললেন, 'এ ধরনের ব্যাপার যদি মাফও করতে হয়, দেরি হয়ে গেছে তার পক্ষেও। তুমি বরং গাড়িটা জুড়ে দাও।'

—'কেল্লায় যাবেন বুঝি?'

উত্তর দিলেন না মাইলস্। সেগের যেভাবে ধুলোর মধ্যেই আরামে বসে আছে তা দেখে ঈর্ষা জেগে উঠল তাঁর মনে। সাধারণ কর্মচারী আর কর্মকর্তার মধ্যে তো এখানেই পার্থক্য।

রেনো কেল্লায় গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে কর্মকর্তা হিসাবে নিজেকে ক্লান্ত মনে হতে লাগল মাইলসের, মনে হল নিরাপত্তাহীন, ধাঁধাগ্রস্ত। গায়ে দিয়েছেন কালো কোটটা, মাথায় চাপিয়েছেন কালো 'বোলার' টুপি; আর সব সময়েই যেমন তাঁর মনে হয়, এবারেও মনে হল ঘোড়সোয়ারের ঝকমকে উর্দি গায়ে সৈন্যরা তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসবে। ডার্লিংটনের এত কাছে এই রেনো কেল্লার অবস্থিতির কথাটা ভাবলেই বিশ্রী লাগে তাঁর। সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দেয়, তিনি আর এজেন্সির অন্য সকলে ঠিকমত ইণ্ডিয়ানদের চালিয়ে নিতে কোনক্রমেই সমর্থ নন। তবুও সেই সঙ্গেই তিনি ধন্যবাদ জানান, ধন্যবাদ জানান সহস্রবার, ধন্যবাদ জানান যখন রাতে জেগে ওঠেন ঘুম ভেঙে; আর মনে পড়ে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী এত কাছে আছে যে, ডাকলেই সাড়া পাওয়া যাবে তাদের।

তবু যে শান্তির দেবতার সেবায় একদিন আত্মোৎসর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি নিষ্ঠায় বন্দুকের সাহায্যে শান্তিস্থাপনের ব্যাপারটাকে মেলাতে পারেন না মাইলস্। প্রেমভরে কোল বাড়িয়ে দিতে চাও যদি, তাহলে পিছনে ফেলে আসতে হবে বন্দুক। প্রেমে বিলিয়ে দাও নিজেকে, প্রেমেরই সেবা কর, তোমাকেও অপরে টেনে নেবে প্রেমভরে। হীনতম বর্বরও তাই করবে। তবু কাজের বেলায় কি ঘটছে? এক প্লেট চিনির পিঠে দিয়ে সেবার একটা সহজ অনুষ্ঠানে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন না তিনি। লুসি বিশ্বাস করেন যেভাবে, এমন কি সেভাবেও না। মনে আছে, একদিন নির্দয়ভাবে সেগের যখন এক শী-এন ছেলেকে মারছিল তখন তার সামনে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেগেরের উঁচানো হাতখানা চেপে ধরে বলে উঠেছিলেন, 'ঘুষি বাগিয়ে আর মন-ভরা ঘৃণা নিয়ে ওদের কাছে এলে ওরা কি আমাদের ভালবাসবে জন্?'

চোখে প্রায় অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠলেও মুখের:কোন পরিবর্তন হয়নি সেগেরের। সে বলেছিল, 'এজেন্ট মাইলস্, এই পুঁচকে বেজন্মাটা ছুরি মারতে চেয়েছিল আমাকে। আপনি চলে যান তো দয়া করে। ব্যাপারটা ফয়সালা করে নিই ওর সঙ্গে। যখন জানবে কে ওর মনিব, তখন ও আলবত ভালবাসবে আমাকে।'

তাঁকে পীড়িত করতে লাগল সেই স্মৃতি। তা সত্ত্বেও এবারে কঠোর হবার সিদ্ধান্তই জোরাল হয়ে উঠল তাতে। প্রেম আর গ্রীষ্মের উত্তাপে মিশ খায় না ভাল করে। ইণ্ডিয়ানরা আইন মেনে চলুক, তখন তিনিও দেখিয়ে দেবেন তাদের শুভাশুভ সম্পর্কে কতখানি সদাশয় হতে পারেন। সে যাই হোক, আবার মাথাটা

ধরে উঠল তাঁর, ঘামে ভিজে গেল কলার আর শার্ট। আর ঘোড়ার খুরে উড়ন্ত ধুলোর মেঘ এসে জমতে লাগল কালো রঙের জামাকাপড়ের সর্বত্র।

কাঠের গেট পেরিয়ে তিনি কেল্লার ভিতরে ঢুকে পড়লেন, পেরিয়ে গেলেন একটি সাস্ত্রীকে, আড়ষ্টের মত অভিবাদন করল সাস্ত্রীটি। অভিবাদন ফিরিয়ে দিতে কোনদিন পারেন না মাইলস্, সামরিক ব্যাপারমাত্রেই সব সময় পীড়াদায়ক মনে হয় তাঁর কাছে। ঘোড়ার রাশ টেনে তিনি কিছুক্ষণ বসে রইলেন গাড়িতেই, চেষ্টা করতে লাগলেন দম নেবার, বুকের ধুকপুকুনি কমাবার। তারপর নেমে পড়লেন মাটিতে, সতর্কভাবে মুখ আর টুপিটা মুছে ফেললেন রুমাল দিয়ে।

কাঠ আর মাটির দেওয়াল কাঠ আর মাটির ব্যারাকের একটা আয়তক্ষেত্র রেনো কেল্লাটা। উত্তরে কানাডার সীমান্ত থেকে দক্ষিণে রিও গ্রাণ্ডে পর্যন্ত প্রসারিত সমতল অঞ্চলের আর-আর সব মার্কিন সামরিক ঘাঁটির চেয়ে প্রায় কোন অংশেই পৃথক নয় কেল্লাটা। ঘর্মাক্ত কলেবরে ড্রিল করে একটা রেজিমেণ্ট, দলাইমলাই করে ঘোড়াগুলো, তাদের অফিসাররা একটানা একঘেয়ে দিন আর রাতগুলো কাটিয়ে দেয় হুইস্ট আর পেনিপোকার খেলে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে। স্ত্রীলোক এখানে খুবই কম, প্রায় বালাই নেই সামাজিক জীবনের। একটা বেচা-কেনার দোকান পর্যন্ত নেই যে কুৎসিত বাইসন-শিকারী আর হীনচরিত্রের হুইস্কির চোরাকারবারীরা আসবে বৈচিত্র্য যোগাতে। ইণ্ডিয়ানদের লড়াই মিটে গেছে, চুকেবুকে গেছে তার পালা; আর, এখানকার এই ইণ্ডিয়ান এলাকায় এত বেশি গরু-ছাগলওয়ালাও নেই যে, গরু-চোরদের সম্পর্কে নালিশ জানিয়ে জানিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলবে সৈন্যাধ্যক্ষকে। গরু-চোররাও কিছুটা বৈচিত্র্য আনে; তাদের খুঁজে খুঁজে বার করে ধরে আনা যায় দুর্গে, তারা সৈনিকদের আনন্দ দিতে পারে গল্প বলে—দল বেঁধে মানুষ পুড়িয়ে মারার গল্প, গরুর পাল তাড়িয়ে নেওয়া, তাদের মার্কা পালটে দেওয়া, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার গল্প।

কিন্তু মাসের ছুটিতে একবার করে সেন্ট লুইতে ঘুরে আসা ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। দিনগুলো যেমন দীর্ঘ, তেমনি গরম। তাই এখানকার মানুষগুলো অভিশাপ দেয় আর ড্রিল করে। তরুণ অফিসাররা চিঠি লেখে বাড়িতে, আর তিক্তমনে অতীত দিনের গল্প শোনে পুরনো সৈনিকদের কাছে, গল্প শোনে 'বসা-ষাঁড়' আর কাস্টার, ক্রুকস্ আর শেরিডনের, শোনে সেই অতীত দিনের গল্প যখন ইণ্ডিয়ানরা ছিল মরবার জন্য, আর মারবার জন্য ছিল বীরপুরুষের দল।

বেশ খুশিমনেই মিজনার অভ্যর্থনা জানালেন মাইলস্‌কে। সামরিক বাহিনী আর এজেন্সির লোকজনের মধ্যে কখনো কখনো ঝগড়া বাধে জোর, কখনো বা অল্প-স্বল্প; গত কয়েক মাস ধরে বেশ সহজভাবেই চলছে সব-কিছু। মানুষ হিসাবে কোয়েকার আর গোষ্ঠী হিসাবে কোয়েকার, দুই-ই যেন কর্নেলের জ্ঞানরাজ্যের বহির্ভূত, কিন্তু তিনি গর্ববোধ করে থাকেন কোন-এক ধরনের মানসিক ঔদার্য সম্পর্কে, বহু

জায়গায় বহু জিনিস দেখার ফল সেটা। তা ছাড়াও, মানুষটা তিনি এই ধরনের যে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার চেয়ে কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সহজ বোধ করেন অনেক বেশি। ফৌজি-উর্দিই তাঁর বিধাতা, যখনই কেউ সাহায্য চায় সেই উর্দির, চায় তাঁর বিধাতারই কাছে। সেটা আরও বেশি মনে হয়, যখন সাহায্য চান মাইলসের মত লোক, যাঁকে তাঁর কাজের পক্ষে মোটেই তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেন না,—এ কাজটা একপাল কোয়েকারের চেয়ে অনেক বেশি মানায় সামরিক বিভাগের।

তাই তিনি প্রসন্নমনে, বিনীতভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন মাইলস্‌কে, কুশল প্রশ্ন করলেন তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে, শ্রীমতী মাইলসের স্বাস্থ্য সম্পর্কে। প্রায় খুশি হয়ে উঠলেন মাইলসের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখে।

মিজনার লোকটা মাথায় লম্বা, মুখটা সরু। সরু কোমর আর চাপা ঠোঁট নিয়ে তাঁর মনে গর্ব আছে। উর্দির সামনে দিয়ে হাতটা চালিয়ে নেওয়া অভ্যাস তাঁর, যেন নিশ্চিন্ত হয়ে নেন গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওজন বাড়িয়ে ফেলেননি তিনি। তিনি ভেবে আনন্দ পান যে, তাঁর এই ফিটফাট দুরস্ত ভাবখানা বেশ একটা চমৎকার পার্থক্য সৃষ্টি করে রাখে সমতলের সামরিক বাহিনীর সুখপোশাকি অনেক অফিসারের থেকে ; ওদের অনেকেই যুদ্ধের কল্যাণে অফিসার, ওয়েস্ট পয়েন্টের ধূসর দেওয়ালগুলো চোখেও দেখেনি কোনকালে। এই তো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি সোজা হয়ে, বিনা আয়াসে, যেন বারান্দায় উত্তাপটা একশো পাঁচ নয়, মাত্র ষাট ডিগ্রি।

—'যা গরম,' বলে উঠলেন মাইলস্‌। তাঁর ধুলোমাখা দেহ আর ঘামে-ভেজা ভুরুর কৈফিয়ত দিলেন অস্বস্তিভরে। 'ঘাঁটিতে মনে হচ্ছে একটু ঠাণ্ডা।'

—'যে যেমনভাবে সইয়ে নেয়।' হাসলেন মিজনার। 'অভ্যাস হয়ে যায় সমতলে —গরম, ঠাণ্ডা, সেই একই ব্যাপার। বেগ দিচ্ছে নাকি আপনার লালমুখোরা?'

শান্তভাবে মাথা নাড়লেন মাইলস্‌। মিজনার বারান্দার ছায়ায় উঠে আসতে অনুরোধ জানালেন। দু'জনে বসলেন অফিসারদের মেস-বাড়ির সামনে। মদ চেয়ে পাঠালেন মিজনার।

—'শুধু একটা শরবত।' মাইলস্‌ বললেন। কুচকাওয়াজের মাঠের দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি, বেঁটে একটা পাইনগাছের ছায়ায় দুটি তরুণ লেফটেন্যান্ট একেবারে ঘিরে ধরেছে একটি মেয়েকে। মেয়েটি হাসছে। গরমের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। মেয়েটির হাসিতে আক্রোশ জেগে উঠল মাইলসের মনে। শুকনো হাওয়ায় এত স্পষ্ট তার তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ। আগে কখনো দেখেননি তিনি মেয়েটিকে। তারপরেই তাঁর মনে হল, ওই রকম কেউ, একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন লোক যদি আসে তাঁর এজেন্সিতে, তাকে নিয়ে লুসি আর ট্রু-ব্লাডদের সঙ্গে খেতে বসে রাতে, কি ভালই না হয় তাহলে! এক রোমান ক্যাথলিক পুরুত— যারে উত্তর আর পুবের যজমানদের ওখানে—দুটো বোঝাই খচ্চর আর গাধা নিয়ে

রাতের আশ্রয় নিয়েছে ঘাঁটিতে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কুয়োর ধারে, অবয়বহীন লম্বা লাঠির মত, হাস্যমুখর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে নিঃসঙ্গ দৃষ্টিতে। লোকটার জন্য একটা আকস্মিক আত্মীয়তাবোধ জেগে উঠল মাইলসের মনে, অপরের দুঃখ আর বেদনার একটা আকস্মিক উপলব্ধি।

শরবত খেয়ে তিনি একটু সুস্থ বোধ করলেন। একটু একটু করে খেতে খেতে মিজনারকে সংক্ষেপে বললেন তাঁর অশান্তির কথা।

—'তাহলে আপনার ধারণা, 'ক্ষুদে-নেকড়ে' আবার বদমাইশি শুরু করতে চায়?' মাইলস্ শেষ করতেই ঘাড় নাড়ালেন মিজনার।

—'হয়তো তা নয়, কিন্তু অবস্থাটা তো আয়ত্তে রাখতে হবে।'

—'নিশ্চয়ই, আমি একমত আপনার সঙ্গে।' সহজভাবে বললেন মিজনার। 'কড়া দাওয়াই' ওই 'কুকুর-সেনা'টা। আমি লড়েছি ওর সঙ্গে উত্তরে। যুক্তি দিয়ে পারবেন না কোন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে, একবার বুনো বদমাশ বনে গেলে আর পরিবর্তন করানো যায় না ওদের। যারা মরে যায়, ভাল একমাত্র তারাই। কিন্তু সত্যি সত্যি ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। এখানে ঘাঁটি রয়েছে, আমার হাতে রয়েছে তুখোড় ফৌজ; আর এমন কি বিদ্রোহ যদি ছড়িয়েও পড়ে, প্রয়োজন হলে এই ঘাঁটি আমি টিকিয়ে রাখতে পারব এক মাস পর্যন্ত।'

শুধরে নিয়ে বললেন, 'দু'মাস পর্যন্ত।' মনে মনে বললেন 'একবার চেষ্টা করেই দেখুক না কেন ওরা।'

—'না, না, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে বলে ভয় করিনে আমি।' তাড়াতাড়ি মাইলস্ বলে উঠলেন। 'সে রকম কিছুই নয়। এজেন্সির সব-কিছুই ভালভাবে চলছে। সত্যি বলতে কি, সপ্তাহে সপ্তাহে পরিবর্তনও চোখে পড়ছে কয়েক মাস ধরে। ব্যাপারটা শুধু এই যে উত্তরের এই ইণ্ডিয়ানরা সংরক্ষিত এলাকার আইন-কানুনে অনভ্যস্ত। শাস্তি ওদের ভোগ করতেই হবে তিনজন পালিয়ে যাওয়াতে। ওদের বুঝতেই হবে যে একবার যখন সংরক্ষিত এলাকায় এসেছে, তখন থাকতেই হবে চিরকালের জন্যে।'

—'আমি একটা দল পাঠিয়ে দেব ওদের গ্রামে।' মিজনার হাসলেন। 'ওদের পড়িয়ে শোনাব আইনকানুন, আর শায়েস্তা করার জন্য সর্দারগুলোকে ডেকে পাঠাব আপনার অফিসে। কোন্ ধরনের শাস্তি দেবেন ওদের, আপনি ভেবে রাখবেন এই ফাঁকে। আর, সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে এজেন্ট মাইলস্, শাস্তিটা যেন কড়া হয়। আমি চিনি এই হতভাগা 'কুকুর সেনা'দের।'

—'আমি সতর্ক থাকব।' অনিশ্চিতভাবে বললেন মাইলস্।

—'আমি সতর্ক থাকি না কখনো।' এবারে কর্নেলের কথাটা শোনাল অভিভাবকের মত। 'শাস্তি দিন ওদের, আমরা পিছনে থাকব আপনার। এ-সব অঞ্চলে ফৌজ এখনো ভালো-দাওয়াই—'

যে ফৌজি দলটা গেল তার মধ্যে আছে সার্জেণ্ট জোনাস কেলি, প্রাইভেট রবার্ট ফ্রিজ আর স্টিভি জেস্কি। স্টিভি জেস্কি অনেকটা বে-সরকারী স্কাউট। লোকটা ঘুরে বেড়ায় কেল্লার আশেপাশে, নিজের যেটুকু যোগ্যতা আছে তার বদলে যোগাড় করে নেয় একটু ঘুমোনোর জায়গা, খাবারদাবার কিছু ; আর চুরি করে যোগাড় করতে পারলেই মদ গিলে নেয়। অনায়াসে অবলীলাক্রমে মিথ্যে কথা বলে যায় লোকটা যে কোন নামজাদা স্কাউটের মতই—যে-সব স্কাউটের জীবনচরিত ছাপা হয় পূর্বাঞ্চলের গোটা ছয়েক খবরের কাগজে বার ছয়েক করে। চল্লিশ সেণ্টের পাইট বোতলের কড়া হুইস্কি কিনে দিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিথ্যের তুবড়ি ছড়িয়ে যেতে পারে যে-কোন অচেনা লোকের কাছেই।

নোংরা, পুরনো, বোঁটকা গন্ধ চামড়ার পোশাক তার পরনে, একটা ইণ্ডিয়ানের মাথার পুরনো চামড়া, আর লম্বা লম্বা চুল—পাকাপোক্ত স্কাউট আর ইণ্ডিয়ান শিকারীর পেশাদার চিহ্ন আর পরিচয়পত্র। নাকের উপর বড়সড় একটা আঁচিল, তামাক টেনে টেনে লালচে দাগ পড়েছে মুখ থেকে দাড়ি ছাড়িয়ে শার্টের আধাআধি পর্যন্ত। কিন্তু তার যা-কিছু সামান্য কৃতিত্ব, তার মধ্যে একটি হচ্ছে শী-এন ভাষা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান।

সে জ্ঞানটা অতি সামান্য, কাজ-চলা গোছের। সে কিন্তু একেই পাকা দোভাষীর পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করে। ইণ্ডিয়ানদের ঐশ্বর্যময়, অপরূপ, লীলায়িত ভাষাটা তার কাছে অর্থহীন বর্বরের প্রলাপমাত্র, আর তর্জমাও করে সে তেমনি। সত্যি বলতে কি, তার ইংরেজি জ্ঞান এত সামান্য যে ইণ্ডিয়ানদের সব কথা বুঝে উঠতে পারলেও ঠিক ঠিক তর্জমা করে উঠতে পারে না সে। আর ভুল ধরিয়ে দেবার মত লোকও অল্পই ; দুনিয়ার সর্বত্র দখলদারি ফৌজের মতই এখানকার ফৌজও অতি সামান্যই জানে বিজিত দেশের জনগণের ভাষা।

সৈনিক দু'জনের আগে আগে চলল সে ঘোড়ায় চড়ে। তারা যে দূরত্ব বজায় রাখছে তার কারণ আছে। চাপাপড়া দুর্গন্ধ জাগিয়ে তোলার আর সাধারণ গন্ধ বাড়িয়ে তোলার পক্ষে আবহাওয়াটা যথেষ্ট গরম। সার্জেণ্ট কেলি আর প্রাইভেট ফ্রিজ দু'জনেই রোদে-পোড়া জলে-ভেজা মানুষ, বহুকাল কেটে গেছে তাদের এই সমতল অঞ্চলে। তাদের গায়ের চামড়া তেল-চকচকে তামাটে, হালকা ছোট ছোট চোখ। ফৌজি জীবনটা তাদের কাছে একটা ব্যবসার মত, এতকাল ধরে ফৌজে আছে কেন, কিসের জন্যে, এ-সব প্রশ্ন জাগেই না তাদের মনে। যোগ্য আর তৎপর দু'জনেই : অশান্তি ডেকে আনবার আগ্রহ নেই, কিন্তু অশান্তি উপস্থিত হলে এড়িয়ে যাবার লোক তারা নয়। স্কাউটকে রক্ষা করা তাদের কাজ, ঠিক সেই কাজই করে যাবে তারা। তারা যে অল্প-বিস্তর শত্রুভাবাপন্ন ইণ্ডিয়ানদের শিবিরে চলেছে, তার জন্য বিশেষ কোন বিকার নেই তাদের মনে। যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা নিরঙ্কুশ। হুকুম যদি পায় এমনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে পারে জাহান্নমেও, ঠিক এমনি নির্বিকার ভাবেই।

তারা কথা বলছিল নিজেদের মধ্যেই—স্কাউটকে বাদ দিয়ে। চমকদার উর্দিপরা ফৌজি লোকেরা তাকে বাদ দিয়েই যে কথাবার্তা বলবে এতে অভ্যস্ত স্কাউটটা। ভ্রাম্যমান পাদরির কাছে হালে স্বীকারোক্তি দিয়েছে সার্জেন্ট কেলি। ফ্রিজকে সে বলল, 'বিধর্মী মেয়েমানুষের কাছে আর যাচ্ছি না, বুঝলে ; ওদের অন্তঃকরণের চেয়েও খারাপ ওদের আত্মা।'

—'আপাচে মেয়েদের কাছে আর যাননি তাহলে।' ফ্রিজ বলল খোঁচা দিয়ে। 'আমরা যেমন করে সহজে হাতের দস্তানা খুলি ঠিক অমনি করে বুক খুলে দেখায় ওরা।'

—'তুমি একটা মিথ্যেবাদী।'

—'তাই নাকি ? মাইরি বলছি, যিশুর দিব্যি ! লাল অথবা কালো যে মেয়েমানুষই হোক, মেয়েমানুষ না থাকার চেয়ে তো ভাল। শী-এন মেয়ে চেখে দেখেছেন কখনো, সার্জেন্ট ?'

—'চাখনি তুমিও। সাবধান করে দিচ্ছি, চোখ সরিয়ে নিও ওদের দিক থকে।'

—'দূরেই থাকব ওদের থেকে।' ফ্রিজ বলল। 'কিন্তু হতচ্ছাড়া কেল্লায় এতদিন থাকতে থাকতে চোখ দুটোই যে কাজ করে দেয় আমার হয়ে।'

—'মেয়েছেলের দিকে তাকানোর জন্যে কখন-না এক 'কুকুর-সেনা' দু' ফাঁক করে দেয় তোমার গলাটা।'

মাটিতে থুথু ফেলল ফ্রিজ। 'সব বেজন্মা লাল-মুখোই একই জাতের। অনেক খাসা মেয়েমানুষ দেখেছি ওদের মধ্যে। কিন্তু বুড়িয়ে যায় শুকনো আপেলের মত।'

—'এক শী-এন মেয়ের সঙ্গে ছিলাম আমি।' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ফেলল কেলি।

—'তাই নাকি ? কোথায় ?'

—'ভুলে যাওয়াই ভাল ও কথা।' উত্তর দিল কেলি। 'ভেব না কিন্তু, সবাই একই ধরনের। বড় কড়া দাওয়াই ওই 'কুকুর-সেনা'রা ; কোমাঞ্চে, পনি, শূ কি কিওয়া ইণ্ডিয়ানদের মত নয়। গর্বিত, নিঃশব্দ জাত ওরা, ঠিক আইরিশদের মত।'

—'নিঃশব্দ কোন আইরিশ আমার চোখে পড়েনি কখনো।' ফ্রিজ বলল।

—'আত্মার এক গভীর নৈঃশব্দ্য। তুমি তা বুঝতে পারবে না।'

স্কাউট হাত না-তোলা পর্যন্ত ঘোড়া চালিয়ে এল তারা। সামনে বেঁটে বেঁটে গাছের সারি, তারই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল চামড়ার 'টিপি'গুলোর উঁচু উঁচু চুড়ো।

জেস্কি বলল, 'ওই যে, ওই তো।'

—'আমি আগে যাচ্ছি।' কেলি বলল হুকুমের ভঙ্গিতে। 'দস্তুরমত সমীহ করে ওরা উর্দি দেখলে।'

—'গুলি চালিয়ে ফুটো করে দিতে দেখেছি অমন 'দস্তুরমত সমীহ করাকে'।'

চাপা কণ্ঠে হেসে উঠল জেস্কি।

পাইন গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল ছোট দলটা। একটা কুকুর ডেকে উঠল। দেখতে পেল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটছে ক্যাম্পের দিকে। পিস্তলের খাপের ঢাকনাটা আলগা করে নিল দু'জনে।

—'বন্দুকটা নিচের দিকে করে নাও।' কেলি বলল স্কাউটকে।

শুকনো নদীর পারে শী-এন গ্রামখানাকে বসানো হয়েছে অর্ধবৃত্তাকারে, ইংরেজি 'C' অক্ষরের মত। বৃত্তের বাইরে বাঁধা রয়েছে ঘোড়াগুলো একটা ছিটে-বেড়ার ঘেরের মধ্যে। স্কাউট আর সিপাই দু'জনকে এগিয়ে আসতে দেখে পুরুষেরা দৌড়ে বেরিয়ে এল 'টিপি' থেকে, কারও কারও হাতে অস্ত্রশস্ত্র। গায়ে তাদের সামান্যই জামাকাপড়, কয়েকজনের পায়ে পট্টি, আর সকলের শুধুই নেংটি পরনে। অধিকাংশই শীর্ণ, ক্লান্ত চেহারা, মাথায় লম্বা, চওড়া কাঁধ, কঠোর মুখশ্রী। আর সংখ্যায়ও বেশি নয় তারা। সব মিলিয়ে তিনশোজনেরও বেশি হবে না গ্রামখানায়।

হাত উঁচু করে ঘোড়া চালিয়ে এল স্কাউট আর সিপাই দু'জন। ক্যাম্পের সীমানার মধ্যে আসতেই ঘিরে দাঁড়াল ইণ্ডিয়ানরা। তাদের বলিরেখাঙ্কিত মুখে ঘৃণার চেয়ে কিন্তু তিক্ত কৌতূহলের ছাপই স্পষ্ট। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কেটে যেতেই ফিরে এল ছেলেমেয়ের দল। উঁকি মারতে লাগল 'টিপি' থেকে, পুরুষগুলোর পায়ের ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে। তাদের চঞ্চল কালো চোখ, জটাপড়া চুল আর তামাটে রঙ দেখে কেলির মনে পড়ে গেল ছেলেবেলাকার রূপকথার জগতের প্রায়-ভুলে-যাওয়া প্রেত-শিশুদের কথা। মেয়েরা কিন্তু দূরেই রইল, হয় দাঁড়িয়ে রইল ঘেরের ঠিক ধারটায়, নয়ত ঢুকল গিয়ে যার যার ডেরায়।

—'সর্দার, সর্দারকে চাই।' কেলি বলল। 'কথা বল সর্দারের সঙ্গে—ওদের মোড়লের সঙ্গে।' ঘাড় ফেরাল স্কাউটের দিকে। 'সর্দার কোথায় জিজ্ঞেস কর। বুঝিয়ে দাও ওদের, কথা বল ওদের সঙ্গে।'

জেস্কি বলে গেল শী-এন ভাষায়। তিন-চারজন বয়স্ক পুরুষ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল কেলির ঘোড়ার কাছাকাছি।

—'ওদের বল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'কে চাই।' কেলি বলল।

এক বৃষস্কন্ধ ইণ্ডিয়ান নমস্কার করল মাথা ঝুঁকিয়ে।

ঘোড়া থেকে নেমে ইণ্ডিয়ানটির দিকে হাত বাড়িয়ে কেলি বলল, 'দেখা হয়ে খুশি হলাম।' করমর্দন করল তারা দু'জনে, তারপর সেপাই আর স্কাউট সকলেই করমর্দন করল অপর সর্দারদের সঙ্গে।

—'ওদের বল, গোলমাল শুরু হয়েছে।' কেলি বলতে শুরু করল। 'গোলমাল আমরা করতে ভালবাসি না, কিন্তু গোলমাল হয়েছে এ-কথা ঠিক। লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে। ওদের বল, কর্নেলের হুকুম, ওদের এজেন্সিতে যেতে হবে হাজিরা দিতে, যেতে হবে সবাইকে, কথা বলতে হবে এজেন্ট মাইলসের সঙ্গে। বল যে মহান শ্বেতাঙ্গপিতা কথা বলতে চান ওদের সঙ্গে।'

ভাঙা-ভাঙা শী-এন ভাষায় তর্জমা করে গেল জেস্কি। ভুরু কোঁচকাল সর্দারদের মধ্যে দু'জন। বুড়ো 'ভোঁতা-ছুরি' কথা বলল আস্তে আস্তে, থেমে থেমে ; আর জেস্কি আর-একবার চেষ্টা করল শী-এন কথাগুলো বুঝতে।

মাটিতে থুথু ছিটিয়ে কেলির দিকে ফিরল জেস্কি, 'আমাকে ঠাট্টা করছে হতভাগা 'কুকুর-সেনা'রা। ওরা যাবে না এজেন্সিতে। কর্নেলের উচিত ছিল, ফৌজ পাঠিয়ে দু-চারটে গুলিগোলা চালানো। ওই জিনিসটাই ওরা শুধু বোঝে।'

—'আবার বল ওদের।' সার্জেণ্ট বলল।

ফ্রিজ বলল, 'আমার মনে হয় না জেস্কির কথা বুঝতে পারছে ওরা।'

—'আলবত পারছে।' ফুঁসে উঠল জেস্কি। 'দরকার হলে মরার ভান করে না এমন 'নিগার' দেখতে পাবেন না কখনো।'

—'কথা বল ওদের সঙ্গে।' হুকুম করল কেলি।

সর্দাররা কথা বলল আস্তে আস্তে, খুব কষ্টের সঙ্গে। জেস্কি বলল, 'ওরা ক্যাম্প তুলে দিচ্ছে, যাচ্ছে নদীর উজানে খানিকটা দূরে। জাহান্নমে যান গে, চুলোয় যান গে এজেন্ট।'

ঘাড় নাড়ল কেলি। মৃদুস্বরে বলল, 'আমি কিন্তু খুশি, পাদরিমশাই এসে শুনেছেন আমার পাপের কথা। এবার ঘাঁটিতে ফিরব আমরা।'

মাইলস্ ডার্লিংটনে ফিরে যাওয়ায় খুশি হলেন কর্নেল মিজনার। মাইলস্ আমতা আমতা করবেন, অ্যাঁ উঁ করবেন, এলোমেলো বকবেন, আর অবশেষে দয়া ফলাতে যাবেন ইণ্ডিয়ানদের উপর। এই যেমন, 'বি' কোম্পানির ক্যাপ্টেন চার্লস্ মারেকে বলছিলেন মিজনার, 'ততক্ষণে, আগুন-ধরানো সারি সারি রাঞ্চ-বাড়ি, আর মাথার চামড়া-ছোলা মৃতদেহগুলো প্রমাণ দিতে থাকবে ইণ্ডিয়ান দপ্তরের বিজ্ঞ নীতির। আর যতদিন ওঁরা বুড়োহাবড়া কোয়েকারগুলোর হাতে ফেলে রাখবেন এজেন্সিগুলোকে, ততদিন এ ধরনের ব্যাপার ঘটবেই।'

—'কিন্তু এখনো পর্যন্ত তো কোন হিংসাত্মক কিছু ঘটেনি।' সাহস করে বললেন মারে।

—'সময় আসুক, ক্যাপ্টেন, যখন আমার মত এত কারবার করবে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে, তখন বুঝতে পারবে ইণ্ডিয়ানদের হাতের কাজ শুধরে নিতে বড্ড দেরি হয়ে যায় ; কিন্তু তাকে বাধা দেওয়া যায় আগে থেকে।'

—'তাহলে আপনি ওদের ঘেরাও করবার অনুমতির জন্যে তার করতে চান ওয়াশিংটনে ?'

—'এই সংরক্ষিত এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্যে ঢালা হুকুম আগেই আমার নেওয়া আছে। এটা আমার কর্তব্য ; একদল 'কুকুর-সেনা'কে যদি যথেচ্ছ ঘুরতে দিই তাহলে সেটা হবে আমার কর্তব্যে অবহেলা। গুষ্টিসুদ্ধ ওদের জেলে পুরলেই আমার কর্তব্য করা হবে। আর-কিছু দরকার নেই আমার।'

মাথা নোয়ালেন ক্যাপ্টেন মারে। মিজনারকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু মিজনার তার ওপরওয়ালা, তাই তিনি শুধু মাথাটাই নোয়ালেন, আর মনে মনে ভাবলেন, ফৌজি দলের সঙ্গে পাঠিয়ে গোটা গ্রামসুদ্ধ শী-এন ইণ্ডিয়ানদের গ্রেপ্তার করার ভারটা যেন তাঁর ওপরেই না পড়ে। ন্যায়-অন্যায় খুব বেশি নাড়া দেয় না তাঁকে ; কিন্তু তিনি হচ্ছেন সেই:ধরনের অফিসার যাদের একটা নারীসুলভ দুর্বলতা থাকে নিজের সৈন্যদের জীবন সম্পর্কে। এই শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন, আর পুরোপুরি বিশ্বাসও করেন যে, ভাল অফিসারের কর্তব্য হচ্ছে নিজের সৈন্যদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া নয়, তাদের বাঁচিয়ে রাখা। আগেও তিনি লড়েছেন 'কুকুর-সেনা'দের সঙ্গে। তাঁর মতে গোটা রেজিমেণ্টও শী-এন গ্রামখানাকে জেলে পুরবার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

—'তোমার কোম্পানি নিয়ে যাও, ধরে আনবে ওদের।' মিজনার বললেন।

—'স্যর ?'

—'বললাম তো ধরে আনবে ওদের, প্রয়োজন না হলে বলপ্রয়োগ করবে না, কিন্তু যদি করতে হয়—'

—'আমার কোম্পানি নিয়ে, স্যর ?'

—'তোমার কোম্পানিই যথেষ্ট মনে হয়। এক কোম্পানি ঘোড়সোয়ার নিয়ে যদি কয়েকটা অসভ্য বর্বরকে গ্রেপ্তার করতে না পারি, লজ্জার কথা তাহলে।'

—'ওরা শী-এন, স্যর, 'কুকুর-সেনা'র দল।' অনিশ্চিতভাবে বললেন মারে।

—'তা জানি, ক্যাপ্টেন। তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক—'

—'ভয় পাইনি, স্যর।' নিস্পৃহ কণ্ঠে মারে বললেন, 'গ্রামের সবাইকে আনতে হবে, না, শুধু পুরুষগুলোকে ?'

—'শুধু পুরুষগুলোকে। মাইলস্ যা বললেন, তাতে পঞ্চাশজনের বেশি হবে না। বুড়োগুলোর জন্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

—'যদি বাধা দিতে চায় ওরা ?' সহজভাবে প্রশ্ন করলেন মারে। 'তাহলে কি গ্রামের মধ্যে ঢুকব ? গ্রামে ওদের মেয়েরা আছে, ছেলেপুলেরা আছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন মিজনার, 'সঙ্গে একটা কামান নিও। গোটা দুই গোলা ফেলবে। তাহলে বেরিয়ে আসবে সুড়সুড় করে।'

—'গোলা তো মেয়ে-পুরুষ বিচার করবে না।'

—'তুমি তোমার নির্দেশ পেয়ে গেছ, ক্যাপ্টেন।' মিজনার বললেন।

আর তখনই উঠে দাঁড়ালেন মারে, বেরিয়ে এলেন স্যালুট করে।

গ্রামটা যেখানে ছিল সেই নদীর চড়ায় কামান থাকা সত্ত্বেও 'বি' কোম্পানি নামবার সময় হৈচৈ হল সামান্যই। কিন্তু মারে যা ভেবেছিলেন, তাই হল। আগেই সরে গেছে গ্রামটা। জঙ্গলগুলোর দিকে নজর রেখে ঘোড়সোয়াররা কিছুক্ষণ এগোল ধুলোর মধ্যে সার বেঁধে ; তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন মারে।

তারা এগুতে লাগল খুব ভোরে। বালির উপর দিয়ে শী-এনদের টেনে নিয়ে যাওয়া গাড়ির দাগ চিনতে পারা যায় অনায়াসেই। তারা এগিয়ে চলল তাই ধরে ধরে। এই আদিম ধরনের শ্লেজ গাড়িগুলো তৈরি আড়াআড়ি খুঁটি দিয়ে, বাঁধা থাকে ঘোড়ার সঙ্গে, চলে খুবই আস্তে আস্তে। তাই মারে নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবেন ওদের। সত্যি বলতে কি, তাঁরা সাত কি আট মাইল যেতে না যেতেই একটা উঁচু ঢিবির উপরে উঠে দেখতে পেলেন ইণ্ডিয়ানদের, থানা গেড়েছে নিচে।

ঘরগুলো খাটিয়েছে একটা অপরিসর শান্তস্নিগ্ধ উপত্যকায়। ভালভাবে গাছ-পালায় ঢাকা জায়গাটা, রোদের তাপ থেকে আড়াল করা কিছুটা, ছোট একটা ঝরনা বয়ে চলেছে মাঝ দিয়ে। উপত্যকার সবুজ-শ্যামল প্রশান্ত চেহারা দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটিয়ে ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত সৈন্যদের মনে হল এ যেন শান্তি-তৃপ্তির এক স্নিগ্ধশীতল রাজ্য। ঢিবির চুড়োর চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল তারা, স্থির হয়ে বসে রইল ঘোড়ার পিঠে, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল চারধারের এই নরককুণ্ডের মধ্যে ভাল জায়গা আছে ওই একটু মাত্র, শী-এনরা দখল করে নিয়েছে ওই জায়গাটুকুই।

—'আর এখান থেকে,' মারে ভাবলেন মনে মনে, 'ওদের যেতে হবে রেনো কেল্লার জেলখানায়।'

কাঁধ দুটোকে ঝাঁকুনি দিলেন তিনি, হুকুম দিলেন ঘোড়া থেকে নামতে ; গ্রাম-খানার দিকে কামানটার তাক ঠিক করতে বললেন গোলন্দাজদের। নদীর চড়ার দিকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ঘোড়াগুলোকে, সেখানে তাদের আড়াল হবে ভাল। সবাই ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের ঢালুর ধারে ধারে। ইণ্ডিয়ানদের গ্রেপ্তার করে কেল্লায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গে আনা হয়েছিল দুখানা ঢাকা-গাড়ি, ঘোড়া যুতে হাতের কাছে রাখা হল তাদের তৈরি করে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে সময় বেশি না দিয়ে, তাড়াতাড়ি পুরুষদের গাড়িতে পুরে নিয়ে কেল্লায় ফিরে যাওয়াই মারের মনোগত অভিপ্রায়।

সবাই জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে তোড়জোড় শেষ করবার সময়ের মধ্যেই কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা ভাল করেই টের পেয়ে গেল ফৌজের উপস্থিতি। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামনে পিছনে ঘুরে ঘুরে ফৌজের উপরে চোখ রাখতে লাগল ওদের জনকয়েক। স্বাভাবিক কাজকর্ম করে চলল অন্য সবাই, ঘোড়াগুলোকে দলাইমলাই করতে লাগল, বসে রইল, গল্পগুজব করতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্রের এক কোম্পানি ঘোড়সোয়ার গ্রামখানাকে ঘিরে রাখছে, একটা কামান তাক করে রেখেছে তাদের দিকে, এই সত্যটাকে যেন ইচ্ছা করেই উপেক্ষা করতে লাগল গোটা গ্রামখানা—মেয়েপুরুষ শিশুরা।

ওয়েস্ট-পয়েণ্ট থেকে লেফটেন্যাণ্ট ক্রীল্যাণ্ড রেনো-কেল্লায় সদ্য এসেছে, মাত্র তিন মাস আগে ; গত একশো বছরের ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই-এর কথা-কাহিনীতে ঠাসা তার মগজ। একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এখন সে। মারেকে জিজ্ঞাসা করল সাগ্রহে, 'কি মনে করেন, স্যর ? লড়াই হবে ?'

—'না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।' বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন মারে, 'আমি নিচে যাচ্ছি, লেফটেন্যাণ্ট। যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ওদের নিয়ে, একটুও নড়বে না।'

—'কিন্তু, স্যর—'

—'ভাবনার কিছু নেই ; ফিরে আসব আমি।'

মারে পাইপ ধরালেন, তারপর অন্যদের নিয়ে চললেন গ্রামের দিকে, যেন তাঁরা নিমন্ত্রিত সম্মানিত তিন অতিথি। তখনো ঠিক ভয় পাননি ক্যাপ্টেন মারে ; ভয় পাবার যথেষ্ট সময় আছে পরে, আর ভয়ের অনুভূতির ব্যাপারে তিনি অভ্যস্ত। তিনি সাহসী নন, এ তিনি জানেন, কিন্তু ইচ্ছামত চালিত করতে পারেন তাঁর দেহ-মনকে। তাঁর পক্ষে তাই যথেষ্ট। সহকর্মী অন্যান্য অফিসারদের চেয়ে তিনি ইণ্ডিয়ানদের ভাল করে বুঝতে পারলেও তারা তাঁর কাছে চিরকালের ধাঁধা। যে মানুষের দল লড়াই করে অসংখ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, লড়াই চালিয়েই যায় পরাজয় নিশ্চিত জেনেও, লড়তে লড়তে যারা অবশেষে নিশ্চিহ্ন হবার মুখে, বুঝতে পারেন না তিনি তাদের। তিনি কখনোই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, অধিকাংশ শাদা-মানুষের মতোই স্বাধীনতা আর মুক্তির ধারণা থাকতে পারে তাদেরও মনে। তিনি ধরে নিয়েছেন, এ হচ্ছে আদিম মানুষের দুর্ধর্ষতা, আর স-গোষ্ঠীর আত্মহত্যার প্রবণতা।

আর আজ তিনি দেখছেন তারই ভগ্নাংশ, যাতে সম্পূর্ণ হবে একটা গোষ্ঠীর আত্মহত্যা, সত্যি বলতে কি, তিনি নিজেই চলেছেন সেটা সম্পূর্ণ করবার সাহায্যে।

হাঁটতে শুরু করলেন তাঁরা, একটু পরেই গিয়ে পৌঁছলেন গ্রামে। কৌতূহলী শী-এনরা ভিড় করে দাঁড়াল তাঁদের চারপাশে, কিন্তু এগুতে বাধা দেবার কিংবা দুর্ব্যবহার করবার চেষ্টা করল না কোনরকম। 'ক্ষুদে-নেকড়ে' কোথায়, জেস্কি জিজ্ঞাসা করলে তাদের নিয়ে গেল ছোট্ট একটা অগ্নিকুণ্ডের কাছে, 'ক্ষুদে-নেকড়ে', 'ভোঁতা-ছুরি' আর 'জটা-চুল'—তিন বৃদ্ধ বসে আছে সেখানে। 'জটা-চুল' 'কুকুর-সেনা'দের সর্দার। যোদ্ধা-সম্প্রদায় এই 'কুকুর-সেনা'দের নামেই সমতল অঞ্চলে সাধারণভাবে পরিচিত শী-এনরা। এই 'কুকুর-সেনা'রা শান্তিরক্ষক আর সৈনিক দু'জনের কাজই করে, গ্রাম আর লড়াই-এর ময়দান—দু জায়গার কাজই চলে তাদের নির্দেশে।

তিন সর্দারই উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করল, তারপর ইঙ্গিত করল অগ্নিকুণ্ডের ধারে—তাদের কাছে গিয়ে বসতে।

যে সময়ে তোড়জোড় চলছে মাটির বুক থেকে গ্রামখানাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার, সেই সময়ে এই বৃদ্ধ তিনজন যে এমন গাম্ভীর্যের সঙ্গে, এমন প্রশান্তভাবে বসে থাকতে পারে তাই দেখে তাদের তারিফ করলেন মারে, ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বিশেষ করে তিন বৃদ্ধের বলি-চিহ্নিত, চিমড়ে ধরনের, মেটে রঙের মুখে এমন একটা কিছু আছে,—যা দেখে তাঁর মনে হল যে শাদা-মানুষেরা যত খুশি আঘাতই করুক না কেন, তা সহ্য করবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে এরই মধ্যে।

তামাক টানলেন তাঁরা সবাই মিলে। তারপর বলতে শুরু করলেন মারে, তর্জমা করে গেল জেস্কি : 'এ কাজ করতে আমি বাধ্য হয়েছি, কারণ আইনের বিধান এই। আইন কাকে বলে তা তোমরা জান। ওয়াশিংটনের মানুষদের কথাই আইন, তারাই গোটা জাতিকে শাসন করে। তারা বলেছে, সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের থাকতে হবে এই অঞ্চলে, এই সংরক্ষিত এলাকায়। তোমাদের গ্রাম থেকে পালিয়ে গেছে তিনজন, বাকি সকলেও তোমরা এজেন্সি ছেড়ে এসেছ। এ তো ঠিক নয়; এতে আইন ভাঙা হয়। তাই আমাকে গ্রামের পুরুষদের নিয়ে যেতে হবে কেল্লায়, যতদিন না সেই তিনজন ফিরে আসে, আর আমরা নিশ্চয় করে বুঝতে পারি তারা আইন ভঙ্গ করবে না, ততদিন আটকা থাকতে হবে সবাইকে।'

কথাগুলো নিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেল জেস্কি। মারে যা বললেন তাই আবার বলার জন্য, আর নিজের মনে শী-এন প্রতিশব্দ ঠিক করে নেবার জন্য প্রায়ই থামতে হল তাকে। বলা শেষ হলে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, পেঁচার মত তামাক-পাতার জাবর কাটতে কাটতে ঘাড় কাত করে রইল উত্তরের অপেক্ষায়।

অবশেষে মারেকে বলল, 'ঝামেলাই চায় 'কুকুর-সেনা'রা।'

—'কি করে বুঝলে তা?'

—'ওরা বুঝতে চাইছে না কিছু। ওরা মনে করে জেলে পুরবার মত এমন কিছু করেনি ওরা; গরমের হাত থেকে বাঁচতে একটু ঠাণ্ডা আর বেঁচে থাকবার উপযুক্ত জায়গাতেই চলে এসেছে শুধু। ওরা বলছে, ওরা কিছুতেই বাঁচবে না এদেশে, আর যদি মরতেই হয়, তবে এখানেই মরবে; এ জায়গা দেখলে ওদের ব্ল্যাকহিলস না যে মাথামুণ্ডু দেশ থেকে ওরা এসেছে তারই কথা নাকি মনে পড়ে। ওরা বলছে, পালিয়ে আসেনি ওরা। এজেন্সি থেকে যতটা দূরে এসেছে—সেই আট মাইল রাস্তা তো একটা শিশুও হেঁটে আসতে পারে।'

ঘাড় নাড়লেন মারে, তারপর অনেকক্ষণ ধরে পাইপ টানলেন জোরে জোরে। বললেন, 'ওদের বলে দাও, হুকুম মানাতেই হবে আমাকে, আমার সঙ্গে ওদের আসতেই হবে কেল্লায়।'

—'ওরা বলছে মেরে ফেলার জন্যে একজনকে জেলে পুরলে, তার মধ্যে যুক্তি থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন যুক্তিই নেই এ-ক্ষেত্রে। এখানেই ওরা থাকবে, কোন গোলমাল করবে না, এই ওদের মতলব।'

—'ওদের বলে দাও, ওরা যদি চুপচাপ না আসে, তাহলে জোর খাটাতে হবে আমাকে।'

সূক্ষ্ম হাসির রেখা ঝিলিক মেরে গেল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র প্রস্তর-কঠিন মুখে। একথা সে যেন অনেক আগেই জানত।

—'ওরা বলছে, আপনার যা অভিরুচি তাই আপনি করতে পারেন, ওদের যা কর্তব্য তা ওরা করে যাবে।'

আবার সেই করমর্দনের গম্ভীর পর্ব চলল। তার পরেই পাহাড়ের ধারে ফিরে এল স্কাউট আর সেপাইরা।

কেলি বলল, 'কামানটা যে আনা হয়েছে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে তার জন্যে।'

—'জিজ্ঞেস না করা হলে তোমার মন্তব্য প্রকাশটা বন্ধ রাখবে, সার্জেণ্ট।' খেঁকিয়ে উঠলেন মারে।

মাইলস্‌ যখন শুনলেন যে, কর্নেল মিজনার 'ভোঁতা-ছুরি'র লোকদের রেনো কেল্লায় নিয়ে এসে জেলখানায় পুরবার জন্য একদল ঘোড়সোয়ারকে পাঠিয়েছেন, তখন পরস্পর-বিরোধী দুটো অনুভূতি পীড়িত করতে লাগল তাঁকে। প্রথমটা হচ্ছে স্বস্তির; সেটা এই যে, ব্যাপারটা এখন তাঁর হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হল, এখন সেটা নিষ্পন্ন হবে যোগ্য সামরিক কর্তাদের হাতে, আর দ্বিতীয়টা লজ্জার, কারণ তিনি বোঝেন যে, মিজনারের কাজটা ন্যায়সঙ্গতও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়।

শী-এনরা সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে যায়নি, এ বিষয়েও কেউ নিশ্চিত নয় যে, ছেড়ে যাবার তোড়জোড় করছে তারা। সুতরাং, ইণ্ডিয়ান এজেণ্ট হিসাবে তারা এখনো তাঁরই অধীনে রয়েছে। আর যে-অপরাধ তারা করেনি, শুধু তাই নয়, যতদুর জানেন, অপরাধ হয়ত একেবারে নাও ঘটতে পারত, তারই জন্য তিনি এজেণ্ট হিসাবে মিজনারকে কেমন করে পঞ্চাশ-ষাটজন লোককে গ্রেপ্তার করতে দিতে পারেন। 'ভোঁতা-ছুরি'র গ্রামের তিনজন যে পালিয়েছে, এ সম্পর্কে 'জিমি ভল্লুকে'র মুখের কথা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ তাঁর নেই। আর সে-দিনটা এত গরম ছিল যে, জিমির চেয়েও মগজওয়ালা লোকে অবিশ্বাস করতে পারত তার চর্মচক্ষের সাক্ষীকে। সত্যিই কি দেখতে পেয়েছে সে তিনজনকে? কোন কল্পিত শত্রুতার শোধ তুলতে মিথ্যে বলছে না তো! নাকি, সত্যি সত্যিই তিনজন ফিরে যাচ্ছিল উত্তরে, নিছক শিকারের জন্য যাচ্ছিল না ওরা!

যতই তিনি ভাবতে লাগলেন ব্যাপারটা, ততই তাঁর মাথাটা ধরে উঠতে লাগল, ততই তাঁর বিবেক পীড়া দিতে লাগল, ততই বেশি করে ভারি হয়ে উঠতে লাগল সন্দেহের বোঝা। মানুষ তিনি খাঁটি। ইণ্ডিয়ান এজেণ্ট হিসাবে তিনি তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে চলতে চান, উপকার করতে চান তাঁর অধীন মানবজাতির ভগ্নাংশটুকুর। বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা যে প্রায় অসাধ্য, খাদ্য-বরাদ্দের যে কমতি পড়ে, তিনি যে যথাযোগ্য সাহায্যকারী থেকে বঞ্চিত, শিক্ষক, ছুতোর, কুয়ো খোঁড়ার লোক কিংবা ইঞ্জিনীয়ারের বাহিনীর চেয়ে সংরক্ষিত এলাকায় ঘোড়সোয়ারের রেজিমেণ্ট রাখাটাই যে সরকার পছন্দ করেন—এই সব বাস্তব ঘটনাতেও ইতরবিশেষ ঘটেনি কোন, আরও কঠিন করে তোলা ছাড়া কোন পরিবর্তনই হয়নি তাঁর কাজের।

ঘামে ভেজা অস্বস্তিকর সার্ট গায়ে, এই সব সমস্যা আর মাথার যন্ত্রণা নিয়ে তিনি

হাজির হলেন লুসির কাছে। লুসির তৈরি ঠাণ্ডা শরবত খেলেন, খানকয়েক উপাদেয় চিনির পিঠে খেয়ে তৃপ্তি বোধ করতে চেষ্টা করলেন।

লুসি বললেন, 'কিন্তু জন্, এও তো সত্য, একবার যদি ইণ্ডিয়ানদের রেনো কেল্লার জেলে ঢোকান যায়, তাহলে তো মিটে যাবে সব, তখন তো কে দোষী কে নির্দোষ বিচার করতে পারবে তোমরা ?'

—'সব-কিছু মিটবে না,' বিষণ্ণকণ্ঠে মাইলস্ বললেন, 'কয়েকজন দোষ করতে পারে বলে পঞ্চাশ-ষাটজন মানুষকে গ্রেপ্তার করতে পার না তুমি। সত্যি বলতে কি, ওদের কেউ কোন দোষ করেছে বলে তো আমার মনে হয় না। দোষের মধ্যে শুধু গ্রামটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে কটার-ক্রীক পর্যন্ত। আমার উচিত ছিল, প্রথম দিকেই ওই জায়গায় ওদের রাখা। সেখানে এই জঘন্য লাল ধুলো নেই, অন্তত একটু জল আছে, সবুজের চিহ্ন আছে একটু।'

—'কিন্তু যে তিনজন লোক পালিয়ে গেল ?' শান্ত গলায় বললেন লুসি। মনে করিয়ে দিলেন তাঁকে।

—'জাহান্নমে যাক সে-তিনজন ! মাপ করো লুসি, কিন্তু আমিও নিশ্চিত নই যে, তিনজন পালিয়েছে। কোন-কিছু সম্পর্কেই নিশ্চিত নই আমি।'

—'কিন্তু এজেন্সির সবাই তো জানে ওদের দলের তিনজন পালিয়েছে। যখনই মাথায় পালাবার ইচ্ছে জাগবে, তখনই যদি পালাতে পারে, তাহলে তো ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়বে ব্যাপারটা।'

—'তা ঠিক—।'

—'তাই তুমি 'ক্ষুদে-নেকড়ে' অথবা 'ভোঁতা-ছুরি'কে বলতে পার, ফিরে আসতেই হবে তিনজনকে, তাহলেই মিটে যাবে সব।'

—'কি করে ফিরিয়ে আনবে তারা ? না, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না লুসি, ব্যাপারটা তা নয়, মাত্র তিনটে লোক নিয়ে নয়, ব্যাপারটা গোটা সংরক্ষণ-পরিকল্পনার এই বস্তা-পচা নীতি নিয়ে, ব্যাপারটা গোটা জাতকে জেলে পোরা নিয়ে।' একটু ইতস্তত করলেন তিনি, তারপরেই মাথা নাড়লেন, 'না, শাস্তি দিতেই হবে তিনজনের জন্য। কিন্তু সে এভাবে নয়। মিজনার একটা কামান পাঠিয়েছেন ওখানে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা না বলে গোলা ফেলতে দেব না গ্রামের উপরে। আর আমি কি-ই বা করতে পারি এখন ?'

—'একজন কাউকে পাঠিয়ে দাও ওখানেই। এখনও ডার্লিংটনের এজেন্ট তুমিই।'

—'ঠিক বলেছ। সেগেরকে পাঠান যেতে পারে ; সর্দারদের সঙ্গে আমি কথা না বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতে পারে। মিজনারের ব্যবস্থা থেকে ভাল হবে এইটেই।'

মাথার টুপিটা চাপিয়ে সেগেরকে খুঁজতে বেরুলেন মাইলস্।

ইতিমধ্যেই সুস্থ বোধ করতে লাগলেন তিনি। পরিণাম যাই হোক না কেন, কিছু

অন্তত করেছেন এই সামান্য তৃপ্তিটুকু পেতে পারবেন তিনি। আর, জন-কয়েক সামরিক কর্মচারী ঘাবড়ে দিতে পারবে না সেগেরকে। এজেন্ট হিসাবে তাঁর নিজের এজেন্সিতে নির্দেশ দেবার আর আইন বজায় রাখবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

সেগের যতক্ষণ ঘোড়ায় জিন চাপাল, ততক্ষণ সাগ্রহে একটানা বলে গেলেন মাইলস্। সেগেরকে বলার উদ্দেশ্য যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর নিজের মনের অনিশ্চিত সমস্যাগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। তাড়াতাড়ি করতে অনুরোধ করলেন তিনি সেগেরকে। বড় কথা সেইটেই। যতদূর সম্ভব, আত্মসমর্পণ করবে না 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। কে কবে শুনেছে, যতক্ষণ না নিজেদের বক্তব্যকে অযৌক্তিক আর অন্যায় বলে মনে করে, তার আগে ভীরুর মত মাথা নিচু করে 'কুকুর-সেনারা'? তাই তিনি অনুরোধ জানালেন তাড়াতাড়ি করতে, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে নতুন করে লড়াই না হোক—অন্তত একটা হত্যাকাণ্ড এড়াতে। বোকার মত সেগের শুনে গেল মাইলসের একটানা অনুরোধ আর নির্দেশ, সব-কিছুর উত্তরে ঘাড়টা নাড়াল শুধু। বলল, 'আমার যতদূর সাধ্য তা আমি করব।'

'বি' কোম্পানি যেখানে ঘাঁটি গেড়েছে, সেই পাহাড়ের ধারে সেগের যখন ঘোড়ায় চড়ে এল, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারধার এত নিস্তব্ধ যে, প্রথমটায় তার মনে হল, শেষ হয়ে গেছে সব-কিছু; এখন মাইলস্‌কে নিজে নিজেই সন্ধি পাতাতে হবে তাঁর বিবেকের সঙ্গে। তারপর সেই আধো-অন্ধকারে চোখে পড়ল সৈনিকদের অচঞ্চল ছায়ামূর্তিগুলো। পাহাড়ের গোটা সানুদেশ জুড়ে নিঃশব্দে বসে আছে বন্দুক উঁচিয়ে। আর তাদের পিছনে, দূরে উপত্যকার বুকে নিশাচর পতঙ্গের মত ইণ্ডিয়ান গ্রামের আগুনের শিখাগুলো মিটমিট করছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সেগের। পাহারাদার চ্যালেঞ্জ করতেই জিজ্ঞাসা করল 'কর্তা কে এখানকার?'

—'ক্যাপ্টেন মারে।'

—'দেখা করতে চাই তাঁর সঙ্গে। আমি সেগের, এজেন্সি থেকে আসছি।'

গোটা দুপুর থেকে এখনো পর্যন্ত আক্রমণ বন্ধ করে রেখেছেন মারে। প্রথমে ব্যস্ত ছিলেন তোড়জোড়ের জন্য, তোড়জোড় শেষ হলে তিনি ব্যস্ত রইলেন পরিস্থিতির সামরিক-কৌশল বিচার করতে। তিনি কিন্তু জানেন যে, এর মধ্যে কোন কৌশলই জড়িত নেই—গোটাকয়েক গোলা ফেলা, তারপর গ্রামের দিকে এগিয়ে যাওয়া আর কয়েকজনকে বন্দী করা ছাড়া কিছুই করার নেই আর। দুপুর যতই গড়িয়ে যেতে লাগল, এই দীর্ঘসূত্রতার কোন ফলই ফলল না দেখে ততই ভারি হয়ে উঠতে লাগল তাঁর মেজাজ। এমন কি সার্জেন্ট কেলি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেয়ে গেল। একটা স্কাউট এক গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে তামাক পাতা চিবিয়ে থুথু ফেলছিল চারধারে, তাই দেখে একবার তো তিনি প্রায় জ্বলেই উঠলেন উন্মত্ত ক্রোধে। . .

আসল ব্যাপারটা এই যে, তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, ওদের অর্ধেককেও বন্দী করা অসম্ভব। শী-এনরা লড়বেই, তাঁকে হারাতে হবে জন দশ-বার লোক, আর কবর দিতে হবে নারী আর শিশুর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। অবশেষে এর পরিণাম গিয়ে দাঁড়াবে এক নিরর্থক নির্বোধ ইণ্ডিয়ান-লড়াইতে; সম্পূর্ণ মিটবার আগেই সমতলের অর্ধেক জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়বে দাবানলের মতো, পথের দু'ধারে ফেলে রেখে যাবে মৃত আর আহত মানুষ,—বিধ্বস্ত জীবনযাত্রা। এরই দায়িত্ব তাড়াহুড়ো করে তাঁরই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে ভয়ানক ঘৃণা জেগে উঠল তাঁর কর্নেল মিজনারের উপর—এমন ঘৃণা তিনি কোনদিন কোন মানুষকে করেননি। বুঝতে পারলেন, তিনি পড়েছেন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায়। আর নিম্নপদস্থ অফিসারদের উঁচুতে তোলা কিংবা সায়েস্তা করার ব্যাপারে সমতলের সৈন্যবাহিনীতে একজন কর্নেলের ক্ষমতা যে কতখানি সেটা তাঁর খুব ভালভাবেই জানা।

তাই প্রতি মুহূর্তে তিনি ঠেকিয়ে রাখছিলেন ঘটনার পরিণতিকে। অবশেষে সেগেরকে যখন দেখতে পেলেন, তখন তাঁর মনে হল যেন স্বয়ং ভগবান সাহায্য পাঠালেন তাঁকে। তিনি সেগেরকে সাগ্রহে স্বাগতম্ জানালেন।

সেগের বলল, 'নমস্কার, ক্যাপ্টেন, দেখছি একেবারে কাবাবের ভোজের আয়োজন করে ফেলেছেন; কিন্তু এখনো শুরু হয়নি খানাপিনা।'

—'পঞ্চাশটা 'কুকুর-সেনা'কে জেলে পোরা বন-ভোজনের মত সহজ নয়।'

—'কথাটা ঠিক বলেছেন। মনে হচ্ছে, বুঝতে পেরেছেন যে, আপনার কর্নেল একটু বেশিই এগিয়ে গেছেন এবারে।'

—'গেছেন নাকি?'

—'আমার ত তাই মনে হয়। এজেন্ট মাইলস্‌ও মনে করেন তাই। ইণ্ডিয়ান-দপ্তরও হয়ত তাই মনে করতে পারে। ওই খাপসুরত কামান থেকে যদি গ্রামের উপর গোলা ছুঁড়তে শুরু করেন তাহলে হয়ত মাশুল দিতে হবে অনেকখানিই। হয়ত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসবে ওয়াশিংটন, লক্ষ্য করবে ব্যাপারটা, এমন কি ঘায়েল করেও দিতে পারে কর্নেল মিজনারের মত কেষ্ট-বিষ্টুকে।'

—'হয়ত হবে,' মতামত প্রকাশ না করে বললেন ক্যাপ্টেন মারে; স্বস্তির হাসিটুকু তবু চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল তাঁর পক্ষে।

—'এখনো সংরক্ষিত এলাকার মধ্যেই আছে ইণ্ডিয়ানরা। তার মানে, তারা আছে এজেন্ট মাইলসের তত্ত্বাবধানেই, সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নয়। আর, মাইলস্‌ও বিশেষ করে সাবধান করে দিচ্ছেন আপনাদের, যদি কোন গোলমাল ঘটে তাহলে রেজিমেন্টের প্রতিটি অফিসারকে দায়ী করবেন তিনি। ওদের কাউকে গ্রেপ্তার করবার এক্তিয়ার আপনাদের নেই, আর তা কর্নেলও জানেন। এ-কথাগুলো লিখিত-ভাবে দিতে হবে আপনাকে?'

—'না, ঠিক আছে।'

—'এখানে সারারাত থানা গেড়ে থাকবেন নাকি আপনি ?'

—'থাকতেই হবে—অন্তত যতক্ষণ না কর্নেল মিজনারকে জানিয়ে নতুন নির্দেশ পাচ্ছি। কিন্তু আপনাদের ইণ্ডিয়ান মহোদয়দের বিরক্ত করব না আমি। চোখ রাখব শুধু। আর, কিছুই না।'

—'এই ব্যাপারটায় আপনার সাহায্য নেব, ক্যাপ্টেন।' মাথা নোয়াল সেগের। আমি নিচে যাচ্ছি এখন। চেষ্টা করব, যাতে সর্দারদের ক্যাম্পে এনে মাইলসের সঙ্গে কথা বলাতে পারি। অন্ধকারের মধ্যে থেকে কোন কিছু এগিয়ে এলে গুলি ছুঁড়বেন না কিন্তু।'

—'একটু ঝুঁকি নিচ্ছেন কিন্তু।' ক্যাপ্টেন সতর্ক করে দিলেন তাকে, 'আমরা কি করতে চাই তা ওরা জানে।'

—'জানে নাকি ? জঘন্য যা-কিছু করার ভারটা ছেড়ে দিলাম ফৌজের উপরেই। একটা সুযোগ নেব আমি। মনে হয় না যে ওরা গুলি করবে আমাকে।'

—'কথা বলার জন্যে জেস্কিকে নিয়ে যেতে চান সঙ্গে ?'

—'জেস্কিকে ? না, একটু-আধটু শী-এন আমি বুঝি, মনে হয় তাই যথেষ্ট। ফৌজের কেউ সঙ্গে থাকুক এ আমি চাইনে।'

—'বেশ—তাহলে যান। দায়িত্ব আপনার নিজের।'

মারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেল সেগের। কয়েক পা যেতেই হারিয়ে গেল অতল অন্ধকারে। শুধু শোনা যেতে লাগল ঘোড়ার খুরের শব্দ পরে তাও গেল মিলিয়ে। যেখান থেকে সেগের চলে গেল, সেখানেই বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন মারে। ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে মিটমিট করছে আলো, তাকিয়ে রইলেন তিনি ওইদিকে—অস্পষ্ট আলোয় আলোকিত টিপিগুলো, ঠিক জাপানি লণ্ঠনের মতো, ভিতরে গনগন করছে আগুন, আলো বেরুচ্ছে উপরের ফাঁক দিয়ে, যেখানে বাইসনের চামড়া ছিঁড়ে গেছে সেখান দিয়ে।

তাঁর কানে এল অন্ধকারে কোন্ দিক থেকে যেন স্কাউটটি বলে উঠল টেনে টেনে, 'মুণ্ডু উড়বে সেগের আহাম্মকটার। ঠিকই হবে, নিগারকে যে বোঝে না তার উপর আমার একটুও ছেদ্দা নেই, বাপু।'

সেগের ফিরে এল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। জিনের উপর থেকেই ঝুঁকে উদ্‌গ্রীব মারেকে বলল, 'সকালে আসবে সর্দাররা। খেতে দেবেন তাদের।'

—'নিশ্চয়ই দেব। কোন অসুবিধে হয়নি তো ?'

—'শুধু আমার ভাষাজ্ঞান নিয়ে। ওদের বালবাচ্চারাই যেভাবে কথা বলে তা বোঝাই আমার সাধ্যের বাইরে।'

পরদিন খুব ভোরে ঘোড়ায় চড়ে এজেন্সিতে এলেন কর্নেল মিজনার আর লেফ-টেন্যান্ট স্টিভেনসন। তাঁর নির্দেশ বাতিল করায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন মিজনার ; স্থির মস্তিষ্কে

যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারলেন, কতখানি মাশুল দিতে হত তাঁর কর্মপন্থায়। তিনি দেখলেন মাইলস্ তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বিপদ থেকে। কিন্তু এখন মাইলস্ নিজের হাতে যখন নিতে চলেছেন ব্যাপারটা, মিজনার চাইলেন কার্যাবলী লক্ষ্য করে যেতে, যাতে নিয়মমাফিক নথিপত্রের ইতি করে দিতে পারেন তিনি নিজের মত করে।

অফিসার দু'জন আসার আগেই ভরে উঠেছিল মাইলসের ছোট অফিসঘরটা। সেগের আছে, মাইলস্ আছেন, আর আছেন ট্রু-ব্লাড; এডমণ্ড গুয়েরিয়ের আছে দোভাষীর কাজের জন্য। অভিবাদন প্রায় না করেই ঘরে ঢুকলেন মিজনার, মাথা ঝাঁকালেন সকলের উদ্দেশে, বসলেন জানলার ধারে একটা চেয়ারে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন লেফটেন্যান্ট। ডেস্কের ধারে বসে পাইপে তামাক ঠাসতে লাগল সেগের। ডেস্কের পিছনে মাইলস্, ট্রু-ব্লাড তার খাতাপত্তর নিয়ে কোণের দিকে। একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুয়েরিয়ের বিনীতের মত, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনে, খড়ের টুপির চওড়া ধাবের চারপাশে আঙুল বুলিয়ে চলেছে কেবলই।

ইণ্ডিয়ানরা এসে পৌঁছবার আগের প্রায় আধ ঘণ্টা কথাবার্তা হল খুব সামান্যই; জায়গা থেকে প্রায় নড়ল না কেউ, একবার শুধু সেগের উঠল জানলাটা ভাল করে খুলে দেবার জন্য। আবহাওয়া নিয়ে বাতচিত হল সামান্য দু'একটা, ভুরুর ঘাম মুছবার পালা চলল অনেকক্ষণ ধরে; কিন্তু এ পর্যন্তই। মাইলস্ ঝুঁকে পড়লেন ডেস্কের উপর, তৈরি করতে লাগলেন একটা রিপোর্ট। কিন্তু বেশ বোঝা গেল, ঘাবড়ে গেছেন তিনি, অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছেন।

অবশেষে, জানলার দিকে ঘাড় নেড়ে সেগের বলল, 'ওই ওরা আসছে।'

প্রত্যেকেই ঘাড় ফেরাল দেখবার জন্য। বারান্দার দিকে ঘোড়ায় চড়ে আসছে তিনজন ইণ্ডিয়ান, সামনের দু'জন বৃদ্ধ, পিছনের জন মাঝবয়সী, বিরাট দেহ, মল্লযোদ্ধার মত মাংসপেশী, গভীর ক্ষতের চিহ্ন সারা মুখে। তারা আসছে ধীরে ধীরে, চিন্তিত-ভাবে, জিনের উপরেই ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে; আর তাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে আসছে এজেন্সির ছেলেপুলের একটা দঙ্গল। ঘরের কাছে এসে তারা ঘোড়া থেকে নামল, ছেলেপুলেরা তাদের ঘিরে দাঁড়াল, খালি পায়ের আঙুলগুলো ঢোকাতে লাগল ধুলোর মধ্যে।

—'মুখে দাগওয়ালা লোকটা 'কাক'।' সেগের বলল, ''কড়া দাওয়াই' লোকটা। তাই মনে হচ্ছে, হয়ত বিপদের আশঙ্কা করছে ওরা। লোকে বলে, টুইন ফর্কের লড়াইতে ও নাকি একবার খালি হাতেই ছ'টা লোককে মেরেছিল। অন্য দু'জন 'ক্ষুদে-নেকড়ে' আর 'বুনো-শুয়োর'।'

পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে সেগের সর্দারদের ভিতরে আসতে বাইরে চলে গেল। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত নিথর নিস্তব্ধ হয়ে রইল ঘরখানা। মাইলস্ লেখা বন্ধ করলেন।

ঘরে ঢুকে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করল শী-এনরা; যার যার জায়গা নিয়ে

দাঁড়াল দেয়ালের দিকে, তারপর অপেক্ষা করতে লাগল এজেন্টের বক্তব্যের জন্য। কিন্তু স্তব্ধতা বজায় রইল। পরে 'ক্ষুদে-নেকড়ে' কি যেন বলল, তর্জমা করে দিল গুয়েরিয়ের: 'ও জানতে চায় কেন ওদের ডাকা হয়েছে।'

হঠাৎ হেসে ফেললেন মিজনার। মাইলস্ বললেন, 'কেন ডেকেছি, তা ওর জানা আছে।'

—'বলছে, ও জানে না। বলছে, ওরা শান্তশিষ্ট হয়েই বাস করছে, কারুর কোন ক্ষতিই তো করেনি। যখন শাদা-সিপাইরা গ্রামের মাথার উপরে ঘাঁটি গেড়ে তাদের দিকে কামান তাক করেছে তখনো তারা শান্তশিষ্ট হয়েই আছে। এই জিনিসই শাদা-মানুষরা চায় না কি?'

এবার 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র দিকে ঘাড় ফেরালেন এজেন্ট মাইলস্। বললেন, 'তোমাদের তিনজন পালিয়ে গেছে। একজন আরাপাহো ওদেব দেখেছে উত্তবেব দিকে যেতে, সে জানে কে তারা। তুমি জান, আমার বিনা অনুমতিতে কোন ইণ্ডিয়ানের এলাকা ছেড়ে যাওয়া বে-আইনি। এখন তোমাব দলের দশজন যুবককে দিতে হবে আমার হাতে বন্দী হিসাবে, যাবা পালিয়েছে ইতিমধ্যে তাদের খুঁজতে বেরুবে সৈন্যেরা। পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে পারলে আমি মুক্তি দেব তোমাদেব দশজনকে।'

গুয়েরিয়ের শেষ করল তাব তর্জমা, অস্ফুটকণ্ঠে 'ক্ষুদে-নেকড়ে' কি যেন বলল 'বুনো-শুয়োর'কে। অপবজন ঘাড় নাড়ল। 'ক্ষুদে-নেকড়ে' মাথা ঝাঁকাল ধীরে ধীরে, এজেন্টকে বলল, 'মোটেই ঠিক হবে না সেটা। আপনি যা বলছেন, তা করতে পারব না আমি। হাজাবটা মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে এমন বিরাট একটা দেশে কেমন করে তিনটে মানুষকে খুঁজে পাবেন আপনারা? আপনাব এজেন্সির কোন চাকর-বাকব যদি পালিয়ে যায়, তাহলে আমি এসে কি আপনাকে আপনারই দশটা লোককে আমার হাতে তুলে দিতে বলব? যারা দোষ করল তাদের বদলে সাজা পাবে নির্দোষ—এই কি শাদা-মানুষেব কানুন? ও দশজন তো কোন দোষ করেনি। অথচ আপনি তাদের পুরে রাখবেন জেলে যতদিন না তারা সেই জেলখানাতে মাবা পড়ে। ফ্লোরিডার জেলখানায় কতজন শী-এনকে পাঠিয়েছেন আপনারা? তাদের একজনও ফিরতে পেরেছে? না, যে তিনজনকে কোনদিন আপনারা খুঁজে পাবেন না, তাদের জন্যে কখনোই আমি আর দশজনকে দেব না।'

এতক্ষণ ধরেই হাসছিলেন মিজনার। তর্জমা করতে করতে অস্বস্তিভরে নড়াচড়া করছিল গুয়েরিয়ের। ক্রুদ্ধকণ্ঠে মাইলস্ বলে উঠলেন, 'দশজনকে আমার হাতে দিতে হবে, নইলে বরাদ্দ খাবার আর পাবে না আমার কাছ থেকে। যতদিন না ওদের পাব, কোন খাবারই আমি দেব না তোমাদের। ওদের না দেওয়া পর্যন্ত উপোস করতে হবে তোমাদের। ওদের আমি চাই-ই, আর তা এই মুহূর্তে।'

মাথা নাড়ল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। 'ওদের দিতে পারি না আমি। উপোসের ভয়

দেখিয়ে লাভ নেই, আমরা তো উপোস করছি এখনি। কিন্তু ওদের আমি দিতে পারব না। শাদা-মানুষের বন্ধু আমি, বন্ধু ছিলাম অনেককাল। আমি দেখেছি শাদা-মানুষের সঙ্গে লড়াই করে মরার চেয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করা অনেক ভাল। আমার জন্যে আমি পরোয়া করি না, আমি বুড়ো হয়েছি, কিন্তু দেখছি আমার জাতের সামান্যই টিকে রইল। একটা গোটা জাত যখন মরে, সেটা অতি ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু মরতেই যদি হয় আমাদের, তাহলে যাকে আপনারা শাদা-মানুষের কানুন বলেন, তার হাতে মরার চেয়ে লড়াই করে মরাই ভাল।

'হয়ত ভাবছেন যে, আমি কিছুই জানি না ; কিন্তু ওয়াশিংটনেও গিয়েছি আমি, কথা বলেছি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে, করমর্দন করেছি তাঁর সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন, এবার আমাদের শান্তি স্থাপন করতে হবে ; সেই শান্তিই বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি আমি।'

কঠিনভাবে মাথা নাড়লেন মাইলস্। থেমে থেমে বলা গুয়েরিয়েরের কথাগুলো প্রায় শুনছিলেনই না তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল মিজনারের হাসির দিকে। কর্তৃত্বের বড়াই করে যে-লোক আইন মানাতে পারে না, তার প্রতি কর্নেলের তাচ্ছিল্যটুকু বুঝতে পারছিলেন তিনি।

—'তোমাকে দিতেই হবে ওই দশজনকে।' মাইলস্ বললেন, 'ওদের নিয়ে আসতে হবে এখানে, আর আনতে হবে আজকেই।'

রহস্যময় হাসি খেলে গেল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র মুখে। সে বলল, 'আমরা বন্ধু ছিলাম, এজেণ্ট মাইলস্ ; কিন্তু আপনি যা বলছেন তা আমি পারি না। আমি যা ন্যায় মনে করি তাই আমাকে করতে হবে। গোলমাল আমি চাই না ; আমি চাই না এই এজেন্সিতে রক্তপাত হোক। তবু আপনি যা বলছেন, তা আমি পারব না।'

—'তাহলে উপোস করতে হবে তোমাদের।'

অপর দু'জন শী-এন তাকাল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র মুখের দিকে। দাগওয়ালা লোকটার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ক্রোধে, কিন্তু 'ক্ষুদে-নেকড়ে' এত জোরে তার হাত চেপে ধরল যে আঙুলের দাগগুলো ফুটে উঠল চামড়ার উপর। তারপর প্রত্যেকের কাছে গিয়ে করমর্দন করল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'।

মাইলস্ বললেন, 'আজই আমি চাই দশজনকে।'

'ক্ষুদে-নেকড়ে' হাসল, 'গ্রামে ফিরে যাচ্ছি আমি। যা করণীয় তাই করতে হবে আমাদের। করতে হবে দু'জনকেই, এজেণ্ট মাইলস্। আমাদের কিছু লোককে আপনি খাইয়েছেন এই এজেন্সিতে, তাই এখানকার মাটি যদি রক্তে ভিজে যায়, খুবই লজ্জার কথা হবে সেটা। তবু যা আমাকে করতে হবে, আর যা আমি করতে চলেছি তা এই—আমি আমার দলবল নিয়ে চলে যাব ফিরে, যাব উত্তরে আমাদের সেই ব্ল্যাক-হিলের মাতৃভূমিতে। শান্তিপূর্ণভাবেই যেতে চাই আমরা। যতক্ষণ কেউ আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা না করবে, ততক্ষণ শান্তিপূর্ণভাবেই আমরা চলব। কিন্তু আপনারা যদি সৈন্য লেলিয়ে দিতে চান আমাদের পিছনে, তাহলে ধৈর্য ধরে থাকবেন

এজেন্সি ছেড়ে একটু দূরে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর যদি লড়তে চান, আমিও লড়ব, সেখানেই রক্ত ঢালতে পারব আমরা।'

নির্বাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন মাইলস্। মিজনার বললেন, 'কি করছেন মাইলস্, এখানে থাকতে থাকতেই ওদের ধরে জেলে পুরতে না পারলে ডাহা বোকামি হবে আপনার পক্ষে।'

—'ওদের যেতে দাও, সেগের।' নিস্পৃহকণ্ঠে মাইলস্ বলে উঠলেন।

—'এখান থেকে ওদের আপনি ছেড়ে দিতে চান, মাইলস্?'

—'ওরা এসেছে আমার অনুরোধে।' মাইলস্ উত্তর দিলেন, 'আমি বলেছিলাম, এসে ফিরে যাবার স্বাধীনতা থাকবে ওদের। এটুকুই করতে পারি আমি।'

যন্ত্রণাকাতর মাথাটা হাতের মধ্যে ধরে বসে রইলেন তিনি, আর অন্যেরা বেরিয়ে এল বারান্দায়। সেখানে গরম কম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা দেখল, ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল শী-এন তিনজন। দুলতে দুলতে মিলিয়ে গেল শীর্ণ ঘোড়াগুলো।

যাবার সময় একটু হেসে মিজনার মাইলস্কে বললেন, ' 'বি' কোম্পানি যেখানে আছে সেখানেই তাকে রেখে দেব আমি। এখনো হয়ত দরকার লাগতে পারে আপনার।'

ভেঙে পড়লেও মাইলস্ কোন উত্তর দিলেন না। একটু পরে নিচের টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিলেন কানসাসে, লরেন্সের ইণ্ডিয়ান দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উইলিয়াম নিকলসনকে :

'উত্তরের শী-এনদের সর্দার 'ক্ষুদে-নেকড়ে' ভয় দেখাইতেছে যে, গোটা দল লইয়া এজেন্সি ছাড়িয়া উত্তরে চলিয়া যাইবে। দলের সংখ্যা তিনশত। অনুগ্রহপূর্বক অতিদ্রুত নির্দেশ পাঠাইবেন।'

বিচলিত ও অধৈর্য হয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন উত্তরের। লুসি তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন কোয়েকার পাদরি এলকানা বিয়ার্ড আর তাঁর স্ত্রীকে। মাইলসের মনের অশান্তি দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন পাদরি-মশাই। শক্তসমর্থ ছোটখাট চেহারা পাদরি-মশাইয়ের, জলভরা দুটো নীল চোখ; বারবার আবৃত্তি করে চললেন তিনি—প্রেমের পথই শ্রেষ্ঠ পথ, সবাইকেই বিশ্বাস রাখতে হবে যে সব-কিছুই ঠিক হয়ে যায় আপনা-আপনি।

—'বুঝলেন, ভাই মাইলস্,' তিনি বললেন, 'নিজের বিবেককেই শুধু অনুসরণ করে চলতে পারে মানুষ।'

—'বুনো-বর্বর কখনো খ্রীস্টান-নীতি বুঝতে পারে না, এমন কি দীক্ষিত হলেও না।' লুসি বললেন শান্তকণ্ঠে, 'আমাদের চাই ধৈর্য আর প্রেম, এই কথাই তো বলি আমি জনকে; আর পরিণামে ঠিক হয়ে যাবে সব-কিছুই।'

—'নিশ্চয়ই।' ঘাড় নোয়ালেন পাদরি-মশাই।

টেলিগ্রামের উত্তর যখন এল প্রায় রাত হয়ে গেছে তখন। নিকলসন্ তার করেছেন :

'কোন ইণ্ডিয়ানই এজেন্সি ত্যাগ করিতে পারিবে না। ইণ্ডিয়ানদের সমগ্র পুনর্বসতি-পরিকল্পনার পক্ষে উত্তরের শী-এনদের এজেন্সিতে রাখা অবশ্য-কর্তব্য। কর্নেল মিজনারকে সংবাদ পাঠান।'

সেগেরকে ডেকে পাঠাবার আগে অফিসে বসে টেলিগ্রামটা অনেকক্ষণ ধবে বারবার করে পড়লেন মাইলস্। তারপর নিরুত্তাপ কণ্ঠে সেগেরকে বললেন রেনো কেল্লায় কর্নেল মিজনারের কাছে টেলিগ্রামটা নিয়ে যেতে।

সে রাতে একটুও শান্তি রইল না মাইলসের মনে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন অফিসে; আলোর চার পাশ ঘিরে মাছি উড়তে লাগল, ভন ভন করতে লাগল মশা, তাই দেখতে লাগলেন তাকিয়ে তাকিয়ে; নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন বারবার—কাজটা কি ন্যায়সঙ্গত হল, এর চেয়ে আর ভাল হত কি? কিন্তু মিজনার কাজের লোক। টেলিগ্রামটা পড়বার কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘোড়ায় জিন চাপাতে শুরু করল 'এ' কোম্পানি, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পরিচালনার ভার নিয়ে ক্যাপ্টেন উইণ্ট বেরিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন মারের সঙ্গে যোগ দিতে।

মিজনারের নির্দেশ দার্শনিকের মতই মেনে নিলেন মারে। ক্যাপ্টেন উইণ্টকে উপদেশ দিলেন তাঁর দববলকে চারধারে ছড়িয়ে সাজাতে, যাতে তাঁরা পুরোপুরি ঘিরে ফেলতে পারেন পূব দিকের ঢালুটাকে।

—'ওর বেশি ছড়িয়ে থাকাটা সুবুদ্ধির কাজ হবে না। টহলদারি ঘাঁটিগুলো বাড়িয়ে দেব আমি। যদিও বিশেষ দরকার হবে না তার। তুমি দেখতেই পাচ্ছ নিচে ওদের 'টিপি' আর অগ্নিকুণ্ডগুলো।'

—'আজ রাতেই ওখানে হানা দেবার কথা বলছিলেন যেন কর্নেল।'

—'পাগলামো হবে ব্যাপারটা। জায়গাটা মেয়েছেলে আর শিশুতে বোঝাই। কর্নেল যদি রক্তের বন্যা চান, তাহলে তিনি নিজেই সেটা করতে পারেন। এ তো হত্যাকাণ্ড নয়, অশান্তি-দমন। আমি সকালের জন্যেই অপেক্ষা করব।'

তৃতীয় পর্ব

সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮

অনুসরণের পালা

সে রাতে ঘুম এল না ক্যাপ্টেন মারের চোখে। অতীতের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন যে পরদিন সকালে আক্রমণের কথা থাকলে রাতে ঘুমোনো অসম্ভব হয়ে পড়ে তাঁর পক্ষে। আগের দিন যতই খাটুনি থাক না কেন, পরদিন সকালেই তাঁর মৃত্যু হতে পারে, এই সত্যটুকু তাঁর মনকে এক প্রখর চূড়ান্ত বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে যথেষ্ট। উইন্ট, ফ্রীল্যাণ্ড অথবা স্টিভেনসনের মত লোককে দেখে এত ঈর্ষা হয় তাঁর! ওরা সব তরুণ, জীবনের আনন্দে এমনই মজে আছে যে মৃত্যু ওদের চিন্তারও বাইরে। ওরা সবাই সাহসী, তিনি সাহসী নন, এ তিনি জানেন; 'কাপুরুষ' শব্দটির উচ্চরণটুকুই তাঁর গোটা অতীত জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর নিজের যে ভয়, সেই ভয়টাই সর্বজনীন কিনা, তাঁর মত সকলেই এই ভয়কে গোপন করে কিনা,—এ-কথা ভেবে তবু মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যান তিনি। বার বছর আছেন সৈন্য-বাহিনীতে, সাহসী পুরুষ আর সুদক্ষ অফিসার বলেই তিনি পরিচিত।

ধীর-মন্থর গতিতে কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেবলি সজাগ হয়ে উঠতে লাগল তাঁর মন। ঘুমের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তিনি উঠে পড়লেন, বুট চড়ালেন পায়ে, তারপর তামাক ঠেসে নিলেন পাইপে। দেশলাই জ্বালিয়ে তারই আগুনে তামাক তাতিয়ে পাইপ ধরালেন। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন খাটিয়ার উপর, ছুরির ফলার মত উঁচু হয়ে রইল হাঁটু দুটো, চাদর আটকে গেল বুটের গোড়ালিতে লাগানো ঘোড়া-ছোটানোর কাঁটায়। পাইপের স্বাদটা ভাল লাগল না, ধোঁয়া না দেখতে পেলে তাঁর কোন কালেই ভাল লাগে না।

কে যেন তাঁবুর কাছে এল, পর্দা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

—'কে? কি দরকার?' প্রশ্ন করলেন মারে।

লোকটা সার্জেণ্ট কেলি। বলল, 'আপনাকে দেশলাই জ্বালাতে দেখলাম; ভাবলাম আপনি হয়ত—'

—'ঠিক আছি আমি।' রূঢ়কণ্ঠে মারে বলে উঠলেন।

—'আচ্ছা, স্যর।'

—'দাঁড়াও একটু,' মারে বললেন, 'কিছু মনে করো না। না ঘুমুতে পারলে মেজাজ একটু খিঁচ্ড়ে যায়।'

—'আমারও সেই দুর্ভাগ্য, স্যর।' কেলি বলল বোকার মত, 'জায়গাটার উপর নজর রাখছিলাম আমি।'

—'দেখলে, সব চুপচাপ?'

—'একেবারে শ্মশানের মত।' ঘাড় নেড়ে সায় দিল কেলি। 'ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছে কিন্তু বুঝতে পারছি না, এমন গরমের রাতে আগুনের এত দরকার কিসের?'

—'আলোর জন্যে বোধ হয়।'

—'স্যর?'

—'ও কিছু নয়।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মারে।

—'আপনি বলছেন আলোর জন্যে, তাই না? ওদের আত্মাকে নরকে আলোকিত করার জন্যে হয়ত।'

কৌতূহলী কণ্ঠে মারে বললেন, 'কাল তো লড়াই হবে, সার্জেন্ট। মনে হয় লড়াইটা তোমার উপভোগ্য হবে।'

—'স্যর?'

—'বলছি, কালকের খুনোখুনিটা বেশ উপভোগ করবে, তাই না?''

—'জিনিসটাকে আমি ওভাবে দেখি না স্যর।' অস্বস্তিভরে উত্তর দিল কেলি।

—'কিভাবে দেখ?'

—'মাইনেটা মোটা আর মানুষ তো কত খারাপ কাজই করে থাকে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মারে, বললেন, 'এখন একটু ঘুমিয়ে নাও, সার্জেন্ট।' লোকটা চলে গেলে চাদর থেকে খসিয়ে নিলেন বুটের কাঁটাটা। তারপর বেরিয়ে এলেন তাঁবু থেকে। 'টিপি'গুলোর ভিতরথেকে তখনো আলোর আভা উঠছে, এর কথাই সার্জেন্ট বলছিল। কালো হয়ে উঠেছে আকাশ, তারার চিহ্ন নেই, বাতাসের গুমট ভাবে মনে হয়, আজ রাতেই বৃষ্টি নামবে, নয়ত কাল সকালে। ঢালুর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগলেন মারে, পেরিয়ে গেলেন সান্ত্রাদের ঘাঁটি, অবশেষে এসে দাঁড়ালেন কামানের পাশটাতে। গোলাবারুদের গাড়ির নিচে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে গোলন্দাজরা। হাতখানা রাখলেন কামানের ভেজা ঠাণ্ডা চোঙার উপর, তারপর ভেজা হাতটা বুলিয়ে নিলেন মুখে।

দু-দুটো পাইপ পুড়িয়ে শেষ না-করা পর্যন্ত এদিক-ওদিক পায়চারি করলেন মারে। বারকয়েক চমকে উঠল সাদা আলোর ঝলক, তার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘের মৃদু গর্জনে ভেঙে গেল রাত্রির স্তব্ধতা। প্রথম দু'বার অন্যমনস্ক ছিলেন মারে, কিন্তু তৃতীয়বারের বার—তিনি সোজা তাকিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান গ্রামখানার দিকে, মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হল একটা মানুষকে দেখতে পেলেন যেন—গ্রামের ঠিক মাঝখানটিতে, নিঃসঙ্গ, একাকী, ঘোড়ার পিঠের উপর বসে।

একজন সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সে বলল, কিছুই দেখতে পায়নি সে। তারপর বৃষ্টি আসছে ভেবে মারে ফিরে এলেন তাঁর তাঁবুতে। পায়ের উপর পা রেখে বিছানার একধারে বসে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন বুটের কাঁটা নিয়ে; কিন্তু বৃষ্টি নামল

না। ভোরের ধূসর সজল আভা তাঁবুর ভিতরে উঁকি না-দেওয়া পর্যন্ত ওইভাবেই বসে রইলেন তিনি।

তারপর তিনি গেলেন উইণ্টের ডেরায়, জাগিয়ে দিলেন অপর ক্যাপ্টেনকে। কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, 'ভোর হয়ে গেছে। বাইরে চলে এস।'

উঠে বসলেন উইণ্ট, চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন, 'ব্যাপার কি? এ আবার কি, মারে? বাইরে তো এখনো অন্ধকার।'

—'সকাল হয়ে গেছে, উঠে পড়। চারদিক ঘুরে দেখতে চাই আমি। আমি যাবার আগে তোমার উঠে পড়াই ভাল।'

—'এখনো তো সব চুপচাপ।' ঘুমের ঘোরে বুট হাতড়াতে হাতড়াতে উইণ্ট বললেন।

—'একদম চুপ। নিচে ওখানেই যাচ্ছি আমি।'

—'পাগলামো হবে ব্যাপারটা। অপেক্ষা কর না কেন একটু?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন মারে। একা একা গ্রামের মধ্যে যাবার ইচ্ছে ছিল না তাঁর, কিন্তু ভয়ই তাঁকে বাধ্য করল অর্ধ-জাগ্রত উইণ্টকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারতে। ভীষণ ইচ্ছে হল এখনই একটু মদ খেতে। তাঁবুতে ফিরে এলেন তিনি। ব্যাগের মধ্যে খুঁজে পেলেন আধ বোতল মদ, শেষ করে ফেললেন প্রায় সবটুকুই। বোতলটা সঙ্গে নিলেন, সান্ত্রীকে পেরিয়ে যেতেই ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন সেটা। এগিয়ে চললেন তিনি, ভেজা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে ভিজে উঠল তাঁর ব্রীচেস। ছোট্ট নদীটা ঢেকে রয়েছে কুয়াশায়; একটু পরেই চোখে পড়ল, পেঁজা তুলোর মত কুয়াশার ভিতর থেকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে উঁচু উঁচু 'টিপি'গুলো। প্রায় প্রত্যেকটি 'টিপি' থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে চামড়ার ঘর, পড়ে আছে শুধু সরু সরু খুঁটির কাঠামোগুলো।

গ্রামখানা খালি দেখে তিনি অবাক হলেন না। বরং বিস্মিত হলেন নিজের বোকামিতে। 'টিপি'গুলোর অর্ধেকে আগুন জ্বালিয়ে রেখে, বাকিগুলো খুলে নিয়ে, ঘোড়ার খুরে আবরণ জড়িয়ে তারপর ওরা নিঃশব্দে সরে গেছে জায়গা থেকে। ওদের এই সহজ চালাকিটুকু ধরে ফেলা উচিত ছিল তাঁর। কতক্ষণ আগে গেছে ওরা? এখন এর মাশুল দিতে হবে অনেকখানি। উইণ্ট যদি হুইস্কির গন্ধ ধরে ফেলে? যদি রিপোর্ট করে?

পাইপটা ধরালেন মারে। মদের স্বাদটুকু কেটে গেল তামাকে, মনে হল গন্ধটাও চলে যাবে এতে। গ্রামের ভিতরে ঘুরতে লাগলেন তিনি। পাতলা হয়ে এল কুয়াশা, আলগা হয়ে গেল ঢেউ-তোলা পালকের টুকরোর মত। আগুনের কুণ্ডগুলোকে খুঁচিয়ে দিলেন মারে, তখনো তাজা আছে আগুন; ছড়ানো জঞ্জালগুলো দেখতে লাগলেন কৌতূহলভরে। এখানে কিছুক্ষণ আগেও মানুষ ছিল, অথচ এখন কেউ নেই। এ-সব জায়গায় মানুষের কেমন যেন এক করুণ স্পর্শ মাখানো থাকে। শী-এনদের এখন যতখানি জীবন্ত আর সত্য বলে মনে হচ্ছে, সামনে থাকতে ততখানি

মনে হয়নি কোনদিনই। নিজের অজান্তেই তিনি তুলতে শুরু করলেন এটা-ওটা, একটা ভাঙা ধনুক,—সেটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন, পাকা হাতের তৈরি সুন্দর কুঁচি-দেওয়া একটা চামড়ার পুতুল, এক জোড়া ছেঁড়া 'জুতো', একটা আগুন ধরানোর কাঠি।

এই ঘটনারই বিকল্প চিত্রটি তিনি কল্পনা করতে লাগলেন মনে মনে। কামান থেকে গোলা পড়ছে গ্রামের উপর, ঘোড়সোয়াররা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ছোট্ট নদীটার মুখে, এমনিতে সরল শিষ্ট মানুষের দল—কিন্তু, তাদের দিকে গুলি ছুটে আসায় ভর করেছে এক উন্মত্ত প্রচণ্ড ক্রোধ, তারই ফলে খুন কবে চলেছে সব-কিছুকে, খুন করে চলেছে ঘোড়াগুলোকে, খুন করছে শিশু আর নারীকে। 'স্যাণ্ড-ক্রীকে'র ভয়াবহ শী-এন হত্যাকাণ্ডের গল্প শুনেছেন তিনি ; ও-রকম একটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পডবেন না ভেবে প্রায় শিশুর মত স্বস্তিবোধ করতে লাগলেন মনে মনে।

ফৌজ দুটো যেখানে ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে ফিরে আসতে আসতে মারে আবিষ্কার করলেন, কখন যেন তিনি গান ধরেছেন গুন গুন করে। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, ইচ্ছে হল শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেন।

নদীর মুখে আসতেই দেখা হল উইণ্টের সঙ্গে। মেঘ সরে গেছে, নদীর ভিতরে আলো-ছায়ার দাগ কেটেছে সূর্যের আলো। উইণ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দিচ্ছেন তাঁর ছোট্ট কালো গোঁফজোড়ায়, আর তাকিয়ে আছেন 'টিপি'র কঙ্কালগুলোর দিকে। মাবে বললেন, 'সরে পড়েছে ওরা।'

—'সবাই ?'

—'শেষ মানুষটা পর্যন্ত। ঘোড়াগুলো একবাবও ডাকল না, কি দিয়ে যে ওরা কি করল, বুঝলাম না। ঘোড়াব ব্যাপারে ওরা 'ভানুমতীর খেল' জানে।'

—'কাল রাতেই যাওয়া উচিত ছিল আমাদেব।' উইণ্ট বললেন চিন্তিতভাবে।

—'আর তাহলে, মেয়েছেলে আর বাচ্চাবাচ্চাদের উপরে এক হাত নিতে পারতে-তাই না ?' মুখিয়ে উঠলেন মারে।

—'ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে বাছবিচার চলে না।' উইণ্ট উত্তব দিলেন।

মারে বললেন, 'যদি কিছু মনে না কর, রিপোর্টটা তুমি তৈরি করে ফেল। একটু ঘুমিয়ে নেব আমি। ভালো ঘুম হয়নি কাল রাতে।'

এইমাত্র ছোট-হাজরি সেরে আঙিনা পেরিয়ে কর্নেল মিজনার চলেছিলেন আস্তাবলের দিকে। কটার-ক্রীকের 'এ' আর 'বি' কোম্পানির কাছ থেকে কোন সংবাদ আসেনি এখনো ; বন্দীদের নিয়ে এতক্ষণ তো তাদের এসে পৌছানো উচিত ছিল। কিছুটা উদগ্রীব হয়ে উঠলেন তিনি। ভেবেছিলেন, একবার ডার্লিংটনে যাবেন, সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছ থেকে কিংবা ওয়াশিংটন থেকে মাইলস্ আর কোন সংবাদ পেয়েছেন কিনা জানতে ; কিন্তু পরে ভাবলেন, মারে আর উইণ্টের কাছ থেকে

সংবাদ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াগুলোক দেখলেন, নির্দেশ দিলেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁর কালো মাদী ঘোড়া জেনিকে সাজ পরিয়ে তৈরি করে রাখতে। বাসায় ফিরবার পথে দেখতে পেলেন এঞ্জেলুসকে, দরজা দিয়ে ঢুকছে একটা পরিশ্রান্ত ঘোড়ায় চড়ে। যদিও তিনি জানতেন যে কাল রাতে লড়াই হলে মারে নিশ্চয়ই রিপোর্ট করতেন, তবু নিজের মনোভাবে উপেক্ষা দেখিয়ে এগিয়ে চললেন বাসার দিকে।

বারান্দায় বসে সিগারেট ধরালেন মিজনার; শান্তভাবে চেয়ে দেখলেন, আঙ্গিনাব ভিতর দিয়ে দৌড়ে আসছে এঞ্জেলুস। সকলে চলেছিল প্যারেডে, কিন্তু বুঝল কিছু একটা ঘটেছে, তাই ছোট ছোট দলে জড হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কর্নেলকে আর ধুলোয় ধূসরিত এঞ্জেলুসকে।

—'ক্যাপ্টেন উইণ্টের কাছ থেকে রিপোর্ট এনেছি, স্যর।' হাঁপাতে হাঁপাতে এঞ্জেলুস বলল।

কাগজটা হাতে নিলেন মিজনার, কিন্তু পড়বার আগে ক্যাপ্টেন ট্রি-বডিকে ডেকে বললেন, 'আঙ্গিনায় ঘোরাফেরা বারণ কবে দাও, ক্যাপ্টেন।'

তাড়াতাড়ি পড়তে লাগলেন তিনি, শেষ হলে এঞ্জেলুসকে বললেন, 'কিছু খেয়ে নাও আগে; পরে এখানে এসে রিপোর্ট করবে। দাঁড়াও একটু—বলতে পার, কাল রাতেই ক্যাপ্টেন মারে ইণ্ডিয়ানদেব গ্রেপ্তারের কোন চেষ্টা করেছিলেন কিনা?'

—'আমার তো মনে হয় না, স্যর।'

অফিসে চলে এলেন মিজনাব, সেখানে আবার পড়লেন রিপোর্ট। ক্রমবর্ধমান ক্রোধের প্রথম ধাক্কায় তাঁর মনে হল, ঘাঁটিতে ফিরিয়ে আনেন তিনি 'এ' আর 'বি কোম্পানিকে, আর শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত অবহেলার জন্য গ্রেপ্তার করেন ক্যাপ্টেন মারেকে। কিন্তু একটু ভাববার পর বুঝতে পারলেন যে কোর্ট-মার্শালের কাছে টিকবে না ব্যাপারটা। অনেকগুলো ফাঁক বেরিয়ে পড়বে এতে; প্রথমটা হচ্ছে, শী এনদের গ্রেপ্তার করাটাই তাঁর কর্তব্য ছিল, না, কর্তব্য ছিল তারা যাতে সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে না যায় তার জন্য কেবল তাদেব আটকে রাখা; আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, মারে যদি গ্রামের উপরে গোলা ফেলাই সাব্যস্ত করতেন তাহলে কি ব্যাপারটাই না ঘটত! হত্যাকাণ্ডের খবর কেমন অতি সহজেই ছাপা হয়ে যায় পূর্বাঞ্চলের খবরের কাগজে, আর ওয়াশিংটনে চাপ দেওয়ায় খতম হয়ে গেছে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী অফিসারের জীবনের স্বপ্ন।

সে যাই হোক, ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে সহজ হয়ে গেছে অনেকখানিই শী-এনরা এলাকা ছেড়ে গেছে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাদের ফিরিয়ে আনা। আর, হৈ চৈ না করে তা যদি সহজেই হয়ে যায়, যদি তার ফলে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আরেকটা লড়াই এড়ানো যায়, তাহলে তিনি হবেন কর্নেল মিজনারের পরিবর্তে জেনারেল মিজনার। অবশ্য তাঁকে এগুতে হবে ধীরে-সুস্থেই। যদি তিনি মাইলসের সঙ্গে পরামর্শ করেন,

আর ব্যাপারটা পরে খারাপ হয়ে পড়ে, তাহলে দায়িত্ব নিতে হবে ইণ্ডিয়ান দপ্তরকেই।

তাই এম্বেলুস ফিরে আসতে না আসতেই ঘোড়ায় চেপে বসলেন মিজনার। দু'জনে চললেন ডালিংটনে।

আগের দিন রাতে কটার-ক্রীকে যা যা ঘটেছে, মিজনারের মুখে এজেন্ট মাইলস্ বিচলিতভাবে তারই বিবরণ শুনে গেলেন। মিজনারের বলা যখন শেষ হল, মাথা নাড়লেন তিনি, বিড়বিড় করে বললেন, 'কিন্তু এ তো উচিত নয়। এলাকা ছেড়ে যেতে পারে না ওরা।'

—'অনেক কিছুই তো হওয়া উচিত নয়।' কর্নেল বললেন।

—'তবুও—আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না, ওখানে দু' দুটো কোম্পানি মোতায়েন ছিল আপনার।'

—'আপনার মতই তো ছিল অপেক্ষা করা, মিঃ মাইলস্। অন্ধকারে গ্রামের উপর গোলা ফেলার দায়িত্ব নিতে পারেনি আমার অফিসারেরা। আগেই আপনি যদি ওই 'কুকুর-সেনা'দের গ্রেপ্তার করতে দিতেন, তাহলে এ-সব এড়ানো যেত। এখন ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে ওদের পিছু পিছু গিয়ে ফিরিয়ে আনাই একমাত্র কর্তব্য।'

—'হ্যাঁ। ফিরিয়ে আনতেই হবে ওদের।' অনিশ্চিতভাবে বললেন মাইলস্।

—'এ-সব যদি কাগজে বেরোয় তাহলে কি হবে, ভেবে দেখেছেন কি?'

—'আমার যা সাধ্য তাই আমি করেছি।' ক্লান্তস্বরে মাইলস্ উত্তর দিলেন। 'আর আমি কি করতে পারতাম?'

—'গ্রেপ্তারের এই পরোয়ানাটি অনুমোদন করে সই দেবেন কি?'

কর্নেলের দিকে তাকালেন একবার মাইলস্, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন ডেস্কের উপর, কম্পিতভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন এক টুকরো কাগজ নিয়ে। বললেন, 'আত্মসমর্পণ করবে না ওরা।'

—'করবে না। তবু ওদের যদি ফিরিয়ে আনা না হয়, তাহলে আপনার এজেন্সির অন্য সব দলের অবস্থা কি হবে?'

—'সই করব আমি।' মাইলস্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

—'এই তো ভাল!' সোজাসুজি কাজের প্রসঙ্গে এসে পড়লেন কর্নেল।

—'দুটো দলকে এখুনি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওদের পিছনে; ব্যাপারটা খতম করে দিতে চাই সপ্তাহখানেকের মধ্যে। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে সমর-দপ্তরে তার করে আপনার নির্দেশনামা পাকা করিয়ে নিচ্ছি আমি। এখন বলুন তো 'ভোঁতা-ছুরি'র দলে লোক আছে কতজন?'

—'প্রায় তিনশোর মত।' মাইলস্ উত্তর দিলেন নিস্পৃহভাবে, 'আশি কি নব্বই-জন পুরুষ, বাদবাকি নারী আর শিশু। কিছু অসুস্থ—তাদের সংখ্যা বেশি বলেই মনে হয়। খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না ওরা।'

—'দুটো দলই যথেষ্ট তাহলে।' মিজনার বললেন স্থির সিদ্ধান্তে। 'আমার

লোকজন ঘাঁটি গেড়ে আছে যেখানে, সেখান থেকেই রওনা হলে সময় বাঁচাতে পারব আমরা। ইণ্ডিয়ান দপ্তরকে জানানোর ভার আপনার উপরই ছেড়ে দিলাম। ভালোয় ভালোয় ইণ্ডিয়ানদের জেলে পুরবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খবর পাঠাব আমি।'

মাথা নোয়ালেন মাইলস্। বুক চিতিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিজনার। তিনি চলে যাবার পর ডেস্কের ধারে বসে শূন্যদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইলেন মাইলস্। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে লুসি যখন ঘরে ঢুকলেন খাবারের কথা মনে করিয়ে দিতে, তখনও তিনি ওইভাবে বসে।

—'কি হয়েছে ?' লুসি জিজ্ঞাসা করলেন।

—'কিছু না, কিছু না, লুসি। আমার যা সাধ্য তাই আমি করেছি।'

মারেকে মিজনার যে নির্দেশ দিলেন তা সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ। নির্দেশ দিলেন, শী-এনদের পিছন পিছন গিয়ে গ্রেপ্তার করতে। সৈন্যদের পিছনে যাবে গাড়িগুলো, ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসবে। কামানটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে রেনো কেল্লায় কারণ সৈন্যদের এগোনোর পক্ষে ওটা একটা বাধা। কামানটা না থাকলেও বিশেষ অসুবিধা ঘটবে বলে মনে করলেন না মিজনাব। আসল কাজ হচ্ছে ইণ্ডিয়ানদেব খুঁজে বার করা। স্টিভ জেস্কি ছাড়া 'ভূত-মানুষ' নামে আরও একটা আরাপাহো স্কাউট রইল সৈন্যদের সঙ্গে।

—'যদি ওরা বাধা দেয় !' মারে জিজ্ঞাসা করলেন।

—'যারা বেঁচে থাকবে তাদের নিয়ে আসবে। এ কাজের জন্যে যাতে যোগ্য মর্যাদা পাও, তা আমি দেখব। পদোন্নতিও হতে পারে।'

অল্প একটু মাথা নাড়লেন মারে, আর কর্নেল মনে মনে বললেন, 'গোমড়ামুখো শয়তান লোকটা, কিন্তু কাজটা ও করবেই।'

উইন্ট পদমর্যাদায় মারের নিচে ; নির্দেশ মেনে চলতে পারেন বেশ, কিন্তু চালিয়ে নিতে পারেন না। মারে এগিয়ে যাবেন, তারপর ফিরে আসবেন কিছু ইণ্ডিয়ানদেব নিয়ে—যারা বেঁচে থাকবে। বেশি লোকক্ষয় করবেন না মারে ; তাঁর যদি কোন দোষ থাকে তবে তা হচ্ছে নিজের নেতৃত্ব সম্পর্কে অতিমাত্রায় সতর্কতা।

যেভাবে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করেছেন, তাতে অতিমাত্রায় তৃপ্ত হয়ে রেনো কেল্লায় ফিরে গেলেন মিজনার। আর, 'এ' আর 'বি' কোম্পানি ছুটল উত্তর-মুখে। ঘোড়ার পিঠে-ছোটা তিনশো লোকের চলার পথের চিহ্ন চাই—একটা গ্রাম, একটা গোষ্ঠী, একটা জাতির ; বহু বয়সের, বহু মানুষের, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার, যুবক-বৃদ্ধের, সুন্দর আর কুৎসিতের ; সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পত্তি—ছোট জিনিস, বড় জিনিস, সাদামাঠা, সূক্ষ্ম কারুকার্যময়, গোপন আর প্রকাশ্য—এমন পথের চিহ্ন অনুসরণ করা কঠিন নয় মোটেই। আর, লুকিয়েই বা থাকবে কি করে তারা ? জোরে ছুটতে গেলে ঘোড়ার খুরের মেঘমন্দ্রধ্বনিতে জেগে উঠবে মাইলের পর মাইল তৃণ-প্রান্তর।

সবাই দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, দেখিয়ে দেবে তাদের। সকল দরজা বন্ধ হবে তাদের সামনে, জানলাগুলো রুদ্ধ হবে, গরু-ছাগল তাদের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। উত্তরের যে সমতলের বুকের উপর দিয়ে তারা যাবে, সে তাদের পিতৃ-পিতামহের মনে-করে-রাখা সমতল-অঞ্চল নয়। এ সমতলের মুখে লাগাম পড়েছে বেড়ার, গোলাবাড়ির জিন পড়েছে পিঠে। রাস্তা, ঘরবাড়ি, টেলিগ্রাফের তার, আর সবার উপরে, সমতলের পেটে লোহার পেটি বেঁধেছে তিন তিনটে রেললাইন—পুব থেকে পশ্চিমে।

উত্তরে এগিয়ে চলল সৈন্যদল। ধুলোর উপর, মাটিতে-নুয়ে-পড়া পায়ে-মাড়ানো ঝোপ-ঝাড়ে, শুকনো নদীর চড়ায় টেনে হিঁচড়ে নেওয়া চওড়া পথের দাগ দেখে পথের চিহ্ন খুঁজে নিতে লাগল জেস্কি আর আরাপাহোটি। ছটকে উঠেছে শুকনো মাটি, তাই দেখে আরাপাহোটি শূন্যে হাত তুলে বুঝিয়ে দিল খুব জোরে ছুটে গেছে ইণ্ডিয়ানরা। কড়া রোদের মধ্যেই ঘোড়ার খুরে দামামা বাজিয়ে ছুটে চলল সৈন্যদল, শাওটাওকোয়া পাহাড়ের ছোট ছোট শুকনো নদী ধরে ধরে চলে গেল মাইলের পর মাইল। নোংরা লালচে ধুলো গায়ে আর মুখে এসে জমল কাদার মত, ঢেকে দিল বিশ্বজগৎ। ঘামতে ঘামতে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল তারা একটি কথাও না বলে। অবশেষে একসময় সূর্য ডুবে গেল রক্তিম আভা ছড়িয়ে জ্বলন্ত কয়লার মত। সে রাতে ঘাঁটি গাড়ল তারা রেড-ফর্কে।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল মারের, গুম হয়ে রইলেন তিনি। সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। সারা দেহ তাঁর ক্লেদাক্ত, ময়লা আর ঘামে বিশ্রী নোংরা; কিন্তু নদীটা শুকনো, স্নান করবার মত জায়গা নেই একটুও। নিজের লোকদের উপর মেজাজ দেখাতে শুরু করলেন তিনি, কথার চাবুক মারতে লাগলেন সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগে যেখানে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন তারই। যতদূর সম্ভবপর, তাঁর থেকে দূরে দূরে সরে রইল সবাই।

—'হয়েছে কি তোমার?' জিজ্ঞাসা করলেন উইণ্ট।

—'সে আমার সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার, ক্যাপ্টেন।'

—'সে তো ভাল কথা। কিন্তু অত্যধিক গরমই যদি কারণ হয়, তাহলে ব্যাপারটাতে ভদ্র হও একটু। সবাই তো আমরা তেতে পুড়ে আছি।'

—'মাপ করো আমাকে।' মারে বললেন। অদ্ভুতভাবে তাকালেন উইণ্টের দিকে।

—'তোমার কি মনে হয়, কাল ধরে ফেলতে পারব ইণ্ডিয়ানদের?' জিজ্ঞাসা করলেন উইণ্ট।

—'হয়ত পারব।'

উইণ্ট বললেন, 'একদিনে একশো কুড়ি মাইল ঘোড়া চালিয়ে গেছে 'কুকুর-সেনা'রা, এও আমার জানা আছে। দড়ির সঙ্গে বেঁধে নেয় ওরা ঘোড়াগুলো, ঘোড়া পালটায় প্রতি দশ মাইল অন্তর। দুনিয়ার কোন ঘোড়সোয়ার নেই তাদের ধরতে পারে।'

—'এদের সঙ্গে দড়ি নেই। ঘোড়াগুলোও এত জীর্ণ-শীর্ণ যে হাঁটতে গেলেই মারা পড়বে। আর, নারী-শিশুরাও আছে সঙ্গে।'

—'তবুও, এগিয়ে যাবে ওরা।' উত্তর দিলেন উইণ্ট।

—'যাবে তো নিশ্চয়ই। ওদের ধরে ফেলব হয়ত কালই; হয়ত বা তার পরের দিন। বিউগিল বাজাবে একটু সকাল সকাল, সাড়ে চারটেয়।'

—'ঘুমটা যে তাহলে কম হবে সবার।'

—'ইণ্ডিয়ান মেয়েরা যদি পারে তাহলে ওরাও পারবে কম ঘুমিয়ে।' উত্তর দিলেন মারে।

সবাই জেগে উঠে আবার ভোরের আধো অন্ধকারে চলতে শুরু করল; মৃদুকণ্ঠে শাপমন্যি করতে লাগল সৈন্যেরা, অফিসাররা অবাক হয়ে তাকাতে লাগল মারের দিকে। শী-এনরা যদি লুকোবার চেষ্টা করত তাহলে এই অস্পষ্ট আলোয় তাদের পথের চিহ্ন অনুসরণ করা কষ্টকর হত। কিন্তু নিজেদের তৃণ-প্রান্তর, পাহাড় আর উপত্যকায় ফিরে যাবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তারা গেছে উত্তরমুখো—একেবারে সোজা পথে। সৈন্যরা এগিয়ে চলল উত্তরে—আরও উত্তরে। সেই আরাপাহোটি আবার শূন্যে হাত তুলে দেখিয়ে দিল পিতৃপিতামহের মাটির ডাক এলে বালবৃদ্ধনরনারী ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়া ছোটাতে পারে কেমন করে। সে আছে বটে শাদা-মানুষের সঙ্গে, কিন্তু নিজের জাতের জন্য সে গর্ববোধ করে; সেই গর্ব আরও বেড়ে উঠল নেকড়েয়-খাওয়া, মাছিতে-ঢাকা কালো কালো মরা ঘোড়াগুলো পথে পড়তে লাগল যখন।

—'মেরে ফেলেছে ছোটাতে ছোটাতে।' বলাবলি করতে লাগল সৈন্যরা। তারা জানে, ছোটাতে ছোটাতে ঘোড়াকে মেরে ফেলে যে ইণ্ডিয়ান, নিজেও সে মরবে ছুটতে ছুটতে।

সকালের রোদের মধ্যেই একটু বিশ্রাম নিল তারা, ঘোড়াগুলোকে হাঁটাল, গায়ের ঘাম মুছে দিল। সুন্দর ঘাসের দেশে এসে পড়েছে তারা, উঁচু উঁচু হলদে রঙের গুচ্ছ, চারধারে ছড়ানো শুকনো গোবর; মনে পড়িয়ে দেয়, এক সময় এই সমতলের বুকে ঘুরে বেড়াত বিশাল বিশাল বাইসনের পাল।

—'আর তাও বেশি দিনের কথা নয়।' কেলি বলল। 'দশ বছর আগেও ওখানে বাইসন ভিড় করে থাকত মাছির মত।'

ইতিমধ্যেই বিউগিলারকে বাজাবার নির্দেশ দিলেন মারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিনের উপর বসে থাকায় বেদনা অনুভব করতে শুরু করলেন তিনি; দেখতে পেলেন ফিক ব্যথার হাত থেকে বাঁচার জন্য সবাই শুয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। কিন্তু নারী আর শিশুরা সহ্য করছে কি করে এ ধকল? তারা হতে পারে ইণ্ডিয়ান, হতে পারে প্রখর অনুভূতিবর্জিত বর্বর, না থাকতে পারে তাদের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বেদনা অথবা আরামের সত্যিকারের বোধ; কিন্তু তাদের রক্তমাংস তো মানুষের রক্তমাংসই।

শী-এনদের কাঁচা-চামড়া দিয়ে তৈরি জিনের কড়া আরামের স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন একবার।

—'যত তাড়াতাড়ি খতম হয়ে যায়, ততই মঙ্গল।' মনে মনে বিড়বিড় করলেন তিনি। মনে হল, তখনই তো মানুষ কুকুরকে মেরে ফেলে, যখন আর চোখেও দেখা যায় না তার যন্ত্রণা।

এগিয়ে চললেন তাঁরা। উত্তরমুখোই গেছে ইণ্ডিয়ানরা। সৈন্যদের পিঠে রোদ বিঁধতে লাগল ছুরির মত। কিন্তু এখানে ধুলো একটু কম, একটু পাতলা; আন্দোলিত তৃণ-প্রান্তরকে মনে হয় যেন সামনে এক হলুদসমুদ্র। সন্ট ক্রীক পেরিয়ে তাঁরা থামলেন এক জবরদখলকারীর ডেরার সামনে।

—'ইণ্ডিয়ানদের দেখেছ?' কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলেন মারে।

অস্থিসার, ঢ্যাঙা লোকটা, মুখটা ঘোড়ার মত, গায়ে নোংরা কোট। আস্তে আস্তে ঘাড়ে হাত বুলোতে লাগল সে, আর পিছনে দরজার মুখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার স্ত্রী আর শিশু দুটো। লোকটা কিছুটা দাগী, ভীত সন্ত্রস্ত। বন্যার তরঙ্গের মুখে ছট্‌কে পড়েছে ইণ্ডিয়ান এলাকায়। ইণ্ডিয়ানদের যেমন ভয় আর ঘৃণা করে সে, তেমনি ঘৃণা করে সৈন্যদেরও।

—'ওরা এসেছিল বটে।' গোমড়ামুখে উত্তর দিল লোকটা।

—'কখন?'

—'সকালে।'

—'কতজন? বল, বল!' খেঁকিয়ে উঠলেন মারে। 'বোবা নাকি তুমি, বল, বল!'

—'বোবা হতেও পারি, মশাই।' টেনে টেনে বলতে লাগল লোকটা; 'আমার ব্যাপার জানতে কেউ ডাকেনি আপনাকে।'

—'কতজন তাই বল না, হে!' আবার বললেন মারে।

হুড়পাড় করে আবার ছুটল সবাই। তাদের পিছনে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। তোমরা যতজন, ততজনই হবে—বেজন্মার দল, চুলোয় যাও সব।'

আবার থামবার আগে তারা এসে পড়ল কানসাসের সীমান্তের কাছাকাছি। জিন ছেড়ে নামল সবাই, পায়ে খিঁক ধরায় খোঁড়াতে লাগল অনেকে, অনেকে উপুড় হয়ে গড়াতে লাগল ঘাসের উপর। কাছেই একটা জলা, কাদার মধ্যে পাশাপাশি অনেক-গুলো গর্ত, সৈন্যেরা ঘোড়াগুলোকে সেখানে নিয়ে গেল জল খাওয়াতে। তারপর মাটিতে শুয়ে রুটি চিবুতে শুরু করল তারা, গব গব করে গিলতে লাগল টিনের পাত্র থেকে।

একটা মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়লেন মারে আর উইণ্ট।

—'ঘাঁটি গাড়তে গেলে ধারে-কাছে জল চাই ওদের।' উইণ্ট বললেন। 'সন্ট ফর্ক শুকনো; ওরা যাবে মেডিসিন লজ নদী পর্যন্ত।'

—'যদি অবশ্য জল থাকে সেখানে। না থাকলে, এগিয়ে যাবে ওরা।'

—'এগিয়ে যেতে পারে না ওরা।'

—'তুমি কি মনে কর না যে আমি তা জানি?' গর্জে উঠলেন মারে। 'ডার্লিংটন ছাড়ার আগেই তো আধমরা হয়েছিল ওদের ঘোড়া।'

কাঁধ ঝাঁকালেন উইণ্ট।

—'ডজ শহরে একজনকে পাঠিয়ে দেব আমি।' মারে বললেন। 'কর্নেল যদি টেলিগ্রাফ করে থাকেন তাহলে তো ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে গেছে ওরা। কিন্তু এখান থেকে উত্তরে একটা কি দুটো কোম্পানিকে পাঠিয়ে দিতে কষ্ট হবে না ওদের। সান্টা ফে রেললাইন ধরে ট্রেনে এগিয়ে 'ভালুক-ধরা-ফাঁদ' বানিয়ে ফেলতে পারে ওরা।'

—'কিন্তু কর্নেল মনে করতে পারেন—'

—'তিনি কি মনে করবেন, তার তোয়াক্কা রাখিনে আমি।' মারে বলে উঠলেন। 'খতম করে দিতে চাই এ ব্যাপারটা।'

—'বেশ তো, বেশ তো,' মাথা নাড়লেন উইণ্ট।

একজন সৈন্যকে পাঠান হল ডজ শহরের দিকে, বাদবাকি সব আবার চলল শী-এনদের পথের রেখা ধরে উত্তরে। কানসাসে ঢোকার পর প্রায়ই পথে পড়তে লাগল রাঞ্চ-বাড়ি; কিন্তু পথের মুখে একটা রাঞ্চ-বাড়ি পড়ায় ইণ্ডিয়ানদের চলার পথ ঘুরে গেল অনেকটা দূর দিয়ে। তারপর তারা এসে পড়ল অসমতল অঞ্চলে; জীবন্তের মধ্যে চোখে পড়ল শুধু বহু দূরে দুটো মূর্তি—ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছে বন্দুকের নিশানার মধ্যে।

একবার ঘোড়া ছুটিয়ে মারের পাশে এল লেফটেন্যান্ট ফ্রীল্যাণ্ড। বলল, 'ঘোড়াগুলো আর এ ধরনের পরিশ্রম সহ্য করতে পারছে না, স্যর।'

—'পারছে না?'

আর কোনো কথা বলল না ফ্রীল্যাণ্ড; কিন্তু ভালোভাবেই দেখতে পেলেন মারে, মরার সামিল হয়েছে ঘোড়াগুলো ছুটতে ছুটতে, ঘামছে দরদর করে, ছুটতে ছুটতেই কাঁপছে থরথরিয়ে।

অপরাহ্নের প্রায় শেষ দিকে ঘোড়া থামাল স্কাউট জেস্কি, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ধোঁয়ার রেখা উঠছে আকাশে। সৈন্যদের থামবার জন্য হাত উঁচু করলেন মারে। অনেকগুলো সরু রেখায় ধোঁয়া উঠছে আকাশে, এক সঙ্গে উঠছে অনেকগুলো, তারপর ছড়িয়ে পড়ছে পৃথক হয়ে।

'পথের শেষ,' উইণ্ট বললেন মৃদুকণ্ঠে, মারে দেখলেন, তিনি কখন খুলে ফেলেছেন পিস্তলের খাপের ঢাকনাটা। ভিড় করে দাঁড়াল সৈন্যরা; জিনের উপর থেকেই ঝুঁকে পড়ল সামনে, নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল জোরে জোরে। বাদামি আর ধূসর ধুলোর আস্তরণ তাদের নীল উর্দিতে, মুখে তিন দিনের না-কামানো দাড়ি। তারা ধোঁয়া দেখতে লাগল তাকিয়ে তাকিয়ে।

ধীরে ধীরে সবাইকে নদীর ধারে নিয়ে এলেন মারে; কিন্তু ঝোপ রয়েছে নদীর পাড়ে। প্রায় একশো গজ দূরে থামলেন তিনি। নদীর উজানে আঙুল দিয়ে দেখালেন উইন্ট, মাইল খানেক দূরে অনেকটা পাহাড়ের মত হয়ে উঠেছে উঁচু জমি, মনে হল শী-এনরা ঘাঁটি গেড়েছে ওখানেই।

—'ওই ঝোপটা পছন্দ নয় আমার।' মারে বলে উঠলেন।

লেফটেন্যান্ট ফ্রীল্যাণ্ড, গ্যাটলো আর আউসল্যাণ্ডার ক্যাচেন ওদের দু'জনের প্রায় কাছে নিয়ে এল ঘোড়াগুলোকে। এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল তারা যে কাঁমড়ে ধরে রইল ঠোঁট দুটোকে। নইলে সর্বত্র যেন ছড়িয়ে পড়বে কথাগুলো। এই তাদের প্রথম আক্রমণ হবে; আর, ইতিমধ্যে কল্পনা করতে লাগল তারা, পুব-অঞ্চলে ফিরে গিয়ে সত্যিকারের ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করার গল্প বলাটা কেমনধারা হবে। গ্যাটলোর গাল দুটো গোলাপি, বেলে রঙের চুল, বছর বাইশেক বয়স, সমতলের এক পুরনো বাসিন্দার ছেলে; সে যেন দেখতে পেল, বাপের পাশে দাঁড়িয়ে গল্প শোনাচ্ছে প্রত্যেককে। চেষ্টা করে শান্ত হয়ে রইল আউসল্যাণ্ডার। তার মতে এই হচ্ছে প্রশান্ত গাম্ভীর্য; কিন্তু দাঁত বার করে ফ্রীলাণ্ড হাসতে শুরু করল শিশুর মত।

—'পেছনে হটে, ছড়িয়ে দাঁড়াও সব সার বেঁধে।' মৃদুকণ্ঠে মারে বললেন তাদের। মনে হল খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি; চোখ মুছতে লাগলেন আর হাই তুলতে লাগলেন কেবলই। ডাকলেন, 'কেলি, কেলি।'

কেলি এলে ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। আঙুল তুলে দেখালেন নদীর দিকে, 'স্কাউট আর দু-তিনজন লোককে সঙ্গে নাও। পরখ করে দেখ ঝোপটা।'

পাশাপাশি বসলেন মারে আর উইন্ট; দেখতে লাগলেন, সেই পাঁচজন ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলে গেল নদীর দিকে দূরে দূরে ছড়িয়ে। অস্তগামী সূর্য নেমে এল অনেক নিচে, ঘোড়সোয়ারদের ছায়াগুলো কখনো চওড়া, কখনো লম্বা হয়ে সরে সরে যেতে লাগল পাশের দিকে। উত্তর থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল, আর ফিতের মত ধোঁয়ার রেখাগুলো সরে গেল পরস্পরের কাছ থেকে। হাত নাড়াতে নাড়াতে ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট কেলি।

—'রাস্তা পরিষ্কার।' চেঁচিয়ে বলল সে।

নদীর ভিতরেই সৈন্যদের নিয়ে এলেন মারে। ঝোপটা বোঝাই অগুনতি পাখিতে; ঝটপট করতে করতে ধুলোমাখা ঘোড়সোয়ারদের মাথার উপর পাক খেয়ে ফিরতে লাগল পাখিগুলো। বালির ভিতরে হাতখানেক জায়গায় জমে আছে ঘোলাটে জল। তার ভিতর দিয়ে যাবার সময় লাগাম টেনে ধরতে হল, যাতে জল না খেতে পারে ঘোড়াগুলো। ওপারে গিয়ে কুচ করার কায়দায় চার-চারজন করে সার বেঁধে দাঁড়াল সবাই, ঝাণ্ডা উড়তে লাগল পত্ পত্ করে; মানুষ আর ছায়ায় মিশে ঘাস আর বেঁটে বেঁটে গাছের মধ্যে দিয়ে যেন একটা বিরাট সাপ চলেছে।

নদীর উজানে তারা এল ধীরে ধীরে, ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে দিয়ে; একটু

পরেই পাহাড়ের চূড়োয় মানুষ আর ঘোড়ার চেহারাগুলো ঠাহর হল সবার চোখে।

উইণ্ট বললেন, 'ওরা দেখতে পেয়েছে আমাদের।' বিউগিল বাজাতে ইঙ্গিত করলেন মারে। বিউগিলের আওয়াজ শোনাল অতি স্পষ্ট, শেষ বেলাকার ঝলমলে রৌদ্রালোকে ধারালো তীরের মত। প্রাণ পেল যেন ঘোড়াগুলো, দ্রুততর হয়ে উঠল পদক্ষেপ।

এমন সময় হাত তুললেন মারে থামবার জন্য।

পাহাড়ের চুড়োয় অন্য সকলের থেকে আলাদা হয়ে একজন ইণ্ডিয়ান অবলীলাক্রমে নেমে আসছে নিচে—যেখানে আক্রমণের জন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে সবাই। খাড়া হয়ে সে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, হাত দুটো মাথার উপর তোলা, লম্বা চুল উড়ছে পিছনে, তার ছোট্ট ঘোড়াটা ছুটছে বে-পরোয়া, অনায়াস ভঙ্গিতে। সূর্য হেলে পড়ল আরও নিচে, আর হঠাৎ তার পিছনের পাহাড়টা ঢেকে গেল গাঢ় ছায়ায়, পাহাড়-চুড়োয় আটকে-থাকা আগুনের একটা গোলার মতো দেখাল সূর্যকে। ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, ছোটা বন্ধ করল তার ঘোড়া, মাথার উপর হাত দুখানা তখনো তুলে ধরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল ক্যাপ্টেন মারের প্রায় কুড়ি হাতের মধ্যে।

—'ক্ষুদে-নেকড়ে।' উইণ্ট বললেন।

ধীরে ধীরে হাত দুখানা নামাল বুড়ো সর্দার। হাসিমাখানো মেটে রঙের মুখখানা, সে হাসিতে করুণা আর দুঃখ যেন আধাআধি মেশানো। কোমর পর্যন্ত তার নগ্ন, সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই; বহু কালের প্রশান্ত বিচারবুদ্ধি নিয়ে বসে রইল সে ঘোড়ার উপরে। যে জিনিস চলে গেছে, মৃত্যু হয়েছে যার, যা আর-কোনদিনই বেঁচে উঠবে না, সে যেন অনেকটা তারই প্রতীক। আর সে তা জানেও। নিজের জাত আর শাদা-মানুষের সঙ্গে দুশো বছরের কঠোর রক্তক্ষয়ী লড়াই যেন চূড়ান্ত মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে দুই বিরোধী পক্ষে,—একদিকে ধুলোমাখা নীল উর্দি গায়ে ক্যাপ্টেন মারে, আর অপর দিকে বৃদ্ধ, অর্ধনগ্ন শী-এন সর্দার।

তবু মারের মনে একমাত্র যে অনুভূতি জেগে উঠল তা হচ্ছে অন্ধক্রোধ, সে ক্রোধ তাঁর নিজের উপর, 'ক্ষুদে নেকড়ে', তার লোকজন—যা-কিছু মিলে তাঁকে পুরো দুদিন পাগলের মত ছুটিয়েছে পিছনে পিছনে—ক্রোধ তাঁর সব-কিছুর উপরে।

—'জিজ্ঞেস কর, ও কি চায়?' মারে বললেন স্টিভ জেস্কিকে।

'ক্ষুদে নেকড়ে' কথা বলতে লাগল ধীরে ধীরে, চ্যাটালো মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল সে। একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে লোকটা বর্বর, কথা বলছে বর্বর ভাষায়। শুনে মনে হয়, যুক্তি আছে কথাগুলোয়; মাথাগরম যুবকদের সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ যেভাবে কথা বলেন, কণ্ঠস্বরে তারই আভাস। তার একটি কথা বুঝতে না পারলেও সমস্ত সৈন্য জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে শুনতে চেষ্টা করল কথাগুলো।

—'লড়াই করতে চায় না ও।' জেস্কি বলল।

—'সে তো ভাল কথা।' মাথা নাড়লেন মারে। 'ওকে বলে দাও, লোকজনকে নিয়ে আসুক এখানে। গ্রেপ্তার করে রাখব আমরা। ভাল ব্যবহার করা হবে ওদের সঙ্গে। গাড়িবোঝাই খাবার আর জামাকাপড় এসে পড়বে কাল।'

—'ও তা করবে না।' জেস্কি বলে গেল, 'ফিরে যাবে না ওরা। ওরা চলেছে উত্তরে। আর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে ও নিজেই ওদের চালিয়ে নিয়ে যাবে কানাডির ওপারে।'

—'লাভ হবে না কোন।' ক্লান্তভাবে মারে বললেন। 'এখুনি আক্রমণ করব আমরা, আর যদি ওর প্রত্যেকটি লোককেও মারতে হয়, তবুও আমরা ধরে আনব ওর দলকে। ওকে বল, কাল আরও সৈন্য এসে পড়বে ডজ শহর থেকে, আরও আসবে সান্টা-ফের রেললাইন ধরে। দুনিয়ায় এমন কোন রাস্তা নেই, যেখান দিয়ে কানাডায়, এমনকি উইওমিঙেও ওরা পৌছুতে পারে।'

আবার হাসল 'ক্ষুদে-নেকড়ে', হাতখানা বাড়িয়ে দিল মারের দিকে। কিন্তু মারে প্রত্যাখ্যান করলেন। জেস্কি বলে গেল টেনে টেনে :

—'ও বলছে, ওর যা কর্তব্য তাই করতে হবে ওকে, আপনার যা তা আপনি করবেন। কিন্তু অনেক সময় দাস হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই ভাল।'

খেঁকিয়ে উঠলেন মারে, 'গুলি করে মারার আগেই এখান থেকে ভাগতে বলে দাও ওকে।'

এতক্ষণে পাহাড়ের এপাশটা একেবারে ঢেকে গেল গাঢ় ছায়ায়। কোন মানুষের চিহ্নই নেই পাহাড়চুড়োয়। সেখানে ঝলমল করতে লাগল সূর্যের অর্ধাংশ, ঠিক যেন হ্যালোউইন পরবের কেকের উপরকার কমলালেবুর কোয়ার মত। ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে সেই অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। তারপর, একবার ফিরে দাঁড়াল ঘোড়া নিয়ে, যেন আবার সে কথা বলতে চায় মারের সঙ্গে। মারের অন্তরের সমস্ত ক্রোধ আর নৈরাশ্য ফেটে পড়ল তারই প্রতিক্রিয়ায়। পিস্তলটা তুলেই তিনি গুলি চালিয়ে দিলেন শী-এন সর্দারের দিকে।

একটুও নড়ল না 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। ধোঁয়া উঠতে লাগল পিস্তল থেকে, সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন মারে, মুখ না তুলেই বললেন ফ্রীল্যাণ্ডকে :

—'বিউগিল বাজাতে বল এগিয়ে যাবার।'

ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। নিস্তব্ধতার বুক চিরে বেজে উঠল বিউগিল। ঘোড়ার খুরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ মিশে, মনে হল যেন, বাজনা বেজে উঠল কোন নির্জন মল্লভূমিতে। আর আচমকা লাগামে ঢিল দিতেই সৈন্যদের বুক থেকে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘশ্বাস—প্রায় কানে শোনা যায় এত স্পষ্ট।

পাহাড়চুড়োর দিকে হাত তুলে দেখালেন উইন্ট। রক্তাভ আকাশ আর ডুবন্ত সূর্যের বলয়াংশের পটভূমিকায় হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়াল ঘোড়সোয়ারের এক সুদীর্ঘ

সারি। সংখ্যায় আশির উপর হবে না ওরা, ওদের মধ্যে আছে দলের সমস্ত পুরুষ, অতিবৃদ্ধ, অতি-তরুণ, আর পরিপূর্ণযৌবন যোদ্ধারা সব।

দুই কোম্পানি ঘোড়সোয়ার এগিয়ে গেল সামনে। প্রায় হাজারটা খুরের ভয়াবহ আওয়াজ ডুবিয়ে দিল বিউগিলের শব্দ। পাহাড়ের চড়াইতে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে যেতে যেতে ঝকঝক করে উঠল তাদের তলোয়ার, ঝিলিক উঠল আগুনের ফুল্‌কির তখনো আকাশের গায়ে ছায়ামূর্তিগুলো দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে।

তারপর শী-এনরা ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহাড়ের ঢালু বেয়ে, তাদের উদ্ধত চিৎকারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল বীভৎস ঐকতান। সোজাসুজি সৈন্যদের উপর না হলেও তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল এমনভাবে যে সৈন্যদের মুঠো করে ধরা তলোয়ারে গেঁথে যাবার কথা তাদের। তারপর হঠাৎ ভাগ হয়ে গেল তারা দুভাগে, সৈন্যদের চারপাশে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল তাদের থেকে দূরে—দূরে, চূর্ণবিচূর্ণ রঙিন কাঁচের টুকরোর মত ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে নেচে বেড়াতে লাগল কখনো সৈন্যদের চারধারে, কখনো বা পাশ কাটিয়ে, আবার কখনো বা ভিতর দিয়ে, বাতাসে ওড়া কালো পালকের মত শীর্ণ ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

সৈন্যদের ফেরবার সঙ্কেত বাজল বিউগিলে। ক্লান্ত ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে 'এ' আর 'বি' কোম্পানি সার বাঁধল নতুন করে। ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ের দিক থেকে ঘুরতেই তারা দেখতে পেল ইণ্ডিয়ানরা এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে তাদের নিচে, ছুটে চলেছে নদীর দিকে। আর তাদের আক্রমণের একমাত্র সাক্ষী একটি শী-এন শুয়ে আছে চিত হয়ে, তলোয়ারের ঘায়ে তার দু-ফাঁক করা মাথাটা সন্ধ্যার আধো অন্ধকার ঢেকে দিয়েছে যবনিকাভরে।

দু-দুবার পিস্তল ছুঁড়েছিলেন মারে, তখনো তাঁর ভেজা হাতের মুঠোয় পিস্তলটা শক্ত করে ধরা; হাত নেড়ে তিনি ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন উইণ্টকে, চিৎকার করে জানালেন, তাঁর নিজের কোম্পানি নিয়ে ইণ্ডিয়ানদের নদীর মধ্যে কোণঠাসা করে ফেলতে। নীলরঙের সারিগুলো ছড়িয়ে গেল আলাদা আলাদা ভাবে, তারপর একসঙ্গে ছুটে চলল নদীর দিকে, কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সবাই, তলোয়ারের মুঠো শক্ত করে ধরল আর-একবার। হার্ডিং আর ডিক্রে পড়ে রইল পিছনে, বুলেট-বেঁধা কাঁধের পরিচর্যায় ব্যস্ত রইল একজন, ডাণ্ডার ঘায়ে চূর্ণ হয়ে গেছে আর-একজনের হাত।

নদীর মধ্যে যখন সৈন্যরা গিয়ে নামল ততক্ষণে নদী পার হয়ে গেছে শী-এনরা। 'এ' আর 'বি' কোম্পানির ঘোড়ার খুরের আঘাতে মাটির সঙ্গে মিশে গেল ঝোপটা। কিন্তু নদীর ভিতরে বালির জন্য গতি হয়ে পড়ল মন্থর। সারাদিন ছুটে ছুটে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে হাজার চেষ্টাতেও এগুনো গেল না কয়েক কদমের বেশি; অনেকগুলো তো গড়িয়েই পড়ে গেল অপর পাড়ে উঠতে গিয়ে। আক্রমণের আগে কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম পেয়েছিল ইণ্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো। এই সময়ের মধ্যে সৈন্যদের দিকে

কয়েকবার গুলি ছুঁড়ে তারা ছুটল নদীর অপর পাড়ের দিকে, এ পাড়ে কর্দমাক্ত শ্রান্ত ঘোড়সোয়ারদের বোকা বানিয়ে ফেলে রেখে পৌঁছে গেল সেখানে।

ততক্ষণে প্রায় রাত ঘনিয়ে এসেছে। রঙ্গমঞ্চের পিছনকার পর্দার মত পাহাড়-চূড়োয় তখনো এলিয়ে আছে ঈষৎ রক্তিমাভ আকাশ। মাটিতে নেমে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ল শ্রান্ত ঘোড়ার পাশে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, যেখানে নারী আর শিশুদের ফেলে রেখে এসেছে সেখানে ফিরে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াল শী-এনরা।

বোকার মত হাসতে লাগলেন উইণ্ট। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'একবার এক খেঁকশিয়ালীকে দেখেছিলাম তার ছানার ডেরার কাছ থেকে ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যেতে—'

—'আমাদের যাওয়া উচিত ছিল ওদের ঘাঁটিতে।' মারে বললেন। 'নারী আর শিশুদের একবার ধরতে পারলে ফিরে আসতই ওরা। এর পরের বার দেখব ভাল করে।'

—'ডার্লিংটন ছাড়ার আগেই আধমরা ছিল ওদের ঘোড়াগুলো, তবু হারিয়ে দিয়ে গেল আমাদের।'

মারে বলে উঠলেন, 'আর ছুটব না এখন আমরা।'

ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়ানো হলে নদী পেরিয়ে এলেন মারে; ঘাঁটি গাড়লেন পাহাড় থেকে আধ মাইল দূরে নদীর ভাঁটিতে। আহত হয়েছে ছজন,—কারুরই আঘাত গুরুতর নয়, জিনের উপরে বসে থাকার ক্ষমতা আছে সকলেরই। যতদূর সাধ্য ক্ষতগুলো ধুয়ে মুছে দিল প্রাইভেট টেমপোর। লোকটা মাঝবয়সী, গৃহযুদ্ধে হাসপাতালের আরদালির কাজ করেছে আগাগোড়া, বিরাট দাড়ি মুখে, মেয়েদের মত ভদ্র-শান্ত।

সকলে যখন খেতে শুরু করল, মারে আর উইণ্ট ঘোড়ার পিঠে চললেন পাহাড়ের দিকে। শী-এনদের অগ্নিকুণ্ডগুলো ঢাকা পড়েছে পাহাড়ের পাশে, কিন্তু একটা গোলাপি আভা কেঁপে কেঁপে উঠছে পাহাড়চুড়ো থেকে, মনে হয় অদ্ভুত একটা ছোটখাট জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি।

—'ওদের কিছু হয়েছে বলে তো মনে হয় না।' উইণ্ট বললেন।

একটা ব্যাপারে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে যে মানুষের দল সব রকম বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলে, তাদের অদ্ভুত অদৃষ্টবাদ কতকটা অস্পষ্টভাবে হলেও বুঝতে পারেন মারে। তারা যেন মরে গেছে আগেই; আর, মানুষ একবারই মাত্র মরে, এই কথা জেনে যেন জয় করেছে সমস্ত ভয়। কিন্তু ভাষায় তিনি প্রকাশ করতে পারলেন না তাঁর এই অনুভূতি; উত্তর দিলেন না উইণ্টের কথার।

—'ওদের কাছে তো বেশি খাবার থাকার কথা নয়।' মন্তব্য করলেন উইণ্ট। 'মনে হয়, মাইলস্ প্রায় উপোসই করিয়ে রেখেছিলেন ওদের।'

—'জলের দরকার ওদের যতটা, খাবারের দরকার তত নয়। ঘোড়ার মাংস খেতে পারবে ওরা।'

—'না না, ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়ার মাংস খায় না। জানো না তা!' বলে উঠলেন উইণ্ট।

—'খায় না ওরা? কিন্তু কুকুর-সেনারা খাবে। আত্মসমর্পণের আগে ওরা ভাঙবে প্রত্যেকটি বিধিনিষেধ।'

—'ঝকমারি কাজ,' উইণ্ট বললেন, 'আজ রাতেই আক্রমণ হবে নাকি?'

—'আমার তো ইচ্ছে তাই। গোটা কয়েক পিস্তল, দুটো একটা 'কারবাইন'— এই ধরনের ছোটখাট অস্ত্র ছাড়া বেশি কিছু ওদের আছে বলে মনে হয় না। এ অঞ্চলে যখন ওদের আনা হয়, তখন সঙ্গে কয়েক 'রাউণ্ড' গুলি ছিল মাত্র। বেশি গুলিগোলা চালাতে পারবে না ওরা।'

—'হয়ত পারবে না।' উইণ্ট বললেন। 'বোকা নয় সেই বুড়োটা।' মারে বললেন, 'ওকে নিশানা করে গুলি ছোঁড়াটা উচিত হয়নি আমার, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি।'

—'সে কথা ভাবছিনে আমি।'

—'যা খুশি মাথামুণ্ডু ভাবতে পার তুমি।' বলে উঠলেন মারে।

—'তা বেশ। কিন্তু সে কথা ভাবছিনে আমি। আমি দেখছি, ও রকম লোকের সামনে কেমন করে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তুমি।'

—'তুমি তো আর কখনো জ্ঞান হারাও না!' মারে বললেন।

—'না না, মাঝে মাঝে আমিও হারাই। ঘুমানো দরকার তোমার। তোমার মতো একটু ঘুমুতেও পারতাম যদি—'

—'চুপ কর!' মারে চেঁচিয়ে উঠলেন।

নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন তাঁরা; ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইলেন উইণ্ট। অবশেষে মারে বললেন, 'আমি দুঃখিত, উইণ্ট।'

'ঠিক আছে। ভুলে যাও ও কথা।'

ঘাঁটিতে ফিরে এলেন তাঁরা। ঘোড়া থেকে নেমে মারেকে কোন কথা না বলেই চলে গেলেন উইণ্ট; একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে মাটিতেই বসে পড়ে পাইপে তামাক পুরতে লাগলেন মারে। লেফটেন্যাণ্ট ক্রীল্যাণ্ড এসে দাঁড়িয়ে রইল পাশে।

—'স্যর?'

—'কি ব্যাপার?' মারে জিজ্ঞাসা করলেন।

—'রাতে আমাদের করণীয় কি?'

—'ঘুমুব আমরা।' মারে উত্তর দিলেন। 'আর-কিছুই না। একটা পাহারা রাখবে ঘোড়াগুলোর কাছে, পাহাড়ের চারপাশে টহলদার পাঠাবে দু'ঘণ্টা পর পর। তাদের বলে দাও জলের কাছে কেউ গেলেই গুলি চালাবে। আর-কিছু না।'

ঘাড় নাড়ল লেফটেন্যান্ট, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল তবু।

—'আর-কিছুই না।' মারে বললেন। 'নিজেও একটু ঘুমিয়ে নাও।'

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন, তাকালেন আকাশের দিকে। খাওয়া হয়নি তাঁর কিছুই, খিদেও নেই তাঁর। সেখানেই শুয়ে রইলেন তিনি। কালো আকাশের পটভূমিকায় মিট মিট করছে সাদা সাদা আলোর বিন্দু, ওই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

এই মুহূর্তে, দুটো জিনিস একান্ত প্রয়োজন মনে হল মারের কাছে, একটু মদ, আর একটা মেয়েমানুষ। যে কোন রকমের মদ, যে কোন জাতের মেয়েমানুষ—এমন কি পাহাড়ের ওই ইণ্ডিয়ানদের জাতের হলেও চলবে। বিয়ে তিনি কখনো করেননি, কোন শ্রীমতী মারে নেই তাঁর—যিনি বসে বসে ভাববেন তাঁর ফিরে আসার কথা, ঠিক যেমন ভাবেন শ্রীমতী উইণ্ট—অবশ্য উইণ্ট যদি ভেবে থাকেন সে-কথা।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন মারে। তিন রাত পরে এই প্রথম সত্যি সত্যি তিনি ঘুমুলেন।

ঘুম ভেঙে গেল মুখের উপর ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়তে। মারে তাকালেন আকাশের দিকে—মেঘে ঢাকা সীসে-কালো আকাশ। রাত্রে কে যেন তাকে ঢেকে দিয়েছে একটা চাদর দিয়ে, সেটা ছুঁড়ে ফেলে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। পা দুটো ফুলে উঠেছে, শক্ত হয়ে উঠেছে বুটের ভিতরটা। অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হল প্রথম কয়েক পা চলতে। ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি, পাঁচটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। সৈন্যেরা ঘুমুচ্ছে নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে গায়ে চাদর জড়িয়ে। কানে এল টহলদারদের ঘোড়ার পায়ের অস্পষ্ট থপ্ থপ্ শব্দ।

উইণ্টকে খুঁজতে গিয়ে চারধারেই হোঁচট খেলেন তিনি। বৃষ্টিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কয়েকজনের, ভ্যাবাচাকা খেয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল তারা। উইণ্টকে খুঁজে পেয়ে তাকে নাড়া দিয়ে জাগালেন।

—'উঠে পড়।' মারে বললেন। 'আলো ফুটবার আগেই পৌঁছুতে চাই ওখানে।'

উইণ্ট দাঁড়ালেন খাড়া হয়ে। হাত চালাতে শুরু করলেন চুলের ভিতরে। বেশ বড়সড় তাঁর দাড়িটা, হতশ্রী, বিতিকিচ্ছি মুখখানা।

—'কোথায়?' ভারি গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

মাথা নেড়ে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন মারে। তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যাবেন উইণ্ট; ভয় পেয়েছেন তিনি, তাঁর পিছনে যদি উইণ্ট থাকেন তাহলে একটু কমবে তাঁর ভয়।

চুলের জট ছাড়িয়েই চললেন উইণ্ট। মারেকে বললেন, 'ডজ শহরে থেকে সৈন্য তো আসছেই। ততক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারব আমরা।'

—'কাজ শেষ করে ফেলাই পছন্দ করি আমি।' মারে বললেন।

—'কাল তো মনে হয়নি তোমার।'

—'আজ মনে হচ্ছে।' মারে উত্তর দিলেন।

ক্রমেই বেড়ে চলল বৃষ্টি। ভেজা টুপিটা টেনে দিয়ে উইন্ট বললেন, 'কি করতে হবে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন মারে; বললেন, 'জাগিয়ে দাও সবাইকে, পায়ে হেঁটে যাব আমরা। সেভাবেই সুবিধে হবে।'

—'ঘোড়সোয়ারদের পায়ে হাঁটা পছন্দ করিনে আমি।'

—'ওদের মরতে দেখাও পছন্দ করিনে আমি।'

সেখান থেকে সরে এলেন মারে। দেখতে পেলেন, পা দিয়ে খুঁচিয়ে একটা আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে সার্জেণ্ট কেলি। মাথা ঝুঁকিয়ে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করলেন তাকে, 'ওখানকার খবর কি, সার্জেণ্ট?'

—'সব চুপচাপ।'

—'পায়ে হেঁটে যাব আমরা। জাগিয়ে দাও সবাইকে। টহলদারদের ডেকে পাঠাও।'

—'আচ্ছা, স্যর।'

—'অযথা মানুষ মারা চলবে না।' আবার বললেন মারে। 'বলে দাও সবাইকে, মেয়েছেলে আর কাচ্চা-বাচ্চায় বোঝাই জায়গাটা।'

—'মনে হচ্ছে ওরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, স্যর।'

—'যখন দরকার হবে, তখন তোমার মতামত জিজ্ঞেস করব, সার্জেণ্ট।' মারে বলে উঠলেন।

দুই কোম্পানি ঘোড়সোয়ার ঘোড়া থেকে নেমে সার বাঁধল ছড়িয়ে ছড়িয়ে, ধীরে ধীরে এগুতে লাগল বৃষ্টির মধ্যে। অর্ধচন্দ্রের মত ঘিরে ফেলল তারা পাহাড়ের পাদদেশ। যখন উপরের দিকে উঠতে শুরু করল তখনও কোন সাড়াশব্দ কি কারো চিহ্ন চোখে পড়ল না ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটি থেকে। ভোরের ধূসরতা মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল দিনের ম্লান আলো। যখন প্রায় অর্ধেক উঠে এলেন তখন মারের মনে হতে লাগল যেন তাঁরা সোজা গিয়ে পৌছুবেন ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটিতে, একটা গুলিও ছুঁড়বে না তারা।

পরে বুঝলেন যে ওরা ট্রেঞ্চ খুঁড়েছে। দেখতে পেলেন, উঠে দাঁড়াল একজন ইণ্ডিয়ান, কিছু পরে মনে হল, ইণ্ডিয়ানটা 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। শী-এনদের ট্রেঞ্চ থেকে গুলির একটা ঝাপটা এসে ছিন্নভিন্ন করে দিল 'এ' আর 'বি' কোম্পানিকে। ওদের গুলিগোলা নিশ্চয়ই অল্প, কারণ, একবারই মাত্র ওরা গুলি চালাল। কিন্তু নিচের দিকে নামতে শুরু করে দিল সৈন্যরা, পিছনে ফেলে গেল ভিজে ঘাসের ভিতরে ছটফট-করা কয়েকটা নীল বিন্দু। গুলি চালাতে চালাতেই পিছু হটতে লাগল তারা। গালাগাল দিতে লাগলেন মারে, অনেক চেষ্টা করলেন ওদের সারিটা দাঁড় করাতে।

কিন্তু তাঁদের পিছনে পাহাড়চূড়োয় কোন ইণ্ডিয়ানকেই দেখা গেল না আর, কেবল একজন শুধু বসে রইল ট্রেঞ্চের কিনারে—বসে বসে ধীর শান্ত ভঙ্গিতে টেনে চলল তার পাইপ।

পাহাড়ের গোড়ায় ভিজে ঘাসের ভিতরে শুয়ে রইল সৈন্যরা ; আর তাদের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলেন মারে, পরিমাপ করতে লাগলেন ক্ষয়ক্ষতির। অক্ষত আছেন উইণ্ট, চোখ সরিয়ে নেননি তিনি মারের দিক থেকে, শুধু একবার মাত্র তাকালেন পাহাড়ের দিকে, তখনো দেখতে পাওয়া যায় ঘাসের ভিতরে ছটফট করা নীল মূর্তিগুলো।

—'ফ্রীল্যাণ্ড পড়ে আছে ওখানে।' উইণ্ট বললেন মারেকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেলেন মারে। কেলির সন্ধান মিলছে না, তার সঙ্গে আরও পাঁচজন প্রাইভেটের। আহত হয়েছে প্রায় জনাতিরিশেক। গুলি লেগেছে স্কাউট স্টিভ জেস্কির মাথার খুলিতে ; লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে প্রায় চোখেই পড়ে না তার চামড়ার জামাটা। বুকটা হাঁ হয়ে গেছে ভূতুড়ে চেহারার আরোপাহোটির, হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামতে চেষ্টা করছিল সে। দৌড়ে ছুটে গেল লেফটেন্যাণ্ট গ্যাটলো, ধরে ধরে নিয়ে এল তাকে বাকি রাস্তাটা। মাটিতে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গুন গুন করে গাইতে শুরু করল সে এক অদ্ভুত 'মৃত্যু-সঙ্গীত', কেউ বুঝল না তা ; একটু পরেই মৃত্যু হল তার।

উইণ্টের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মারে, ফিস ফিস করে বললেন, 'যিশুর দোহাই, ফ্রীল্যাণ্ডের জন্যে দোষ দিও না আমাকে।'

—'দোষী আমরা সবাই।' উইণ্ট উত্তর দিলেন শান্তকণ্ঠে।

—'দেশে ফিরতে চেয়েছিল ওরা।' মারে বললেন। 'ওরা চেয়েছিল শুধু এটুকুই।'

—'তা জানি। এখন কি করবে তুমি ?'

—'আবার যাব উপরে।' ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন মারে।

আহতদের নিয়ে যাওয়া হল ঘাঁটিতে ; আর যে-সব সৈন্য রইল তারা আবার সার বাঁধল আক্রমণের জন্য। এবার তারা এগোল গুঁড়ি মেরে, ভিজে ঘাসের ভিতর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল নিজেদের। কিন্তু এত করে পাহাড়ের অর্ধেকটা পর্যন্তও উঠতে পারল না তারা। সেইখানে শুয়ে, কোন ইণ্ডিয়ান মাথা তুললেই গুলি চালাতে লাগল তারা। সৈন্যরা এগোনোর চেষ্টা না করা পর্যন্ত গুলি ছোঁড়া বন্ধ রাখল ইণ্ডিয়ানরা।

সকাল পেরিয়ে গেল। দিনের মাঝামাঝি বৃষ্টির টিপটিপুনি কমে গেল, আর মেঘের মধ্যে থেকে জেগে উঠল এক জ্বলন্ত গন্ধক-রঙের সূর্য। ভাপ উঠতে লাগল ঘাসের ভিতর থেকে। প্রায় হাতখানেক বেড়ে উঠেছে নদীর জল, এঁকেবেঁকে বয়ে চলল একটা লাল সাপের মত। পিছিয়ে আসার হুকুম দিলেন মারে।

অবশিষ্ট খাবারটুকু খেয়ে নিল সৈন্যরা, তারপর শুয়ে পড়ে জামাকাপড় শুকিয়ে

নিতে লাগল রোদে। একটা জিনে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন মারে, চোখের উপর ঢাকা দিলেন একটা রুমাল। এভাবে একটু স্বস্তি বোধ হল তাঁর, কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে দিতে পারলেন সমস্ত কিছু চিন্তা, মনে জেগে রইল শুধু রোদের তাপ আর তৃণ-প্রান্তর পেরিয়ে-আসা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। নদীর ধারের ঝোপ থেকে উড়ে উড়ে কলরব করতে লাগল পাখিগুলো, তাদের ছায়াগুলো নেচে বেড়াতে লাগল মাটিতে; আর ঘাসের ভিতরে দ্রুত আলোড়ন তুলে অনেকদূর এগিয়ে চলে গেল একটা নেকড়ে।

তাঁর পাশেই বসে ছিলেন উইণ্ট। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার কি উপরে উঠব, ক্যাপ্টেন?'

অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না মারে। তারপর উঠে বসলেন, রুমালটা ভাঁজ করে অদ্ভুতভাবে তাকালেন উইণ্টের দিকে। বললেন, 'জানি না।'

—'গাড়ির সঙ্গে কামান আনবে ওরা।'

কাঁধ ঝাঁকালেন মারে। বললেন, 'আমার মতে এভাবেই ভাল।'

—'কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেয় তাতে।' উইণ্ট বলে উঠলেন, 'পাহাড়ের উপরের ওরা তো মরেই গেছে ধরে নিতে পারা যায়।'

—'মনে হয়, ওরাও এই চেয়েছিল।'

—'সেজন্যেই তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই এতে।'

—'আমি শুধু ফ্রীল্যাণ্ডের কথাই ভাবছি।' মারে বললেন, 'কামানের জন্যে অপেক্ষা করব আমরা। সৈন্য আসবে ডজ শহর থেকে।'

গাড়িও এল না, কামানও না। ছটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন মারে; তারপর পাঠিয়ে দিলেন সর্জেণ্ট গীটি আর প্রাইভেট হেনেসিকে, রসদের গাড়ি মেডিসিন লজ নদী আর ডার্লিংটনের মধ্যে কোথাও পথ হারিয়ে ফেলেছে কিনা দেখতে। সঙ্গে একটা রিপোর্ট দিয়ে দিলেন মিজনারের জন্য, সার্জেণ্টকে বলে দিলেন, গাড়িগুলোর সঙ্গে দেখা হলেই হেন্নেসিকে দিয়ে সেটা পাঠিয়ে দিতে। গীটি ফিরে আসবে রসদের সঙ্গে। পরে খানিক ভেবে গীটিকে বললেন:

—'যদি এখান থেকে সৈন্যরা ফিরে যায়, তাহলে আহতদের গাড়িতে তুলে কোল্ড ওয়াটারে নিয়ে যেও; যতদূর জানি, ওখানে ডাক্তার আছে একজন।'

—'সৈন্যরা এখান থেকে চলে গেলে?' প্রশ্ন করল গীটি।

—'এখনই রওনা হয়ে যাওয়া ভাল সার্জেণ্ট।' মারে বললেন।

ওরা দু'জন নদী পেরিয়ে গেল জল ভেঙে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন মারে। তারপর ফিরলেন সৈন্যদের দিকে। দুপুর বেলাকার বিশ্রামে চেহারা ফিরে গেছে সৈন্যদের আর ঘোড়াগুলোর; সকালের পরাজয়ের পর উৎসাহ ফিরে এসেছে আবার। কিন্তু গত তিনদিন বরাদ্দ খাবার পেয়েছে অতি সামান্য। সংখ্যাও কমে গেছে মৃত আর আহতদের দরুন। টহলদার ঘুরছে পাহাড়ের চারপাশে, কিন্তু তখনো পর্যন্ত দেখা

দেয়নি কোন ইণ্ডিয়ান, ট্রেঞ্চের উপরেও না, রাইফেল-ছোঁড়ার গর্তের উপরেও না, চেষ্টাও করেনি পালিয়ে যাবার।

পুরনো দিনের অরিগন পথ-পরিক্রমার কাহিনী মনে পড়ল মারের—প্রথম যে গাড়িগুলো পাড়ি দিয়েছিল সমতলের প্রান্তরে। তখনকার দিনে অবস্থা ছিল আশ্চর্যভাবে বিপরীত; তবু তাঁর মনে হল, যে ধরনের ভয়ঙ্কর আর শোচনীয় অবস্থার সামনে 'ক্ষুদে-নেকড়ে' আর তার দলবল পড়েছে, তার অর্ধেকের সামনেও কোন নবাগত জবরদখল-কারী দল কখনো পড়েছিল কিনা সন্দেহ আছে তাতে। সংখ্যায় দ্বিগুণ সৈন্যদল ইতিমধ্যেই ঘিরে ধরেছে তাদের, ডজ শহর থেকে পাঠানো সৈন্যরা অবশেষে আটকে দিয়েছে তাদের উপরের রাস্তা, চার ধারে বেষ্টন করে আছে সৈন্যদের ঘাঁটি আর কেল্লার বেড়াজাল; ওদের মধ্যে একজনও যে পালিয়ে যেতে পারবে তার সুযোগ লাখেও এক নয়। যে সামান্য কিছু খাবার-দাবার তাদের ছিল, তা প্রায় ফুরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই; আগেই হোক আর পরেই হোক শেষ গুলিটাও ফুরিয়ে যাবে ওদের। নিরন্তর ছুটে ছুটে ভেঙে পড়বে ঘোড়াগুলো আর তাদের সওয়াররা। চার বছর বয়সেই শী-এন ছেলেমেয়েকে কেমন করে ঘোড়াব পিঠে বসিয়ে দেওয়া হয় তা তিনি শুনেছেন। গত রাতেই ঘোড়া ছোটাবার যে নিপুণতা তিনি দেখেছেন, তা তাঁব ধারণারও বাইরে। তবু তিনি জানেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কোন মানুষ সহ্য করে যেতে পারে না ঘোড়ার পিঠের ঝাঁকুনি। যদি পালাতেও পারে তাহলেও মরবে ওরা; আর ওরা যে পালাতে পারবে তা বিশ্বাস হল না তাঁর।

উইণ্টকে তিনি বললেন, 'সবাই বিশ্রাম নিক ভাল করে। সকালেই ডজ থেকে সৈন্যরা এসে পড়বে এখানে, বোধ হয় কামানও থাকবে ওদের সঙ্গে।'

—'ওরা বেষ্টনী ভেঙে পালাতে পারে আজ রাতে।'

—'তা পারে।' স্বীকার করলেন মারে। 'সারারাত ঘুরতে বলব টহলদারদের।'

—'আমার ইচ্ছে, আহতদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। নরককুণ্ড হয়ে উঠছে এই গরমে।'

—'সকালেই এসে পড়বে গাড়িগুলো।' মারে বললেন।

—'তাই আসুক।'

সে রাতে আবার ঘুমুলেন মারে। এটা কেমন অদ্ভুত যে শী-এনদের নিশ্চিত পরিণাম উপলব্ধি করার পর শান্ত হয়ে গেছে তাঁর মন; যেন তাঁর মনের সেই চিন্তা নিজে নিজেই নৌকোর মত ছুটে চলেছে নদীর স্রোতে, সকল মানুষের ভাগ্য ভাসছে সেখানে।

আবেগময় অনুভূতিগুলোকে কথায়, এমন কি চিন্তায়ও রূপ দিয়ে কখনো স্বস্তি পান না মারে। কিন্তু তাঁর মনে হল তিনি যেন দেখতে পেলেন বর্বরদের ছোট্ট গ্রামখানার ভাগ্যের সঙ্গে নিদারুণভাবে একাত্ম হয়ে গেছে তাঁর নিজের ভাগ্য। তারা যেন স্বাধীনতার এক বিমূর্ত ধারণা, তিনিও ঠিক তেমনি দাসত্বের এক বিমূর্ত ধারণা।

কিন্তু আর লড়াই তিনি করেন না মনের সঙ্গে, সে ইচ্ছেও তাঁর নেই। উর্দিপরা বন্দুকধারী ভৃত্য মাত্র তিনি, তাঁর অস্পষ্ট স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা মূর্তি পেয়েছে যাতে, এগিয়ে যাবেন তাকেই ধ্বংস করতে। তিনি জানেন না কোথায় তাঁর অন্যায়, ঠিক যেমন স্পষ্টভাবে জানেন না তিনি কোথায় ন্যায় এই নগ্ন বর্বর দলের—আইনশৃঙ্খলা আর রুচির বালাই নেই যাদের। কিন্তু একথা তিনি জানেন যে, ওদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করলে বিবেকের শেষ আর্তনাদের টুঁটিটাও টিপে ধরতে হবে তাঁকে। মৃত সার্জেণ্ট কেলি যেমন করে বলত, তিনিও বলতে পারবেন তেমন করেই:

—'মাইনেটা ভাল, আর কত খারাপ কাজই তো মানুষ করে থাকে।'

সে জন্যেই ভাল করে ঘুমুলেন তিনি। ঘুমিয়ে নিলেন রাতের অর্ধেকেরও বেশিটুকু; তারপর জেগে উঠলেন ধড়মড়িয়ে, টহলদারদের দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনে। ঘোড়ার জন্য ছুটোছুটি করছে সৈন্যরা; কানে এল হাজারটা খুরের গম্ভীর ঐকতান, ঘুমের চটকা ভেঙে গেল তাঁর এই সোরগোলে।

—'বিউগিল বাজাও, বিউগিল!' চেঁচিয়ে উঠলেন মারে।

কিন্তু বুট আর জিনের দরকার নেই আর। এর মধ্যেই ঘোড়ার পিঠে চাপতে শুরু করেছে সৈন্যরা, এর মধ্যেই তরুণ লেফটেন্যাণ্টরা নির্দেশ দিতে শুরু করেছে গম্ভীর-কণ্ঠে। হুড়মুড় করে এসে পড়ল টহলদাররা, লাফিয়ে পড়ল নিচে রিপোর্ট দেবার জন্য।

—'ওদের আগুন জ্বালাই ছিল। আর ওরা গান গাইছিল, স্যর—হতচ্ছাড়া কাফেরদের গান। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত হয়ে গেল ব্যাপারটা।'

—'টেম্পোর, টেম্পোর।' চেঁচিয়ে ডাকলেন মারে। 'একজনকে নিয়ে এখানেই থাকবে আহতদের সঙ্গে। গীটি তোমাদের তুলে নেবে কাল। ক্যাপ্টেন উইণ্ট, আগে যাও তুমি!'

ইণ্ডিয়ানদের ঘোড়ার খুরের মিলিয়ে-আসা আওয়াজের পিছনে পছনে ছুটল তারা। ইণ্ডিয়ানরা যেভাবে পালাল তাতে পাহাড় পড়েছে তাদের আর সৈন্যদের মাঝখানে। পাহাড়টা ঘুরে উইণ্ট যখন সবাইকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন নদীর সামনে ছোট্ট একটু চওড়া জায়গায়, আওয়াজ ততক্ষণে মিলিয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে দূর দিগন্তে।

হঠাৎ থামবার হুকুম দিলেন উইণ্ট। গাদাগাদি করে দাঁড়ানো টগবগে ঘোড়া-গুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে এলেন মারে; সামনে আসতেই দেখতে পেলেন, ইতিমধ্যেই ঘোড়া থেকে নেমে উইণ্ট যেন কিসের উপর ঝুঁকে পড়েছেন মাটিতে।

—'ব্যাপার কি?' প্রশ্ন করলেন মারে।

একটা ইণ্ডিয়ান শিশু কোলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উইণ্ট। বছর পাঁচেকের বেশি বয়স হবে না শিশুটির, মৃত অসাড়, গুলি লেগেছে গলায়। গোলগাল মুখখানা, চীনাদের মত বিজ্ঞ ধরনের, তাকিয়ে রয়েছে কালো চোখ দুটো।

টহলদারদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল গর্ডন, দুঃখিতভাবে বলল, 'আমার গুলিতেই বোধ হয়, স্যর। কয়েকটা গুলি চালিয়েছিলাম ওদের দিকে। দঙ্গলটাই চোখে

পড়েছিল শুধু, কিছুই দেখতে পাইনি অন্ধকারে। না ভেবে-চিন্তেই গুলি চালিয়ে-ছিলাম আমি।'

—'ঠিকই করেছিলে তুমি।' উইণ্ট বললেন শান্তকণ্ঠে।

—'ও তো মরে গেছে।' মন্তব্য করলেন মারে।

—'ভাবছি, কবর দেব ওকে।'

—'ওখানে মরে পড়ে আছে আমাদের কত লোক—তাদের তো কবর দেওয়া হয়নি।'

—'ভাবছি, কবর দেব ওকে।' উইণ্ট আবার বললেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন মারে, তারপর ঘাড় নাড়লেন ধীরে ধীরে। কয়েকজন নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে; কোন কথা না বলে একটা কবর খুঁড়তে শুরু করল ছুরি দিয়ে। বেশি গর্ত করল না তারা, মাত্র হাত দেড়েক। কে যেন একটা চাদর ছুঁড়ে দিল সামনে। তাই দিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে অপরিসর গর্তে শুইয়ে দিলেন উইণ্ট।

—'বেশি কিছুর দরকার নেই।' কে একজন বলে উঠল। 'নেকড়েরা সব বোঝে।'

—'দশ হাত নিচে থাকলেও বুঝতে পারে ওরা।' মন্তব্য করল আর-একজন।

মাটি ফেলে গর্ত বুঁজিয়ে সমান করে দেওয়া হল বুট দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে। অন্ধকারের ভিতর থেকে শোনা গেল একটা টানা টানা কণ্ঠস্বর, 'একটু প্রার্থনা করলে হত না, ক্যাপ্টেন?'

চেঁচিয়ে উঠলেন মারে, 'চোপরাও, কথা বলা ঘুচিয়ে দেব নইলে।'

—'কিছু আসে যায় না তাতে।' মৃদু হাসি ফুটে উঠল উইণ্টের ঠোঁটে, বললেন, 'ও তো আর দীক্ষিত নয়, ক্রিশ্চান নয়, তাই কিছু আসে যায় না তাতে।'

আবার ঘোড়ার পিঠে চাপল সবাই। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ; আর প্রয়োজন নেই ঘোড়া-ছোটানোর, তাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল তারা উত্তর দিকে।

চতুর্থ পর্ব

সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮
ওয়াশিংটনের এক মধ্যরঙ্গ

কর্নেল মিজনার ইতিমধ্যেই বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে এক তার পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটনের সমর-দপ্তরে। এজেন্ট মাইলস্‌ও এ ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানালেন ইণ্ডিয়ান-দপ্তরে। কানসাসের লরেন্সে ইণ্ডিয়ান-দপ্তরের সুপারিনটেনডেণ্ট উইলিয়ম নিকলসন কম-বেশি এক বিস্তারিত খবর পাঠালেন স্বরাষ্ট্র-বিভাগে। সাংবাদিকদের কাছে যেন কোন বিবৃতি না দেওয়া হয়, এই মর্মে এক সতর্কবাণী পাঠালেন এজেণ্ট মাইলসের কাছে।

বহু টিপ্পনী আর কিছু পাদটীকা-সম্বলিত মিজনারের সংবাদ এসে পৌছল তার চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল উইলিয়ম টেকুমসে শেরম্যানের বাড়ির মাটির নিচের তলার ঘরে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ভালবাসেন তাঁর পরিবারকে। সত্যি বলতে কি, এত ভালবাসেন যে, স্নেহপ্রবণ আর শান্তশিষ্ট গৃহকর্তা হিসেবে তাঁর নামটা গোটা জাতের কাছে প্রায় প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতবারই কোন সাংবাদিক শেরম্যানের গৃহস্থালি থেকে নিচের তলার অগোছালো ঘরটা পর্যন্ত (সেটা তাঁর অফিস আর পড়বার ঘর) দেখে শুনে আসে, ততবারই সংবাদপত্রের এক চমৎকার খোরাক হয়ে ওঠে তা। হামেশাই হয়ত চোখে পড়ে তার, সর্বাধিনায়ক কাজ করছেন, আর তাঁকে বিরক্ত করছে একটা কি দুটো শিশু। সাংবাদিক মনে মনে বলে :

—'জর্জিয়ার ভিতর দিয়ে গৌরবের (আর ধ্বংসের) পথ কেটে এগিয়ে গিয়েছিলেন যিনি, ইনিই কি সেই লোক ?'

চমৎকার, নিচের তলার ঘরের সিঁড়ির মাথায় আঁটা বিজ্ঞপ্তির মতই সুন্দর বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছোট্ট করে : জেনারেল শেরম্যানের অফিস। এসব থেকে প্রমাণ হয় যে, যতক্ষণ না কোন মানুষকে তাঁর পরিবারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই জানতে পারা যায় না তাঁর সম্পর্কে—তা যতই নামী লোক হোন না কেন তিনি। যাঁরা বড়মানুষ, তাঁরা সহজ সাধারণ মানুষ—পাকা মেহগিনি কাঠের কারুকার্য দিয়ে বিরাট বিরাট অফিসঘর সাজায় যে-সব হামবড়া লোক—তাদের মত নন তাঁরা।

আর এই মাটির নিচের তলার ঘরে বসেই উষ্ণমধুর এক শরতের সকালে জেনারেল শেরম্যান পড়লেন মিজনারের পাঠানো সংবাদ। সংবাদটা এসেছিল অত্যন্ত গতানুগতিকভাবে, সমতল অঞ্চলের সৈন্য-চলাচলের সম্পর্কে একগাদা খবরের সঙ্গে। গণ্ডগোল শুরু হয়েছে আপাচেদের মধ্যে, কোমাঞ্চেদের দুটো আক্রমণ ঘটেছে দক্ষিণে। এক

মাতাল নেজপার্সে-ইণ্ডিয়ান খুন করেছে এক শ্বেতাঙ্গকে, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এক কোম্পানি ঘোড়সোয়ার। ক্লান্ত ভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। এক মাতাল ইণ্ডিয়ানকে খুঁজে বার করার জন্য এক কোম্পানি ঘোড়সোয়ার! একদল চোরাকারবারী হাজার হাজার গ্যালন হুইস্কি পাচার করছে দক্ষিণ-ভার্জিনিয়ায়, তাদের গালাগাল দিয়ে উত্তেজিতভাবে লিখেছে জেমস্ টি. ফ্রেডরিক্স নামে এক মেজর। সে জানতে চেয়েছে, 'এই বদমায়েসরা যদি বিনা বাধায় প্রকাশ্যে তাদের চিনি-মেশানো মদ বেচতে পায় তাহলে কি করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে সামরিক-বাহিনী?' গোটা ব্যাপারটাই জটিলতার এক গোলকধাঁধা। সমতল অঞ্চলের শাসনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে সামরিক-বাহিনী। ইণ্ডিয়ান দপ্তর, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, বান্ধব-সমিতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় মার্শালের মধ্যে দিয়ে আছে বিচার-বিভাগ, আছে বে-সামরিক আইন, প্রাদেশিক পুলিস (যেমন টেক্সাস-রেঞ্জার্স), আছে প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনী—এরকম অন্তহীন ব্যাপার। একটা ভয়ানক কড়া চিঠি লিখলেন তিনি, পরক্ষণেই ছিঁড়ে ফেললেন সেটা। বিচার-বিবেচনা করে আবার লিখলেন একটা ইণ্ডিয়ান-দপ্তরে, ফ্রেডরিক্সের অভিযোগ উল্লেখ করে।

কানাডা থেকে সীমান্ত অতিক্রম করেছে সু ইণ্ডিয়ানরা। নিজে নিজেই বললেন শেরম্যান, 'একদিন না একদিন কানাডার এই গোটা ব্যাপারটাই হাতে নেব আমরা, ঠিকঠাক করে নেব সব কিছু।' তিনি এবং সামরিক বিভাগের আরও অনেকে মনে করেন যে, গৃহযুদ্ধের ঠিক পরেই ব্যাপারটা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে তৈরি ছিল লড়াই করে করে হাত-পাকানো লাখ লাখ ঝানু সেপাই। একবার উত্তরে এগিয়ে গিয়ে মন্ট্রিল আর কুইবেকে অতিক্রুত দুটো আঘাত; ফলে, লাভ হত উত্তর-মেরু থেকে রিও গ্রাণ্ডে পর্যন্ত প্রসারিত একটিমাত্র জাতি। সে যাই হোক, এখনও করা যায় এটা, করতেই হবে তা। আর, উষ্ণতা-শীতলতায় মেশানো নিচের তলার ঘরে বসে কিছুক্ষণের জন্য নতুন অভিযানের স্বপ্নে ডুবে গেলেন জেনারেল, মাছিগুলো ভন ভন করে ঘুরতে লাগল তাঁর মাথার আর দাড়ির চারপাশে, আড়ষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর কাগজপত্রের উপর দিয়ে,—সে-সবে বিশেষ খেয়ালই রইল না তাঁর।

একটা ধর্মঘট চলছে চিকাগোতে; দু'দল সৈন্য গেছে শান্তিরক্ষার জন্য। দু'[illegible] পড়লেন তিনি সেটা। ধর্মঘটগুলোকে ঘৃণা করেন জেনারেল। ওগুলো এক [illegible] বিপদ, এক অসহায়-গোছের ক্রোধ উত্তপ্ত করে তোলে তাঁকে। যেমনটি উচিত [illegible] তেমনভাবে লড়া যায় না ওদের সঙ্গে; এমন কি নিজের কাছেও ব্যাখ্যা করা [illegible] ভবিষ্যতের কোন্ অশুভ অঙ্কুর রয়েছে ওদের মধ্যে। শুধু বুঝতে পারা [illegible] বিপজ্জনক ওরা; বুঝতে পারা যায় যে, তাঁর উর্দিকে উপহাস কর[illegible]।

পড়া শুরু করতে গিয়ে ইতস্ততঃ করলেন তিনি। কার [illegible] দেখতে তাকালেন নিচের দিকে। কর্নেল মিজনার নামে তো [illegible] না কাউকে।

নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন, সমতল অঞ্চলের কোন্ রেজিমেন্টের ? চার নম্বর আছে আরও উত্তরে, এগার নম্বরও নয়। হয়ত চার নম্বরই হবে শেষ পর্যন্ত। প্রায় সমস্ত কর্নেলদের নাম মনে রাখেন তিনি, এটা তাঁর গর্ব। এবার মনে পড়ল মিজনারকে, তিনি এখন অখ্যাত এক ইণ্ডিয়ান অঞ্চলে। রোদের ঝিরঝিরে হাওয়া এসে স্পর্শ করল ডেস্কের কোণাটা, দাড়ি পাকাতে পাকাতে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। চেষ্টা করতে লাগলেন ওকলাহোমার ছবি মনে করতে। বৃষ্টি বেশি হয় কি ? হয়ত এক বৃষ্টির স্মৃতি রয়েছে তাঁর মনে, কিন্তু শুকনো হয়ে গেছে এতদিনে। বৃষ্টিহীন ওখানকার গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টিহীন আর দীর্ঘস্থায়ী। লাল-ধুলোর একটা অভিযোগের কথা মনে পড়ে গেল—নীল উর্দির মধ্যে ঢুকে যায় লাল-ধুলো, ধুয়েও ছাড়ানো যায় না। বৃষ্টিহীন গরম দেশে অভিযান চালাতে হলে ইংরেজরা গায়ে দেয় পাটকিলে রঙের উর্দি, সম্ভবত এটাই বেশি সুবিধের। ধুলোর রঙের কাছাকাছি, না কাচলেও চলে যায়। কোথায় যেন পড়েছিলেন, গরম দেশে সাদা রঙই ভাল ; এই ধরনেরই একটা কিছু লিখেছিলেন না বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ? কিন্তু সাদা উর্দি পরিয়ে দাও কোন সেপাইকে, উর্দি নিয়ে খুঁত খুঁত করবে শুধু, অন্য কিছুই করবে না আর···বোকামি, নিঃসন্দেহে। নীলটাই ভাল রং, দেখ না কি কাণ্ড করে ফেলল নীল রঙেই। তিনি পড়তে লাগলেন :

'......ব্যাপারটা জানাইতেছি যে, উত্তরাঞ্চলের তিনশত শী-এন সম্প্রতি এই সংরক্ষিত এলাকা ত্যাগ করিয়াছে। ডার্লিংটনের ইণ্ডিয়ান এজেন্ট মাননীয় জন মাইলস্ এই বর্বরদের ঔদ্ধত্যে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশের বিরোধিতা করিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এজেন্টের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার নির্দেশ আমার উপর থাকায় এই ইণ্ডিয়ানদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি দুই কোম্পানি ঘোড়সোয়ারকে পাঠাইয়াছি। তাহারা উত্তর মুখে চলিয়াছে, আমার মনে হয়, পাউডার নদীর অঞ্চলে তাহাদের পুরাতন দেশে তাহারা ফিরিয়া যাইতে চায়। তাহাদের মধ্যে প্রায় নব্বইজন সশস্ত্র এবং বাধা দিতে সক্ষম। তাহাদের আটকাইতে না পারিলে তাহারা নিঃসন্দেহে নেবরাস্কা আর কানসাসের ক্ষেতখামার ও অধিবাসীদের ক্ষতি করিবে। আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাঠাইতে পারিব। ইতিমধ্যে আরও নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম।'

চমৎকার রিপোর্ট, মনে মনে বললেন জেনারেল—সেই ধরনের রিপোর্ট, যাতে পরিষ্কার করে দেয় পরিস্থিতি, আর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুবিধা হয়। সমর দপ্তরের ধারণাই তাঁর পছন্দসই—সংক্ষিপ্ত, শৃঙ্খলামণ্ডিত আর কার্যক্ষেত্রে জোরালো দেয়ালে টাঙানো এক বিরাট মানচিত্রের মত ; একগাদা রঙীন পিন আর তারপর একগাদা সুতো—যা একজন মানুষই ধরে রাখতে পারে হাতে। সুতোগুলো হাতে রাখা, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা—দিনে রাতে প্রতিটি মুহূর্তে কোথায় থাকে পিনগুলো, আসল কথা হচ্ছে সেইটে জানা। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে তার, মহাপুরুষরাই

ব্যতিক্রম ঘটায়। আটলাণ্টা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত তাঁর অভিযানটাই ছিল একটা ব্যতিক্রম। তাঁর মনে পড়ল, একবার ডেস্ক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন একটা শিশুকে, বড় বড় চোখে তাকিয়ে ছিল সে স্থির দৃষ্টিতে ; জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

—'কি দেখছ ?'

—'আপনাকে, স্যর।'

—'কেন ?'

—'কারণ, আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জেনারেল, স্যর।'

—'তাই নাকি ?'

—'তাইতো বলে সবাই, স্যর।'

—'কারা বলে ?'

—'প্রত্যেকে, স্যর।'

কিন্তু সবাইকেই আটলাণ্টা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত অভিযান চালাতে দিলে চুরমার হয়ে যাবে সমস্ত কিছু। ও ধরনের কাজ একবারই হয়ে থাকে একটা জীবনে, দশটা জীবনেও একবারই। তার বেশি হয় না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেটা একটা বিরাট ব্যাপার যদি অবশ্য তার উপযুক্ত মানুষ থাকে। তবে কিনা, সেরকম মানুষ বেশি নেই সংখ্যায়। অতীতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি। সূর্যের আলোয় কুণ্ডলিত হয়ে উঠতে লাগল উষ্ণতা আর শীতলতা ; কাজ করার পক্ষে মাটির নিচের ঘরের মত এমন আর কিছুই নেই, উষ্ণতা আর শীতলতায় মেশানো এমন জায়গা আর হয় না, বাতাসের ঝাপটা এসে আলিঙ্গন করে সারা দেহে। কাজের পক্ষে চমৎকার জায়গা। এখন কাজের চেয়ে স্বপ্নই দেখতে লাগলেন বেশি, ভাবতে লাগলেন লিঙ্কনের কথা, কোনদিনই সত্যি করে তাঁর জানা হয়নি লিঙ্কনকে,—অথবা, লিঙ্কনও জানতে পারেননি তাঁকে। অন্য যে-কোন লোকের চেয়েও কম বুঝতে পেরেছেন তিনি কি করে সব সময় লিঙ্কন তাঁর মুখের শান্ত ভাবটুকু বজায় রাখতেন, মুখখানা দেখাত শান্ত, বিষণ্ণ, শ্রীহীন—অন্যের চেয়ে লিঙ্কন নিঃসন্দেহে যখন বেশিও বুঝতে পারতেন না তখনও। অথবা বুঝতে পারতেন অনেক কমই, এই দেখ না কেন, তাঁর আশা, আর ভাগ্য, আর অশ্রু কতখানি ছিল তাঁর কাছে—লোকে বলে, কেঁদেছিলেন লিঙ্কন, এক বাহিনী নিয়ে শত্রুর দেশের কোন এক জায়গায় পথ হারিয়ে কেঁদেছিলেন তিনি স্ত্রীলোকের মত। শেরম্যান আর তাঁর পঁয়ষট্টি হাজার সৈন্য অভিযান করেছিল সমুদ্রের দিকে, গণ্ডেপিণ্ডে গিলতে গিলতে, আর দেশের ক্ষীরননীতে ভুঁড়ি বাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা জাতির, একটা সভ্যতার ভাগ্য। সেটা ছিল একটা 'বন-ভোজন', সেটা যুদ্ধ নয় ; ও ধরনের ব্যাপার একবারই ঘটে একটি জীবনে—হয়ত দশটা জীবনেও একবার।

সবাই যখন রঙিন পিন হয়ে দাঁড়ায়, আর সবগুলো সুতো থাকে তাঁর হাতে, তখনই পছন্দ হয় তাঁর বেশি। সত্যি বলতে কি, শুধু যদি বুঝতে পারতেন লী, ধ্বংস করে দিতে

পারতেন তাঁকে, এমন কি শেষের দিকে দক্ষিণে যখন সব কিছুই হারিয়ে বসেছেন তখনও। লী ঘুরে দাঁড়াতে পারতেন, রিচমণ্ডের কথা ভুলে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে ধ্বংস করতে পারতেন শেরম্যানকে। ইয়র্ক টাউনে ঠিক যেমনটি করেছিলেন একবার ওয়াশিংটন,—আর ওয়াশিংটনের কথা তো মনে থাকা উচিত ছিল লীর। গ্রাণ্ট দখল করুনগে রিচমণ্ড, ততক্ষণে শেরম্যানের হাতে পঁয়ষট্টি হাজার নধরকান্তি সৈন্যের একটি বাহিনী। না, সমস্ত সুতো হাতে রাখাটাই বেশি পছন্দ তাঁর।

রিপোর্টের উপর জেনারেল লিখলেন হিজিবিজি করে: 'স্বরাষ্ট্র বিভাগের জন্য। শূর্জ দেখুন, কত সম্পূর্ণ হল শান্তিস্থাপনা। আর এক বছরের মধ্যে ইণ্ডিয়ানদের গোলমালের স্মৃতিটুকুই থাকবে শুধু।

তারপর তিনি লিখলেন জেনারেল ফিল শেরিডনকে: 'যে তিনশত ইণ্ডিয়ান উত্তরে চলিয়াছে তাহাদের আটকাইবার জন্য ডজ শহর হইতে রেলপথে পূর্বদিকে সৈন্য পাঠাইবে। ইণ্ডিয়ানরা যাইতেছে—' কোন্ জায়গা থেকে যাচ্ছে? আবার স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন তিনি, অবশেষে রিপোর্টটা পড়লেন আর একবার। '—ডার্লিংটন হইতে। ইণ্ডিয়ানরা সংরক্ষিত এলাকা ছাড়িয়া বিপজ্জনকভাবে যাইতেছে, তাহাদের অতি সত্বর ফিরাইয়া আনিতে হইবে। নেতাদের শায়েস্তা করিবার জন্য সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। রেনো কেল্লার কর্নেল মিজনারের নিকট বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।' তাবপর একটা লাইনের নিচে দাগ দিয়ে দিলেন তিনি। 'বেশি কিছু ক্ষতি করিবার পূর্বেই ইণ্ডিয়ানদের গ্রেপ্তার করিতে হইবে, ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

নামটা সই করে তিনি পড়তে লাগলেন তাঁর রিপোর্টগুলো। ছত্রিশ হাজার পাউণ্ড ঘাটতি পড়েছে ময়দার। এসব বাজে জিনিস নিয়ে কেন যে কেবলই বিরক্ত করা হয় তাঁকে! এটা যাওয়া উচিত ছিল রসদ-বিভাগে, অন্য আর-কোন জায়গাতেই নয়।

'সবাই সবাইকে বিরক্ত করে বেড়ায় কেন?' জেনারেল উইলিয়াম টেকুমসে শেরম্যানকে পাঠানো এক রিপোর্টের প্রতিলিপি পড়ে ভাবলেন কার্ল শূর্জ। রিপোর্টটা পাঠিয়েছে ইণ্ডিয়ান এলাকার কোন-এক জায়গা থেকে এক অখ্যাত কর্নেল, জানানো হয়েছে কোন এক দল ইণ্ডিয়ান তাদের সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে এসেছে। সেক্রেটারির পড়ার পর কেন রাখা হয়েছে ওটা তাঁর ডেস্কে? আমলাতান্ত্রিক করে তোলা হচ্ছে কেন গোটা সরকারকেই? তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটির আকাশছোঁয়া রিপোর্টের গাদা ঠেলে ঠেলে যখন কোন মানুষকে এগিয়ে চলতে হয়, তখন স্তূপীকৃত নোংরামির মধ্যে থেকে সামান্য একটু শোভনতা খুঁজে বার করার চেষ্টা করে লাভ কি? আকাশ-ছোঁয়া নয়, তারও বেশি; মনে হয় সব-কিছুই যেন তাঁরই দপ্তরের ব্যাপার। মন্ত্রিসভার পদ নেয় যে, নিজের কবর সে নিজেই খোঁড়ে।

পড়ে ফেললেন তিনি। মনে মনে প্রশ্ন করলেন রুক্ষ মেজাজে, 'মিজনার, মিজনার। কে মিজনার? করতে বলে কি আমাকে? যদি এর প্রতিলিপি করাই, তাহলে পাঠিয়ে দিতে পারি সমর-বিভাগে, ইণ্ডিয়ান-দপ্তরে।' বারের পর বার, প্রতিলিপির পর প্রতিলিপি করে যাবার কথা ভাবতেই হাসি পেল তাঁর। একদিক থেকে এই তো সরকার; সরকারই বলা যেতে পারে একে। ব্যাপারটা প্রায় নাড়া দিল তাঁর মনকে, নিখুঁত জার্মান বৈশিষ্ট্য এতে; যে-কোন কিছুই প্রতিলিপি করাও অসংখ্যবার, সর্বত্র পাঠাও সেগুলো। একটা কিছু হবে তা থেকে, অন্তত প্রত্যেকেই পড়বে সব-কিছু।

তাঁর টিকালো লম্বা নাক থেকে গড়িয়ে রিপোর্টের উপর পড়েছিল পাঁশনেটা, বাঁকা দেখাচ্ছিল কতকগুলো অক্ষর। একটা রুমাল বার করলেন তিনি, যেমন পড়ে আছে তেমনভাবেই সেটা পরিষ্কার করলেন একটা আঙুল দিয়ে; আবার নাকের উপর চড়িয়ে দিয়ে ভোঁতা ভোঁতা আঙুলগুলো বোলাতে লাগলেন দাড়িতে; ভাবতে চেষ্টা করলেন অন্য একটা কিছু, সেই একই লোকগুলো, ইণ্ডিয়ান অঞ্চল নামে উষর দেশের সেই একই অংশ সম্পর্কে। ব্যাপারটা যে খুব গুরুতর তা নয়। মনটা তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত; একই রকমের জিনিস পাশাপাশি রাখতে ভালবাসেন তিনি।

সেক্রেটারিকে ডাকলেন তিনি। লোকটা এলে ডার্লিংটনের উল্লেখ করলেন।

—'নিকলসনের কাছ থেকে যা এসেছে, স্যর?'

—'সম্ভবত।' উচ্চারণটা হল জার্মান ধাঁচের। যখনই তিনি একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেন, চেষ্টা করেন সেই শব্দটাকে স্বরাঘাতবর্জিত করতে; কিন্তু ঠিক সফল হতে পারেন না কখনো।

একটা চিঠি নিয়ে এল সেক্রেটারি কিন্তু সেটা ভুল চিঠি।

—'ডার্লিংটন সম্পর্কে একটা কিছু।' জোর দিয়ে বললেন শূর্জ। এমনকি মনেও আছে তাঁর, চারটে অন্য রিপোর্টের সঙ্গে কেমন করে বাঁধা আছে সেটা।

—'সেই যে শী-এন, আরাপাহো এজেন্সি সম্পর্কে।' বুঝিয়ে দিলেন তিনি ভালভাবে। ওকলাহোমার পাঁচমেশালি মরুভূমিতে যে-সব এজেন্সি আর সংরক্ষিত অঞ্চল আছে তাদের সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান, তারই জন্য যেন গর্ববোধ করলেন বিশেষ করে। পাঁচ পাঁচটা দেশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আছে; পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ মগজে ঢুকিয়ে রাখা—অবশ্য মগজই যদি এ ধরনের জিনিসের থাকার জায়গা হয়—একটা মানুষের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচয়। তারা সেখানে আছে মানচিত্রের মত, ছবি আঁকা, উঁচুনিচু, বাঁকাট্যারা, বড় বড় ফাঁক—আর তাদের সঙ্গে আছে কিছু অংশ আলোক-চিত্রের মত যথাযথ। যেমন, তাঁর সেই শৈশবের দৃশ্যটি, সেই যেদিন জার্মানীর এক ছোট্ট গ্রামে, গুঁড়ি মেরে মেরে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন নর্দমার মধ্যে দিয়ে, বেরিয়ে এসেই দেখতে পেয়েছিলেন পাহারায় খাড়া এক প্রুসিয়ান সৈন্যের দুখানা পা। আর সেই প্রুসিয়ানটা যদি তাঁকে দেখতে পেত, যদি খুন করত তাঁকে—আরও অনেকে যেমন করে খুন হয়েছিলেন সেই বিপ্লবে—কোথায় থাকত তাহলে জার্মানি আর

সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন আর যুক্তরাষ্ট্রের অপূর্ব ছাপ-আঁকা এই গোটা মানচিত্রটা ?

—'যত সব বোকামো।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। কেউ কেউ ভুলে যায় অতীত; কেউ বা বাস করে অতীতের রাজ্যেই। কেউ কেউ যাপন করে একটিমাত্র জীবন—আর সহজ সরল সেইটেই, স্বচ্ছন্দগতিতে নদীর মত। তাঁর মনে হল সেইটেই ভাল সবচেয়ে; তাঁর মত নয় সে-জীবন, এত অসংখ্য জীবন যাপন করেছেন তিনি, সেগুলোকে একসূত্রে গাঁথার অর্থই হয় না কোন।

সেক্রেটারি ফিরে এল, এবার আনল ঠিক চিঠিটাই। কার্ল শূর্জের পড়া শেষ হলে সমর-দপ্তর থেকে পাঠানো চিঠির পাশাপাশিই রেখে দিল সেটা। এবারে ঠিক হয়ে গেল সব-কিছু, এবারে ডার্লিংটনের ঘটনা থাকবে একটা আলাদা ম্যানিলা খামের ভিতরে। তারপর গাঁথা পড়বে স্বরাষ্ট্র বিভাগের আরও হাজারটা খামের সঙ্গে, ধুলো জমবে তার উপরে।

—'হয়ত এই পথই একমাত্র পথ,' বিভিন্ন জেনারেল, কর্নেল আর মেজরদের যে নির্দেশ দিয়েছেন শেরম্যান সেটা পড়ে মনে মনে ভাবলেন তিনি। এসব অনেক কিছুই ঘটেছে তাঁর জীবনে; ধুলো, কাদা, ঘাস আর আন্দোলিত হলুদ গমের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আছড়ে ফিরেছে হাজার হাজার জোড়া বুট। রিপোর্টে মিজনারের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন তিনি; আবার চেষ্টা করলেন মনে করতে, কোথায় আছে সে। মিজনার—মিজনার—কেবলই রেজিমেণ্ট পালটায় ওরা সমতলে। এমন কি শী-এনদের দলটাও যে কোথাকার মনে করতে পারলেন না তা, গত কয়েক বছরে অন্তত ছ'ছটা দলকে উত্তর থেকে এনে বসানো হয়েছে ইণ্ডিয়ান এলাকায়। ঝামেলাবাজ জাত ওরা। সমতলের ইণ্ডিয়ানদের কথা সব সময় মনে করিয়ে দেয় নির্জন তৃণ প্রান্তরের বর্বর তাতার আর কসাকদের। কিন্তু আরও বর্বর শী-এনরা, আরও দুর্ধর্ষ, আরও জঘন্য। সমতলের যারাই জানে এসব তারাই বলে, ওদের জীবনটাই নাকি লড়াই করার জন্যে। কিন্তু এ কথাটায় তাঁর সন্দেহ আছে; এমন কি এরকম ধারণা প্রুসিয়ানদের সম্পর্কেও পোষণ করেননি তিনি কখনো,—যে প্রুসিয়ানদের তিনি ঘৃণা করেন গভীরভাবে, ঘৃণা করেন নিঃশব্দে, ঘৃণা করেন অত্যন্ত সঙ্গত কারণে। খুন করার জন্য, শুধু মাত্র খুনের জন্য বেঁচে থাকে না কোন জাত—ছেলেপুলে, স্ত্রী-পরিবার থাকতে পারে না তেমন জাতের, তারা মুছে যায় পৃথিবীর বুক থেকে।

আর আজ শী-এনদের এই ছোট্ট দলটা, সবসুদ্ধ তিনশোজনের একটা ছোট গোষ্ঠী পালিয়ে গেছে সরকারের দেওয়া জায়গা ছেড়ে। তারা চলেছে উত্তরে, তাদের দেশে—হাজার মাইল দূরে। শিশুর মত তাদের মন, আর তাদের মরতে হবে তার জন্যই।

—'নিষ্ঠুর মৃত্যুই তাদের ভাগ্যে,' নিঃসংশয় হলেন তিনি। 'একটি জিনিসই জানে বলে মনে হয় ইণ্ডিয়ানরা—জানে, মরতে-হয় কি করে।'

কিন্তু উদগ্র হয়ে উঠল তাঁর কৌতূহল, আরও বেশি জানতে ইচ্ছে হল তাঁর।

শেরম্যানের অত দ্রুত নির্দেশ দেওয়াটা কতখানি অপছন্দ করেন তিনি সেটা খেয়ালই রইল না তাঁর। সৈনিক ছিলেন তিনি নিজে, ফৌজি মেজাজ চেনেন; কিন্তু বুলেট তো আর প্রতিটি অসুখেরই ওষুধ নয়।

ডার্লিংটনের কাগজপত্রগুলো পড়তে লাগলেন তিনি মন দিয়ে। পুরো দু'ঘণ্টা ধরে বিবেককে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, প্রশ্ন করতে লাগলেন নিজেকেই, কার্ল শূর্জ না হলে এসব সামান্য ব্যাপারে এতটা মাথা ঘামাত কে-ই বা আর? অবশেষে বুঝতে পারলেন, কিছুই করবেন না তিনি।

মনে মনে বললেন, 'কিন্তু কিছুই যে করবার নেই।' ঠিক করলেন পরের দিন সকালেই দেখা করবেন শেরম্যানের সঙ্গে। কিন্তু করতে পারবেন না কিছুই। আগাগোড়া ঠিকই করেছেন শেরম্যান। আইন ভাঙলে শাস্তি তো দিতেই হবে আইনভঙ্গকারীদের।

কিন্তু বাধা পড়ল অন্যসব ব্যাপারে, আর কেমন করে যেন জিনিসটা মন থেকে সরে গেল পরের দিন সকালেই। ম্যানিলা খামে ঢাকা ডালিংটনের রিপোর্টগুলো পড়ে রইল তাঁর ডেস্কের উপর, এগারটা পর্যন্ত কিন্তু বিশেষ মনে পড়ল না তাঁর সে-সব; তারপর মন্ত্রিসভার বৈঠকের জন্য ছুটতে হল তাঁকে। যাবার মুখে নজরে পড়লো সেগুলো, ঠিক করে ফেললেন, যেমন করেই হোক কথা বলবেন শেরম্যানের সঙ্গে।

বহুক্ষণ ধরে চলল মন্ত্রিসভার বৈঠক, আর বসে বসে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন প্রেসিডেণ্টের জন্য। আসতে দেরি হল হেইয়েসের। ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলেন সমর বিভাগের সেক্রেটারি ম্যাকক্রারি, রাগতভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন ঘণ্টাগুলো। সিগারের গোড়াটা দাঁতে কেটে নিলেন কার্ল শূর্জ, ধরালেন না কিন্তু। বসে বসে ঢুলতে লাগলেন পোস্টমাস্টার জেনারেল।

খাবার দেওয়া হল দুপুরের। কাঁটা-ছাড়ানো মাছ, শাক দিয়ে সিদ্ধ নতুন আলু, তাজা কচি মটরশুঁটি, কফি, আর আপেল দিয়ে তৈরি কেক। কার্ল শূর্জের কাছে আমেরিকার সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা জিনিস হচ্ছে তার খাবার: সাদামাটা, স্বাদহীন, বর্ণহীন—খিদেই শুধু মিটিয়ে দেয়, আর কোন-কিছুই মেটায় না। অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারের মাথামুণ্ডু মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে ক্ষণিকের স্বস্তি হারিয়ে ফেলে যে মানুষ,—তারই মত চিন্তিত অথচ নিস্পৃহভাব নিয়ে খেতে লাগলেন তিনি। দেখেও দেখলেন না আপেল দিয়ে তৈরি কেকটা, কফির সময় ধরিয়ে বসলেন সিগার।

—'গোটা দুপুরটাই বসে থাকতে হবে আমাদের এখানে।' গর্জে উঠলেন ম্যাকক্রারি।

ছাই বেড়ে উঠতে লাগল সিগারের মুখে, তারপর হঠাৎ শূর্জ ধরে ফেললেন তাঁর স্নায়বিক দুর্বলতা কোথায়। অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভেন্সকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, 'হার্নে-সানবোর্ন সন্ধি-চুক্তিটা মনে আছে আপনার?'

অ্যাটর্নি জেনারেল আপেলের কেকটা খাচ্ছিলেন তখন। যে-চিন্তা মনের কোণাতেও

নেই, সে সম্পর্কে হঠাৎ প্রশ্ন করলে যেভাবে মানুষ তাকায়—সেই রকম অনুযোগভরা বিরক্তির সঙ্গে তিনি তাকালেন। শূর্জকে পছন্দ করেন না তিনি। পছন্দ করেন না সব রকম রাজনৈতিক অভ্যাস সম্পর্কে শূর্জের মারমুখী অশ্রদ্ধা; পছন্দ করেন না তাঁর জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলার ঢং, আর ট্যারা চোখের অদ্ভুত চাউনিটা।

—'মনে থাকা তো উচিত আপনার।' শূর্জ বললেন। 'ব্যাপারটা পঁয়ষট্টি সালের।'

—'ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সন্ধি?'

—'ব্যাপারটা পঁয়ষট্টি সালের।' বলে উঠলেন এভার্টস্; পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি তিনি।

চিন্তাগুলোকে নতুন করে জড়ো করতে লাগলেন শূর্জ। সন্ধির অধিকাংশ শর্তই মনে আছে তাঁর, সমতলের ইণ্ডিয়ানরা উত্তরের যে অঞ্চলে আছে, সেখানেই তাদের থাকতে দেবার অঙ্গীকারই হচ্ছে সে সন্ধির সারমর্ম—পাউডার নদীর গোটা অঞ্চল, পশ্চিমে ব্ল্যাক হিলস আর রকি মাউণ্টেন থেকে পূর্বে ইয়োলোস্টোন নদী পর্যন্ত। সন্ধিটা প্রযোজ্য শী-এন আর স্যু'দের সম্পর্কে; কিন্তু মুখত্য শী-এনদের সম্পর্কেই, কারণ স্যু'রা সরে গেছে পুবে অনেকটা দূরে।

সংক্ষেপে বলে চললেন শূর্জ, সিগারের মৃদু মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে ধরিয়ে দিতে লাগলেন প্রাসঙ্গিক ব্যাপারগুলো। টেবিল-ঢাকনার উপর জমে উঠল ছাইয়ের একটানা রেখা। আগাগোড়া এত বিনম্র হয়ে উঠল তাঁর হাবভাব যে যথেষ্ট বে-কায়দায় পড়ে গেলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। 'একটা মতামত চাই আমি।' এই বলে শেষ করলেন শূর্জ। 'অবশ্য, বিস্তারিত প্রয়োজন নেই কোন; একটা আলোচনা উঠলে আপনি যেভাবে দিতে পারেন, সেই রকমের একটা অভিমত শুধু।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডেভেন্স; বললেন, 'চুকে গেছে গোটা ব্যাপারটাই।'

—'কেমন করে?'

—'একদল বর্বরের সঙ্গে তিরিশ বছর আগের সন্ধি-চুক্তির মধ্যে প্রাসঙ্গিক কিছুই দেখি নে আমি, গুরুত্ব খুঁজে পাই নে।'

—'সন্ধি তো করেছিলাম আমরা।' কাঁধ ঝাঁকালেন শূর্জ।

—'এর কোন আইনগত বৈধতা নেই।'

—'নেই?'

—'একটা ভঙ্গি শুধু।' হেসে বললেন এভার্ট। 'ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যত চুক্তিই হোক—তাদের সম্পর্কে একই কথা—একটা ভঙ্গি মাত্র।'

—'এ ধরনের চুক্তিকে বাতিল করার তিনটে আইনগত কারণ দেখাতে পারি আমি।' অ্যাটর্নি জেনারেল বললেন।

নাকমুখ দিয়ে সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে মাথা নাড়লেন শূর্জ।

—'প্রথমত, যখন একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র অপর এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি

করে, সেই চুক্তি ততদিনই কার্যকর থাকে, যতদিন দুটো রাষ্ট্রই থাকে সার্বভৌম। সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই; এমনকি ইণ্ডিয়ানরা যে অঞ্চলে বাস করত, এক সময়ে তার উপরে ওদের সার্বভৌমত্ব থাকলেও এখন তো আর নেই। সে অঞ্চল থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে, এই ঘটনাই সার্বভৌম সত্তা সম্পর্কে যে-কোন দাবিই নস্যাৎ করে দেবে।'

—'দ্বিতীয়ত, এ ধরনের চুক্তির বৈধতা রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপরেই নির্ভর করে। যে মুহূর্তে ইণ্ডিয়ানরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেই মুহূর্তেই নাকচ হয়ে গেছে তাদের চুক্তি। অবশ্য—'

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন প্রেসিডেণ্ট। উঠে দাড়ালেন মন্ত্রিসভার সবাই। হেইয়েস বললেন, 'বসুন আপনারা, বসুন বসুন।'

সভাব আলোচনার বেশির ভাগই রেল-লাইন সম্পর্কে; স্বজন-পোষণ, বঞ্চনা আর প্রতিশ্রুতিভঙ্গের বিশৃঙ্খলার মধ্যে পথ খুঁজতে লাগলেন ক্লান্ত, বিড়ম্বিত হেইয়েস। ডার্লিংটনের ঘটনা আবার ভুলে গেলেন কার্ল শূর্জ। তাঁর মনের মধ্যে শুধু অলসভাবে ঘুরতে লাগল একটিমাত্র ইচ্ছা, জানতে চান, ডেভেন্সের তৃতীয় যুক্তিটা কি। তাও ভুলে গেলেন তিনি সভার প্রশ্ন সম্পর্কে উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, চড়া গলায় গর্জন করে উঠতে লাগলেন আপত্তি জানিয়ে, আরও বেশি বেশি করে কানে বাজতে লাগল তাঁর কণ্ঠ্যবর্ণের স্বরাঘাত-দেওয়া জার্মান উচ্চারণ।

যখন তিনি অফিসে ফিরলেন, তখন সরিয়ে ফেলা হয়েছে ম্যানিলা খামখানা।

ব্যাপারটা আবার তুললেন জ্যাকসন, 'নিউইয়র্ক হেরাল্ডে'র ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা, আর তাও দুদিন কেটে যাবার পর। এই দুদিনে ব্যাপারটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারি। শূর্জ নিজে ছিলেন সংবাদপত্রের লোক; অনেক সংবাদপত্রই পড়েন তিনি। সংবাদপত্র কেমন হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কেও ধারণা আছে তাঁর। মাঝে মাঝে যখন বুঝতে পারেন, সংবাদপত্রগুলো কত বড় শক্তি হয়ে উঠেছে আমেরিকায়, কত বড় হয়ে উঠতে পারবে ভবিষ্যতে, তখন ভয়ে প্রায় আঁতকে ওঠেন তিনি। তিনি দেখতে পান সেই শক্তির বিকৃত দুর্নীতিগ্রস্ত রূপ, অত্যাচার আর মিথ্যার বেসাতি, ঘৃণা আর কুসংস্কারের পক্ষসমর্থনে নিযুক্ত। প্রায়ই তিনি ভেবে থাকেন, এ দেশে যারা জন্মেছে, সেই সব আমেরিকান নিজের দেশের সম্ভাবনা আর গৌরব সম্পর্কে কতখানি অন্ধ। পীড়ন আর অত্যাচারের হাত থেকে পালিয়ে তাঁর মত উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে যে, একমাত্র সে-ই দেখতে পায় এই ধরনের বহু জিনিস। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে তারা স্বীকৃত সত্য বলেই ধরে নিয়েছে। তাঁর কাছে স্বাধীন সংবাদপত্র হল এক জলন্ত তলোয়ার।

সংবাদপত্রের জন্ত বলতে পছন্দ করেন তিনি, পছন্দ করেন জ্যাকসনের মত

লোকের সঙ্গে কথা বলতে। লোকটা জানে যে আমেরিকা চওড়ায় তিন হাজার মাইল, বিশালতায় গোটা পৃথিবীর সমান। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ডে'র প্রশংসা করেন শূর্জ; ত্রুটি আছে এর অনেক, আর অসংখ্যও সে ত্রুটি; প্রথম পাতাটা রাখা হয়েছে জঘন্যতম হাতুড়ে-বিজ্ঞাপনের জন্য। কিন্তু জেমস গর্ডন বেনেটের যুদ্ধঘোষণায় আছে নির্ভীকতার এক নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য, আর সত্যও আছে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে। একমাত্র বেনেটই পারেন জ্যাকসনের মত সাংবাদিকদের বাইরে পাঠাতে, তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছেমত লিখতে দিতে। নিরুত্তাপ সংবাদ পরিবেশনের বদলে তাই এগুলো হয়ে ওঠে উত্তেজক পাঠ্যবস্তু। আর, পড়তে পড়তে রক্তমাংসের সঙ্গে নিবিড় ও উত্তপ্ত ভাবে অনুভব করতে থাকেন শূর্জ।

তাই জ্যাকসন যখন অফিস-ঘরে ঢুকলেন, তিনি হাসিমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। লম্বা, হাড়-বেরুনো, টাকমাথা, কুশ্রী মানুষটা—যে ধরনের কুশ্রী ছিলেন লিঙ্কন; দেখলেই শূর্জের মনে জেগে ওঠে সেই মানুষটির বুক-টনটন-করা স্মৃতি, একদিন তাঁর বন্ধু ছিলেন যিনি।

—'আপনি নিশ্চয়ই কিছু খবর দিতে পারেন, মি. সেক্রেটারি।' জ্যাকসন বললেন। শূর্জকে মি. সেক্রেটারি বলে ডাকাটা তাঁর অভ্যাস, শূর্জও পছন্দ করেন অভ্যাসটা। তাঁর মনে পড়ে যায় পুরনো দেশের স্মৃতি; সব কিছুতেই সেখানে 'হের', পোস্টমাস্টারের আগে 'হের', পুলিসের আগে 'হের', অমুকের আগে তমুকের আগে 'হের'। মানুষ ভুলতে চায় সব-কিছু, কিন্তু মাঝে মাঝে এভাবে একটু ফিরে পাওয়াটাও ভালই।

—'পারি নাকি?' হাসলেন শূর্জ।

—'ইণ্ডিয়ানরা যে লড়াই করতে ঝুঁকেছে, একথা বলা পছন্দ করবেন না আপনি, তা জানি। কিন্তু বেনেট বলেন, লড়াই ঘনিয়ে উঠেছে কানসাসে।'

—'তাহলে সমর-দপ্তরে যান।' ছোট্ট এই রসিকতায় খুশি হয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন সেক্রেটারি।

—'গিয়েছিলাম সেখানে।' জ্যাকসন বললেন। 'তাদের কাছে তো সমতল-অঞ্চলে শান্তি ছাড়া আর-কিছুই নেই, সর্বত্র শান্তি, আর নেশাখোর ইণ্ডিয়ান।'

—'সে তো ভাল কথা।'

—'কিন্তু সংবাদ হয় না এতে। কানসাসে ফৌজ আর ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে লড়াইয়ের যথেষ্ট খবর আছে আমার হাতে।'

—'বাজে কথা!'

—'শী-এন তারা,' সাংবাদিক বললেন। আর তখনই শূর্জের মনে পড়ে গেল ডার্লিংটনের ঘটনাটা।

—'ব্যাপারটা কিছুই না,' শূর্জ বলে উঠলেন। 'পালিয়ে গিয়েছে জনকয়েক শী-এন,

দেশে যাবার জন্যে সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে গিয়েছে তারা; আর কিছু ফৌজি পুলিস পেছনে পেছনে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনতে। ব্যাপারটা এই।'

—'কতজন তারা?'

—'হয়তো শ' তিনেক, মেয়েছেলে বালবাচ্চা সব নিয়ে। জানেনই তো, তারা চলাফেরা করে বেদেদের মত।'

—'এটাই তো কিছু সংবাদ।' জ্যাকসন বললেন।

—'কোন সংবাদই নয় এটা। যে হাজার হাজার ইণ্ডিয়ান শান্তিতে বাস করছে সংরক্ষিত এলাকায়, তাদের কথা লিখবেন না কেন আপনারা? একটা গোটা জাতের জন্যে কেমন করে নতুন জীবনধারা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন সরকার, চেষ্টা করছেন একটা জীবনেই তাদের সভ্যতার স্তরে তুলে দেবার—লিখুন তা নিয়ে। যতক্ষণ না একটা গণ্ডগোল ঘটবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো কেন বলা হবে না ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে? বিরাট একটা যন্ত্র এটা; আপনি কি মনে করেন, এমন একটা যন্ত্র বিনা ভাঙচুরে চিরকাল চলতে থাকবে?'

—'মানুষ যখন লড়াই করে সংবাদ হয়ে ওঠে সেটা।'

—'লড়াই? যোদ্ধার সংখ্যা হবে একশোজনেরও কম। তাদের ফিরিয়ে আনতে পেছনে পেছনে গেছে দুটো ঘোড়সোয়ারের কোম্পানি।'

—'কবেকার কথা এটা?'

—'দু-তিনদিন আগেকার।'

—'তাহলে শেষ হয়ে গেছে এত দিনে?'

—'কেন হবে না?' শূর্জ হাসলেন। 'আপনারা শোনেন, লড়াই হচ্ছে সমতলে। ভাবেন, বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনী কায়দা করে এগুচ্ছে, পিছিয়ে আসছে, ঠোকাঠুকি লাগছে, লড়াই হচ্ছে ভয়ানক ধরনের,—না; আমি তো বলি, ভগবানকে ধন্যবাদ, ও ধরনের লড়াই আর নয় আমেরিকায়। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সেই যে যুদ্ধ, না বলাই ভাল তার কথা—সেই শেষ। আর যুদ্ধ নয় আমেরিকায়। একদল নির্বোধ ইণ্ডিয়ান—বোঝে না সরকার কি চেষ্টা করছেন তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে—তাদের পেছনে পেছনে জনকয়েক সৈন্য গেছে। যুদ্ধ নয় সেটা। পুলিস যেমন করে রেল-ডাকাত খুঁজে বেড়ায় এও তেমনি। তাদের ফিরিয়ে আনা হবে, শান্তিপ্রিয় কৃষক করে তোলা হবে তাদের, সেই তো ভাল পন্থা, তাই না?'

—'অথবা পাঠানো হবে ড্রাই টরটুগাসে?'

—'না না, তা কেন হবে! ড্রাই টরটুগাসের দরকারটা কিসের? আমরা স্বরাষ্ট্র-বিভাগের লোকেরা পীর নই ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ড্রাই টরটুগাসের জেল-খানাতেও পাঠাই নে আমরা প্রত্যেকটি নির্বোধ ইণ্ডিয়ানকে।'

—'ইণ্ডিয়ানরা মরেছে তবু তো ওখানে।' জ্যাকসন বললেন শান্তভাবে।

—'তেমনি মরেছে শ্বেতাঙ্গরাও। লজ্জার ব্যাপার এটা, জানি না কি, জেল নামে

এমন একটা নরককুণ্ড থাকাটা কতখানি লজ্জার বিষয় ? কিন্তু ছুরি চালিয়ে কি আর প্রত্যেকটি ফোঁড়া সারানো যায় ? না না, সময়ের দরকার এতে, দরকার 'বিল' পাশের, প্রস্তাবের, দরকার কমিটির, দরকার ভোটের ; এই তো গণতন্ত্র।'

তড়বড় করে বলছিলেন শূর্জ, তাঁর দাড়িঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন জ্যাকসন। শূর্জ বললেন, 'পাইপটা ধরান। একটু মদ ঢালি। সংবাদ পেয়ে এখানে এসে সংবাদ না নিয়ে ফিরে যাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার, তা বুঝতে পারছি।'

—'ঘুরে এসেছি আমি ওখানে।' ফিসফিস করে বললেন জ্যাকসন, তারপর গিলে ফেললেন হুইস্কিটুকু।

—'কোথায় ?'

—'ইণ্ডিয়ান এলাকায়।'

সাংবাদিকের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন শূর্জ। তাঁর চোখের দিকেও সহজভাবে, কৌতূহলের সঙ্গে তাকালেন সাংবাদিক।

—'গিয়েছি গ্রীষ্মকালে।' জ্যাকসন বললেন।

—'সত্যি ?'

এরপর দীর্ঘ বিরতি। তারপর, এক সময়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন জ্যাকসন। পাঁশেনটা খুলে নিলেন শূর্জ, সতর্কভাবে মুছতে লাগলেন সেটা।

—'দেশে ফিরতে হলে অনেক দূর যেতে হবে ওদের।' মন্তব্য করলেন জ্যাকসন। 'কোন্ জায়গা থেকে এসেছে ওরা ?'

—'মনে হয়, ব্ল্যাকহিলস্ থেকে।' না তাকিয়ে বললেন শূর্জ।

—'ওখানেও গিয়েছি আমি।'

—'সর্বত্রই গিয়েছেন আপনি, তাই না ?'

—'এই এখানে ওখানে। ভাল লেগেছিল আমার ব্ল্যাকহিলস। পাহাড়ে থাকিনি কোনদিন, এইজন্যে পাহাড় আমার ভাল লাগে বোধ হয়, মনে মনে আমি বলেছিলাম, আমেরিকার কিছু ভাল জিনিস আছে এখানেই।'

—'কেন থাকবে না ?' বলে উঠলেন শূর্জ। এমনভাবে বলে উঠলেন যাতে বোঝা গেল যে, মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে সাক্ষাতের।

—'সত্যি—মাথাই খারাপ হয়েছে ওদের। জায়গাটা হাজার মাইল দূর ইণ্ডিয়ান এলাকা থেকে।'

—'হয়তো মাথা খারাপই।' সহজভাবেই শূর্জ বললেন। 'একটা ইণ্ডিয়ান যেভাবে চিন্তা করে, তাতে মাঝে মাঝে মনে করতে পারেন, তার মাথা খারাপ। কিন্তু যেখানে খুশি যেতে দিতে পারেন কি তিন তিনশো বেদেকে ?'

যাবার জন্য পিছন ফিরলেন সাংবাদিক, দরজা পর্যন্ত এসেও শুনতে পেলেন সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর, 'আমি দুঃখিত সংবাদের জন্যে ; লড়াই কোথাও হয়নি কিন্তু।

লড়াইয়ের কথা লেখেন যদি তাহলে খারাপ হবে জিনিসটা। ইণ্ডিয়ানদের জন্তে কিছু করবার চেষ্টা করছি আমরা। জানা উচিত সেটা দেশের।'

—'ভাবতে অবাক লাগছে, দেশ যদি ধিক্কার দেয়!' নিজের মনেই বললেন জ্যাকসন।

তারপর বেরিয়ে গেলেন তিনি। দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন শূর্জ। রাগ হল তাঁর জ্যাকসনের উপর, রাগ হল নিজের উপর, মেজাজ খারাপ করার জন্য। আসল কথা, ব্যাপারটা কিছুই না, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছিলেন জ্যাকসন। এটা অভ্যাস করেন তাঁরা, আর কেউ যদি মন খুলে কথা বলে তো ভুগতে হয় তাঁকে।

এ ব্যাপারে লেখবার মত নেই কিছুই। সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে খুবই তাড়াতাড়ি। তবু ঘণ্টা কয়েক পরে একজন কেরানী এসে ঘরে ঢুকল যখন তখনো বসে রইলেন শূর্জ, দৃষ্টি তাঁর নির্দিষ্ট কোন-কিছুতেই আবদ্ধ নয়।

—'আর কোন-কিছু হবে নাকি, স্যর,' জানতে চাইল কেরানীটি।

—'কিছুই না—'

—'সেণ্ট লুইসের মি. ফ্রিলিং বসে আছেন।'

—'তাই নাকি?'

—'গতকাল আপনি দিন দিয়েছিলেন দেখা করবার।'

—'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর, আমার দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও জেনারেল শেরম্যানের সঙ্গে।'

সেণ্ট লুইসের মি. ফ্রিলিং-এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সারাক্ষণই শূর্জ নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিতে লাগলেন যে, তিনি শেরম্যানের সঙ্গে দেখা করার যে ব্যবস্থা করছেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই তুচ্ছ নোংরা ব্যাপারটা যাতে সংবাদপত্রের বাইরে রাখা যায়, যাতে হৈ চৈ না করে তাড়াতাড়ি ইতি করে দেওয়া যায়।

মাটির নিচের তলার ঘরের অপরিসর সিঁড়ি দিয়ে শেরম্যানের অফিসে নামতে নামতে তারিফ করে মনে মনে হাসলেন শূর্জ, মানুষটার সত্যিকারের সারল্য দেখে এরকম সব সময়েই তারিফ করে মনে মনে হেসেছেন তিনি; বহুজনের কাছে ইনি জর্জিয়া-বিজয়ী, অল্প জনকয়েকের কাছে 'কাম্প', গোটা পৃথিবীর কাছে এক ফৌজি-প্রতিভা। তাঁর এই সারল্যটুকু খাঁটি। তিনি যে একটা নিচুতলার ঘরে থাকেন—এবং সেখান থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কার্য পরিচালনা করে থাকেন, এর মধ্যে কোন লোক-দেখানো ভড়ং নেই। মাটির নিচের তলার ঘর পছন্দ করেন তিনি; শান্তি আর নীরবতার জন্য নিজের চারপাশে স্তূপীকৃত করা মাটির মধ্যে কিছু একটা আছে। তিনি একটা প্রতিভা কিনা, তা বুঝতে পারেন না শূর্জ। যে-কোন ফৌজি লোকেরই প্রতিভা তো দূরের কথা, সত্যিকারের চাতুর্যটুকুই আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রায়ই সন্দেহ জাগে তাঁর। এমন কি, তাঁর

নিজেরও। তবু প্রতিভা জিনিসটা অর্থহীন শব্দের কিছু একটা হবেই। কতকাল আগে তাঁর যে বন্ধুটি মারা গেছেন ফোর্ডস থিয়েটারে—লম্বামত কুশ্রী, আনাড়িগোছের বিষণ্ণমুখ সেই লোকটাও প্রতিভা ছিলেন না। অসামান্য প্রতিভা ছিল বুথের, সে-রাতে সেও ছিল ফোর্ডস থিয়েটারে।

কার্ল শূর্জ সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে আসতেই সামনে এগিয়ে এলেন শেরম্যান তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে, গভীর হৃদ্যতায় করমর্দন করলেন দুই বন্ধুতে। সিগার ধরিয়ে বসলেন দুজনে, মাঝখানে কাগজ-গাদা-করা ডেস্ক, সরু রেখায় সূর্যের আলো এসে ফুটফুট দাগ কেটে দিয়েছে অক্ষরগুলোর উপর, কাঠের গায়ে স্তরে স্তরে উষ্ণতা সঞ্চারিত করেছে শীতল শান্ত হাওয়ায়। গল্প করতে লাগলেন তাঁরা এ ব্যাপার সে ব্যাপার নিয়ে, পুরনো দিনেব ঘটনা নিয়ে। আব ছাই ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন মেঝের উপরেই।

অবশেষে আসার কারণ দেখিয়ে কথাটা পাড়লেন শূর্জ। মিজনারের রিপোর্টটা বার করলেন তিনি, রাখলেন শেরম্যানের ডেস্কের উপর।

—'সেইটা,' একটু হেসে মাথা নাড়লেন শেরম্যান।

—'একজন সাংবাদিক এসেছিল দেখা করতে, বুঝতেই পারেন, নির্বোধ নয় লোকটা। জানতে চাইল সে, কানসাসে ইণ্ডিয়ানদেব সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে কিনা।'

নিঃশব্দে হাসলেন শেরম্যান।

—'মনে হয়, চুকেবুকে গেছে সব-কিছু,' আস্তে আস্তে বললেন শূর্জ। 'চুকে তো যাওয়া উচিত এতদিনে।'

—'চুকে যাওয়ারই মত।' মাথা নাড়লেন শেরম্যান।

—'তাহলে ধরা পড়ে গেছে ওরা ?'

—'মনে হয় পড়েছে। প্রতি দশ মাইল অন্তর টেলিগ্রাফ অপারেটর আশা করতে পারেন না আপনি সমতল অঞ্চলে। এইটে পেয়েছি আজ শেরিডনের কাছ থেকে।'

শূর্জের হাতে তুলে দিলেন তিনি নিচের এই সংবাদটি :

'জেনারেল ফিল শেরিডন সমীপে, জেনারেল পোপের নিকট হইতে, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮—

'উত্তরাঞ্চলের শী-এনদের আটক করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে : ঘাঁটির পূর্বে অথবা পশ্চিমে ইণ্ডিয়ানরা যদি রেললাইন অতিক্রম করে, তাহাদের আগে আগে যাহাতে পৌছিতে পারা যায় সেইজন্য ওয়ালেস কেল্লা হইতে আগামীকাল একশত অশ্বারোহী সৈন্য বিশেষ ট্রেনযোগে যাত্রা করিতেছে। হেইস আর ওয়ালেসের মধ্যবর্তী কানসাস প্যাসিফিক রেললাইনের দুটি নামকরা চৌমাথায় ঘাঁটি গাড়িবার জন্য হেইস কেল্লা হইতে অদ্য সন্ধ্যায় দুই কোম্পানি পদাতিক সৈন্য যাত্রা করিতেছে। তাহাদের মধ্যেকার একটি চৌমাথার পশ্চিমে, রেললাইনের ধারে ডজ শহর হইতে আগত পদাতিক সৈন্যের একটি কোম্পানি ঘাঁটি গাড়িয়াছে। রেনো

কেল্লা হইতে দুই কোম্পানি অশ্বারোহী ইণ্ডিয়ানদের পিছন পিছন চলিয়াছে; তাহাদের সহিত যোগ দিবে ক্যাম্প সাপ্লাই হইতে আগত অশ্বারোহীর দল। লিয়ন কেল্লার সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঘাঁটির পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে নজর রাখিতে; ইণ্ডিয়ানদের যেখানেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে—তাহারা আত্মসমর্পণ না করিলে—সেখানেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে...'

সংবাদটি নামিয়ে রাখলেন শূর্জ। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'এ যে একেবারে ইঁদুর-ধরা ফাঁদ।'

—'নিখুঁত কাজকর্ম পোপের—'

—'ঠিকই। দেখতে পাচ্ছি, ওরা ভাবছে যুদ্ধ লেগেছে কানসাসে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন শেরম্যান, 'কাজকর্ম না থাকলেই স্বভাব বিগড়ায় মানুষের। এতে নড়াচড়া হবে সৈন্যদের। আজকালের মধ্যেই শুনতে পাব পাকড়াও করে ফেলেছে ওরা।'

—'আমারও তাই মনে হয়,' কথা যোগ করলেন শূর্জ। 'অবশ্য বেঁচে থাকে যদি কেউ।'

—'উচিত যা তাই পাবে ওরা। যদি জন দশ-বারো সিপাইকে মারেও ওরা, শেষ পর্যন্ত আমাদের বদলাটা অনেক বেশিই হবে। কোন সহানুভূতি নেই আমার ইণ্ডিয়ানদের উপর। পঞ্চাশ বছর আগেই যদি সাফ করে দিতাম ওদের, ভালই হত তাহলে দেশের পক্ষে।'

—'হয়তো হত—'

—'সর্দার আর পুরুষ যারা বেঁচে থাকবে, তাদের ড্রাই টরটুগাসে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছি আমি।'

—'ড্রাই টরটুগাসে?'

—'বিদ্রোহের শিকড়সুদ্ধ যদি খুলে ফেলতে পারেন, তাহলেই শেষ হয় তা, খতম করা যায় তাকে। জিনিসটা কঠিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইটেই শ্রেষ্ঠ পন্থা।'

—'তাই কি?'

—'নইলে, ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে তার স্ফুলিঙ্গ।'

—'আমারও তাই মনে হয়।' নরম গলায় বললেন শূর্জ। হেলান দিয়ে বসে চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে পরীক্ষা করতে লাগলেন সিগারের গোড়াটা। 'সংবাদ-পত্রের আওতার বাইরে রাখতে পারি যদি এসব, ভালই হয় তাহলে, তবে বিশেষ কিছু আসবে যাবে বলে মনে হয় না। ইণ্ডিয়ান পুনর্বাসন পরিকল্পনাটা সরকারি ব্যাপার, বেদের মত যেখানে ইচ্ছে যেতে দিতে পারা যায় না তিনশো নির্বোধ বর্বরকে। কেবল—' সিগারটা উল্টে ধরলেন তিনি, আর মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ল ছাইয়ের একটা রেখা।

—'মাটির নিচের তলার ঘরে বসে কাজকর্ম করাটা বেশ, সবার মাথার উপরে এক গম্বুজের উপরে বসে থাকার চেয়েও ভাল।'

—'ঠাণ্ডা এখানে।' স্বীকার করলেন শেরম্যান।

—'বেশ ঠাণ্ডা। কি বলছিলাম?' শূর্জ জোরে একটা টান দিলেন সিগারে। 'আপনি তো জানেন, এদেশকে ভালবাসি আমি। অনেক সময় লোকে বলে, ফিরে যাবেন নাকি জার্মানিতে? না, এ চিন্তা আমি মন থেকে দূর করে দিয়েছি কুড়ি বছর আগে। ওরা বলে, আপনার পিতৃভূমি। আমি বলি, যেখানে মানুষ মুক্ত, স্বাধীন, সেখানেই তার পিতৃভূমি। এই আমি বিশ্বাস করি। মানুষ যখন বুড়িয়ে আসে, সে সরিয়ে দিতে থাকে একটার পর একটা বিশ্বাস, মঙ্গল আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ঘুণ ধরে তার মাথার মধ্যে।'

—'অথবা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আসে একটু সতর্কতা, একটু বিজ্ঞতা।'

—'হয়তো তাই। কিন্তু আজ আর ব্যারিকেডের পেছনে লড়তে যাব না আমি, আর আপনিও চাইবেন না জর্জিয়ার মধ্যে দিয়ে অভিযান চালাতে। এই যে 'ফ্রীডম' (Free-dom) কথাটা, এটা কেমন করে এসেছে জানেন? এসেছে অ্যাংলো-স্যাক্সন 'ফ্রী' (Free) আর 'ডুম' (doom) থেকে। তাই আমরা বুঝতে পারি কি এর অর্থ। এর অর্থ, যে কোন মানুষের দাসত্বের বদলে মৃত্যুকে বরণ করবার অধিকার। এর অর্থ, কোন মানুষেরই মৃত্যুবরণের শক্তিকে কেড়ে নেওয়া যায় না। সব কিছু যদি নিতেও পারা যায়, তাহলেও অবশিষ্ট থাকে তার মৃত্যুর অধিকার।'

—'ভারি মজার তো।' শেরম্যান বললেন। 'কিন্তু তবুও তো ক্রীতদাসেরা ছিল, যতদিন না কয়েক লক্ষ শ্বেতাঙ্গ যুবক তাদের জন্য প্রাণ দিল।'

—'ঠিকই—' তাঁর কথায় ফিরে এলেন শূর্জ। 'আশা করছি ইণ্ডিয়ান অঞ্চলেই ব্যাপারটা সমাধা করে ফেলতে পারব আমরা, ড্রাই টরটুগাসে পাঠানো প্রয়োজন হবে না ওদের।'

—'ইণ্ডিয়ানদের বোঝানোর অন্য কোন পথ নেই।'

—'নেই? আমাদের কাছে মনে হয়, অবুঝ ওরা, এমন কাজ ওরা করে যা পাগলামি; এই যেমন, সর্বত্র সৈন্যরা অপেক্ষা করছে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্যে, আর তারা চেষ্টা করছে হাজার মাইল পথ পেরিয়ে যেতে। কিন্তু এর কারণ, হয়তো তারা এত নির্বোধ যে প্রতিটি সম্ভাবনার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে না। দেশে যাবার ইচ্ছা হল, তাই চলল তারা দেশে। উত্তরের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে নেমে পড়ল তারা; কিন্তু এ তাদের কাছে অসম্ভব নয়। দেশে ফিরে যাবার মত এই সহজ কাজটা কোন লোকের পক্ষেই অসম্ভব নয়।'

—'এবারে কিন্তু অসম্ভব।' শেরম্যান বললেন।

তারপর কর-মর্দন করলেন দুজনে আবার। সিঁড়িতে উঠলেন শূর্জ। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য পিছন পিছন গেলেন শেরম্যান, আর বিস্মিত

হয়ে গেলেন তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির অত আস্তে আস্তে পা ফেলা দেখে।

—'ওদের গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে খবর পাঠাব আমি।' বলে উঠলেন শেরম্যান।

কিন্তু তাঁর কথা কানেই গেল না কার্ল শূর্জের। তিনি ডুবে গেলেন আবার তাঁর চিন্তায়; ভাবতে লাগলেন নীতি হিসাবে যা অন্যায় তার প্রয়োগ কি ভাবে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে!

সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮

কাউবয় আর ইণ্ডিয়ানরা

ক্যাপ্টেন মারে যাকে ডজ শহরে পাঠালেন সেই সৈন্যটি নিউ জার্সির চাষীর ঘরের এক বছর-উনিশের ছেলে. দেখতে ঢ্যাঙা, ল্যাগবেগে। মাথার চুল লাল, ঘোড়ার মত লম্বা মুখখানা, জড়ুল আর মেচেতায় প্রায় ঢাকা। ডাকনাম 'রেড', দেওয়া নাম ইচাবোড। প্যাটারসনের ওধারে এক ছোট্ট খামারবাড়িতে তার পরিবার খুঁটি গেড়ে না বসলে, তারা ভ্যানেস্টরা, ভ্যানডারবিণ্টস্ আর অ্যাস্টরদের সমকক্ষ হতে পারত। সমুদ্র থেকে বহুদূরবর্তী প্রদেশের ওলন্দাজ তারা, ধীরস্থির, কষ্টসহিষ্ণু, শান্ত। নোংরা পরিষ্কার করেছে পুরুষের পর পুরুষ ধরে ; প্যাটারসনের ওদিকে বেশিদূর যায়নি কখনো। তাদের পছন্দ নগদ টাকা, আর নিরাপত্তার জন্য যথেষ্টই টাকা থেকেছে তাদের হাতে। বিদেশে সর্বপ্রথম বেরিয়েছে ইচাবোড-ই, সর্বপ্রথম দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা তারই। যে অশান্তির ফলে সৈন্যদলে, আর সেখান থেকে এই সমতল অঞ্চলে আসতে হয়েছে তাকে, তাতে এমন কি ঘাবড়েও গেছে সে।

বাড়ির জন্য সব সময়েই মন কেমন করে তার। মন কেমন করে শান্ত পরিবেশের জন্য, নিরাপত্তা আর ওলন্দাজি গুরুভোজনের জন্য। মন কেমন করে মরাই বোঝাই পাকা ফসলের গন্ধের জন্য, কালো কালো নোংরা মাটির স্পর্শ অনুভব করার জন্য, মন কেমন করে সমুদ্র থেকে বহু দূরের দেশ সেই জার্সির প্রতিবেশিত্বের জন্য। মন কেমন করে মোটাসোটা, নীলচোখ তার এক আত্মীয়-কন্যার জন্য। যত দিন যাচ্ছে, অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠছে সে। নিঃসঙ্গতার ফলে তার মধ্যে জমে উঠেছিল খুনোখুনি করার একটা নীরব ইচ্ছা, আর থাবড়া মাংসপেশীর জন্য হাত তার উঠেই থাকত হাওয়া-কলের মত। কখনো সে মার খেত, কখনো আবার খেত না। তার চুলের রং লাল, তাই মারপিট করাটাই স্বাভাবিক তার পক্ষে।

আজ পর্যন্ত যা দেখেছে, তার মধ্যে শী-এনদের অনুসরণ করার ব্যাপারেই সে প্রথম গন্ধ পেল সত্যিকারের লড়াইয়ের। আর জোর কদমে সারাটা রাস্তা ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে ভয় বাড়তে লাগল মনের মধ্যে। কাউকে খুন করতে চায় না সে, সেও চায় না খুন হতে। যন্ত্রণা সহ্য করতে চায় না সে, চায় না রক্ত ঝরাতে। পুরনো সৈন্যরা ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে যে-সব কাহিনী তার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে, খুব ভাল-ভাবেই বিশ্বাস করে সে সব। মারে যখন তাকে ডজ শহরে পাঠালেন তখন ভগবানের আশীর্বাদ বলেই সেটা মনে হল তার কাছে। তার স্থির বিশ্বাস, যখন সে ফিরে আসবে ততদিনে মিটে যাবে সব-কিছু।

এক বছরের মধ্যে এই প্রথম সে স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পেল রীডার পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে যাওয়াতে। মৃত্যুর মুখ থেকে ছিটকে একা একা স্বাধীনভাবে তৃণ-প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলাটাই তার কাছে প্রায় নতুন জীবন শুরু করার সামিল। রাস্তা চেনে, কথাটা সে মিথ্যে বলেছিল। কিন্তু ভাবান্তর ঘটেনি তার এই মিথ্যে বলায়। কারবার তার ভাগ্য নিয়ে, তাই যখন অতি সহজেই গরু-ভেড়ার পায়ে চলা রীডারে পৌছনোর রাস্তাটা পেয়ে গেল, তখন আশ্চর্য হল অতি সামান্যই। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জোরে, খুশি মনেই; কোল্ড ওয়াটারে পৌছতেই ভয় উবে গেল মন থেকে। বুক ফুলে উঠল তার উর্দির গর্বে, নিজেকে মনে হল আর দশজন থেকে পৃথক। 'মনার্ক-সেলুনে'র বাইরে বসে এক গেলাস বিয়ার গিলে নিল ঢকঢক করে, তারপর গর্বের সঙ্গে বলে চলল হালফিল ইণ্ডিয়ান যুদ্ধের বিস্তারিত সংবাদ।

—'কিন্তু ফৌজ আছে ওদের পেছনে পেছনে,' নিষ্কর্মাদের ছোট দলটাকে আশ্বাস দিল সে। 'ফৌজ আছে সঙ্গে সঙ্গে—'

অলস নিস্প্রাণ জায়গা কোল্ড-ওয়াটার। ভেবে সে অবাক হয়ে গেল, কি করে যে ওরা মনার্ক-সেলুনের সিঁড়িতে বসে দিনরাত ভেরেণ্ডা ভাজে; সমতলের বুকে ইণ্ডিয়ানরা এসে পড়েও যদি, তাতেও ভাবান্তর ঘটবে না ওদের। ক্লান্ত ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে রীডারে আসতে যতটুকু সময় লেগেছে তারই মধ্যে ইণ্ডিয়ানরা নিশ্চয়ই ধারণ করেছে রণং দেহি মূর্তি। অন্ধকার ঘনিয়ে এল এরই মধ্যে। গাড়ি ছুটিয়ে জনকয়েক র‍্যাঞ্চ-মালিক চলেছিল গ্রামের দিকে। তারা গাড়ি থামিয়ে শুনল তার কাহিনী, তারপর ছুটে গেল ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাতে কষাতে। ফ্রি স্টেট হোটেলের লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল চারখানা ঘরের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ঘরখানা।

—'ভরসা করবার মত চিজ বটে ফৌজ।' একজন বলল।

স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ার কথা পর্যন্ত উঠল, কিন্তু ওঠা পর্যন্তই, এগোলো না বেশি দূর। ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে সেই কাহিনী ওদের শোনাতে শোনাতে ক্লান্তিতে মাথা ঘুরতে শুরু করল ভ্যানেস্টের, উঠে পড়ল সে তখন।

সকালে যখন রীডার ছাড়বে এমন সময় লাল-চোখো দুই লোচ্চা এসে জুটল তার সঙ্গে; বলল, ওর সঙ্গে যেতে চায় ডজ শহরে, সেখানকার ব্যাপার-স্যাপার কেমন গড়ায় তাই দেখতে। এমনিতেই ডজ শহরে যাচ্ছিল তারা; ফৌজ এতে মনে করবে না তো কিছু?

—'কিচ্ছু ন', কিচ্ছু না।' দাঁত বার করে হাসল ভ্যানেস্ট।

ওরা বলল, 'ঠিক আছে 'রেড'। লাল-বেজন্মাদের ব্যাপারে একজনের চেয়ে তিনজন তো ভালই।'

হয় ওদের মাইনে চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, নয়তো চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে কোল্ড-ওয়াটারের ওদিককার কোন মনিব। মনিবের নাম ব্ল্যাক, সে লোকটা যে বেজন্মা এ ব্যাপারে একমত দু'জনেই।

ছোট লোচ্চাটার নাম ম্যাকগ্রাথ, অন্যজনের নাম সাটন। কোমরে তাদের শক্ত করে গোঁজা বড় বড় কোল্ট পিস্তল। গায়ে নোংরা কোর্তা, দাড়ি কামানো হয়নি দিন চারেক। ওদের দেখে একটু ভয়ই পেল ভ্যানেস্ট, কিন্তু সঙ্গে আসাতে মনে করল না কিছু। লোচ্চারাও সমীহ করে চলবে উর্দিকে।

—'ডজ একটা পেল্লায় বড় জায়গা।' ম্যাকগ্রাথ বলল। প্রায় তিন-চারবার বলল সে কথাটা। কোন কথা বলল না অপরজন। জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল তারা। কিছুক্ষণ পরে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

দুপুরের আগে তারা বিশ্রাম করল। তার খাবারের ভাগ দিতে গেল ভ্যানেস্ট।

—'কিছু দরকার নেই। পেলে একটু মদ খেতে পারি।' ম্যাকগ্রাথ বলল।

—'আমার কাছে তো নেই।' হাসল ভ্যানেস্ট। 'কাল রাতে বোধ হয় একটু বেশি মাত্রা হয়ে গিয়েছিল তোমার।'

—'নাক শুঁকে ধরার কেরামতি আপনার বেজায়, সেপাইজি।' বিড়বিড় করে বলল সাটন।

হেসেই চলল ভ্যানেস্ট দাঁত বার করে। ওদের দুজনের সঙ্গে হাতাহাতি বাধিয়ে বসতে চাইল না সে। ওদের ভাব-সাবে, কিংবা যেভাবে পিস্তল বেঁধে-ছেঁদে আছে তাই দেখে, ভাল লাগল না তার। তড়বড় করে সে বলে চলল শী-এনদের কথা।

—'ওদের যারা পাকড়াও করতে পারে, তাদের দেখা আছে আমার।' ম্যাকগ্রাথ বলল। 'ফৌজের কাজ নয়। ফুটো পয়সাও দিতে রাজি নই আমি ফৌজের জন্যে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ভ্যানেস্ট। শীগগিরই তারা এসে পড়বে ডজ শহরে।

—'এবার চল, সেপাইজি,' সাটন বলে উঠল।

এক ঘণ্টার মধ্যে রেল-লাইনে এসে পৌঁছুল তারা, রেল-লাইন ধরে ধরে এগিয়ে চলল পশ্চিমে ডজ শহরের দিকে। ভ্যাপসা গরম দিনটা, জলভরা মেঘগুলো জমে উঠছে দক্ষিণে। ডজ শহরের কাছাকাছি এসে একটা উঁচু জায়গার উপর উঠতেই ছোট ছোট ঘাসের ভিতর থেকে চোখের সামনে জেগে উঠল শহরটা বিশীর্ণ মরীচিকার মত। ফ্রন্ট স্ট্রীটের উপর দাঁড়িয়ে আছে রং-না-দেওয়া, কাত-হয়ে-পড়া কাঠের বাড়ির একটানা সারি রেল-লাইনের দিকে মুখ করে। সমতলের আর যে সমস্ত শহর দেখেছে ভ্যানেস্ট তাদের থেকে এই শহরের বিশেষ পার্থক্য এইটুকু যে, মানুষ এখানে বাস করে এই ভানটুকু এ শহরের নেই। মানুষের বাস করার বাড়িঘর এখানে নেই, এই নিয়েই এখানকার ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। কানসাসের পেটের উপর এ যেন একটা মারীগুটির মত, একটা দুষ্ট ব্রণ, ফুলে-ফেঁপে-ওঠা একটা ক্ষতের মত। প্রথম থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি এ শহর, এমন কি সীমান্তের শহরগুলোর মত ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করেও গড়ে ওঠেনি। একদিন কিছুই ছিল না এখানে; তারপর এল রেল-লাইন, তারই সঙ্গে এল ডজ শহর, এক সঙ্গে ছুঁড়ে দিল কে যেন, জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠল লোকের ভিড়।

মানুষ এসে ভিড় করল এখানে, যেন খবর পেয়েছে বাতাসের মুখে। জায়গাটা বড়সড় উঁচুদরের, দেখতে ভালই। বাস করবার মত ঘর এখানে নেই, কিন্তু ফ্রন্ট স্ট্রীটে গায়ে গায়ে লাগানো লম্বা সার দেওয়া মদের ভাঁটি, পাঁচমেশালি দোকান, বেশ্যাবাড়ি, জুয়োর আড্ডা এত বেশি আছে যার জন্য সমতলের যে-কোন শহরের চেয়ে গর্ববোধ করতে পারে ডজ শহর। দিন বলে কিছু নেই এখানে, রাতও নেই, দুটোই এক হয়ে গেছে ডজ শহরে। রেল-জংশন এটা। চিসহোম পথরেখা ধরে দক্ষিণ থেকে হাজারে হাজারে আসে টেকসাসের গরু-ভেড়া, সাণ্টা ফে রেল-লাইন ধরে চলে যায় পুবে গাড়ি বোঝাই হয়ে। টেকসাসের লোকেরা হাজারে হাজারে যোগ দিয়েছিল গৃহযুদ্ধে, তারা সঙ্গে করে এনেছে ঘৃণা, সেই ঘৃণা তারা উগরে দেয় রক্তে আর ভাঙা হাড়ে। তারা মিশে গিয়েছে কানাডা থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত সমতলের গুণ্ডাবদমাসদের সঙ্গে। দুর্গন্ধ কাঁচা চামড়া নিয়ে আসে বাইসন-শিকারীরা, চোরাই মদের কারবারীরা প্রধান ঘাঁটি করেছে এখানে। এখান থেকে বন্দুক আর মিষ্টি মদ চালান দেয় ইণ্ডিয়ানদের কাছে। ভ্রমণবিলাসীরা ডজ শহরেই খুঁজে পায় বিপুল বাধাবন্ধহীন পশ্চিমাঞ্চলকে। ইংরেজ লর্ড, আর রুশ গ্র্যাণ্ডডিউকদের দেখা চাই-ই ডজ শহর। মনে রাখতে হবে যে আমেরিকাকে! যে মানুষের দল খেটে মরছে, গড়ে তুলছে, সংসার পালন করছে, তৈরি করছে ঐতিহ্যহীনের ভবিষ্যৎ, তাদের মধ্যে কিছু না থাকলেও এখানে তারা খুঁজে পায়—আমেরিকাকে মনে রাখবার মত জিনিস। এখানে তারা শুনতে পায় গর্জন করে উঠছে বন্দুক, দেখতে পায় শব-শোভাযাত্রা চলেছে বুটহিলের দিকে।

মাইলখানেক দূর থেকে জায়গাটার গন্ধ নাকে এল ভ্যানেস্টের। মাটির কাছাকাছি থেকে উঠছে গন্ধটা, আর সেই গাঢ় গন্ধে মিলিয়ে গেল তৃণপ্রান্তরের গন্ধ। গন্ধটা এত গাঢ় যেন ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়া যায়—পচা বিয়ার, খারাপ হুইস্কি আর রেল-লাইনের পাশে বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু গাদা-দেওয়া হাজার হাজার চামড়ার পচা মাংসের পাঁচ-মেশালি গন্ধ। গন্ধের চোটে কাশতে লাগল ভ্যানেস্ট, বমি করতে শুরু করল সাটন।

—'ওরে বাপ্‌স, একটু মদ পেলে হত,' সাটন বলে উঠল।

ফ্রন্ট স্ট্রীট কর্মমুখর, কর্মমুখর মদের ভাঁটিগুলো, যদিও তখন সবেমাত্র দুপুর গড়িয়েছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে লোকজন শহরে আসছে, বাইরে যাচ্ছে, ধুলো উড়ছে ঝকর-ঝকর-করা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে। লম্বা রেলিং বরাবর এত কাছাকাছি করে ঘোড়াগুলো বাঁধা, মনে হয় যেন গোছা গোছা মটরশুঁটি।

লাগামে ঢিল দিয়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ভ্যানেস্ট, অবাক হয়ে তাকাতে লাগল চারপাশে। ধুলো উড়িয়ে মাইলের পর মাইল সে যে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে প্রায় ভুলেই গেল সে-কথা। কিন্তু রেনো দুর্গের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার কথা মনে পড়তে তার মনে হল সে যেন এসে পড়েছে আর একটা জগতে—আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে এ

জগৎ, নিজেকে মনে হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তবে তার উর্দিটা তাকে যে নিরাপত্তা দেবে সে-কথা ভেবে আনন্দিত হল সে।

তৃতীয় মদের ভাঁটিতে গিয়ে ম্যাকগ্রাথ আর সাটনকে হারিয়ে ফেলল ভ্যানেস্ট, তাদের হারিয়ে স্বস্তিই বোধ করল সে। লঙ্‌ব্রাঞ্চ, স্টকম্যান, আলামো, লোনস্টার, কেলি'স্ প্লেস, সুগার'স্ প্লেস, অ্যান ক্লিচে'স্ প্লেস—ডজ শহরের অসংখ্য মদের ভাঁটি সম্পর্কে যা কিছু সে শুনেছে, শুনে মনে মনে যা কল্পনা করেছে, এর কাছে তা কিছুই নয়। আলামোর সামনে ম্যাকগ্রাথ আর সাটন এসে ঘোড়া বাঁধতেই আবার ফিরে এল তার ছাড়া-পাওয়া উত্তেজনার অনুভূতি।

—'আবার আপনার দেখা পেয়ে গেলাম, সেপাইজি।' চেঁচিয়ে ডাকল তারা দু'জন।

তারপর লেডি গে থিয়েটারের সামনে ছেলেমানুষের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল 'পোস্টার'টা, 'এড্ডি ফে—লণ্ডন, পারি, নিউ-ইয়র্কের আকর্ষণ, নিজস্ব নাচ আর গান'; মনে মনে ভাবতে লাগল, শুধু এক রাতের ছুটি—যদি ওরা শী-এনদের ফিরিয়েও আনে, তাহলেও বলবার মত কিছু গল্প জমবে তার হাতে। তাড়াতাড়ির কোন প্রয়োজন বোধ করল না সে। এখান থেকে সৈন্যরা যাবার আগেই খতম হয়ে যাবে শী-এনদের ব্যাপার। এই সৈন্যদলটি যে শী-এনদের অথবা মারের লোকজনদের খুঁজে পাবে তারও সম্ভাবনা নেই। সে শুধু তার কর্তব্য করছে, তার কাজ শুধু খবর পৌঁছে দেওয়া, কিন্তু তাড়াহুড়োর দরকার নেই তাতে।

ভারাক্রান্ত মনে সে ডজ শহর ছাড়ল। ডজ কেল্লা চার মাইল দূরে, ফৌজের ঘাঁটি সেখানে। আজ রাতটাই ছুটি পাবে, না কাল পাবে এই কথাই ভাবতে ভাবতে চলল সারাটা রাস্তা। মারে যে সৈন্যদলের সাহায্য চেয়েছেন, তারা তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারে এর ও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে সৈন্যদলের কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয় না, এ তার জানা; তাই একটু আশ্বস্ত হল মনে মনে। দীর্ঘসূত্রতার কোন-একটা কারণ ঘটবে নিশ্চয়ই। ঘোড়া চালাতে লাগল আস্তে আস্তে। যদি সন্ধ্যার দিকে ঘাঁটিতে পৌঁছয় তবে হয়তো পরের দিন সকালের জন্য সব-কিছু মুলতুবি থাকতে পারে।

শেষদিকে ঘোড়াটাকে একটু তাড়া দিলেও এক ঘণ্টার প্রায় বেশিটুকুই সে কিন্তু কাটিয়ে দিল গড়িমসি করে। ঘাঁটির ভিতরে ঢুকল বেশ জোর কদমে। এখন তার গুরুত্ব অনেক; তাই এগুতে লাগল সে ভারিক্কি চালেই, কিন্তু সে চালটা উবে গেল যখনই জানতে পারল শী-এনদের পালানোর খবর ডজ দুর্গের লোকেরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে টেলিগ্রাফ মারফত। তার আনা সংবাদ নিয়ে যাওয়া হল কর্নেলের কাছে, সেই ফাঁকে তাকে চেপে ধরল সৈন্যরা। ফস্টিনস্টি করতে লাগল ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপার নিয়ে, তার লালরঙের চুল নিয়ে। কিন্তু ওরা সবাই পদাতিক সৈন্য, তাই ডাঁটের মাথায় সেও বুট ঠুকল, তলোয়ার ঝাঁকাল। একসঙ্গে খেতে বসে লেডি গে থিয়েটার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে সে অনেকখানি নম্র হল।

—'এসব সত্যি ?' জানতে চাইল।

—'সত্যির বাবা।'

—'বেশ 'ওড়া'র জায়গা এই ডজ শহর, তাই না?'

—'এক্কেবারে ডানা ছড়াবার মত। আর গোল্লায় যাবারও ফাঁদ পাতা।' ওরা বলল তাকে।

—'মাইরি—' শিস্ দিয়ে উঠল সে। জিজ্ঞাসা করল মৃদুকণ্ঠে, 'বেশ্যাবাড়িটাড়ি ?'

—'এমন জায়গা, আর এত অগুন্তি কোনদিন দেখনি হে, লাল ঝলমলে সব কার্পেট পাতা।'

—'ও কথা কেন বলছ ?'

—'ঠিকই বলছি।' ওরা উত্তর দিল, 'ধ্যেৎ, ফুটো-মাদারী ঘোড়সোয়ারদের জন্যে নয়। ওদেব খাঁকতি বেশি।'

—'সঙ্গে আমার মাইনের টাকা আছে,' হাসল সে দাঁত বার করে। 'মাইরি, ছুটি পাব কি পাব না তা জানি না—জানিও না কাকে রিপোর্ট করব। তবু সখের নাচগান দেখার ইচ্ছে আমার বেজায়। থিয়েটার দেখিনি অনেকদিন—প্রায় দু বচ্ছর হবে।'

—'কোন থিয়েটারই তুমি কোনদিন দেখনি, ছোকরা।'

—'সত্যি দেখেছি।' হাসল সে।

খাওয়া শেষ হবার আগেই এক সার্জেণ্ট এসে খুঁজে বার করল তাকে, তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে এখুনি রিপোর্ট করতে বলল কর্নেল লীচের কাছে। বাদবাকি খাবারটা তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে সার্জেণ্টের পিছন পিছন অফিসারদের খাবার ঘরে এল বিরস মুখে। তখন সেখানে স্যুপ পরিবেশন করা হচ্ছিল ; স্যুপটা উদরস্থ করে তবে তার দিকে নজর দিলেন কর্নেল লীচ।

—'ক্যাপ্টেন মারের খবর তুমিই এনেছ ?' লীচ জিজ্ঞাসা করলেন।

—'হ্যাঁ, স্যর।'

—'নাম কি ?'

—'ভ্যানেস্ট, স্যর।'

—'মুখে কিছু বলা হয়েছিল তোমাকে ?'

—'না, স্যর। শুধু বলেছিলেন ডজে যেতে।'

—'কখন ছাড়াছাড়ি হয়েছে মারের সঙ্গে ?'

—'গতকাল ভোরে, স্যর।'

—'কোথায় ?'

—'মনে হয়, কানসাসের সীমান্তের কাছে, স্যর।'

—'ঠিক আছে।' ঘাড় নাড়লেন কর্নেল।

খেতে শুরু করলেন কর্নেল, আর ভ্যানেস্ট অপেক্ষা করতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,

ভর রাখতে লাগল এক পা থেকে আর-এক পায়ে। সার্জেন্টটি চলে গেছে, কর্নেল যেন ভুলেই গেলেন তার কথা। চলে যাবার কথাও কেউ বলল না তাকে। সেখানে দাঁড়িয়েই রইল সে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল টেবিলের চারপাশে বসে আছে অফিসাররা। যেভাবে তারা তাকে উপেক্ষা দেখাচ্ছে তাতে বিশ্রী লাগল তার। হঠাৎ বাড়ি ফিরে যাবার জন্য, দেড় হাজার মাইল পেরিয়ে জার্সির প্রত্যন্তদেশে পৌছনোর জন্য আর্তনাদ করে উঠল তার সমগ্র সত্তা। থিয়েটার, বেশ্যাপট্টি, ডজ শহরের টগবগে স্বাদগন্ধময় জীবন—সব-কিছু, ভুলে গেল সে। সৈন্যদল ছেড়ে পালানো ছাড়া অন্য কিছুই আর ভাবতে পারল না ; মনে মনে বলল :

—'আজ রাতে ছুটি পেলে আজই পালাব। পালিয়ে চলে যাব কোনরকমে, চলে যাব পুবমুখো। গরু-ছাগলের গাড়িও পেয়ে যেতে পারি হয়ত।'

এক কোণ থেকে এক ক্যাপ্টেন হঠাৎ উঁচু গলায় বলে উঠল কর্নেলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, 'আমি ভাবছি স্যর—ডজ শহরের হালচাল ঠিক পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

—'তাই নাকি ?'

—'যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, স্যর।' কে একজন বলল।

—'মারে নিশ্চয়ই ওদের ধরতে পেরেছে।' কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। 'নইলে সে এতক্ষণ খবর দিত। এইদিকেই আসছিল ওরা।'

—'তা ঠিক। কিন্তু ধরুন, যদি ওরা এড়িয়ে চলে যায়।'

আবার কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। লোকটা বড়সড়, দীর্ঘসূত্রী, নিম্নপদস্থদের কথা না শোনার মত মেজাজ তাঁর নয়। সায় দিয়ে বললেন, 'বে-সামরিক লোকদের আমি চাই নে এসবের মধ্যে। কিন্তু একটা কোম্পানিকে মেডিসিন লজে পাঠাতে দুটো দিন লেগে যাবে। আর রেল-লাইনের পশ্চিমেও তো ফৌজ রয়েছে।'

—'যদি ওরা অবশ্য ঘোড়সোয়ারদের পাশ কাটিয়ে না যায় তবেই, স্যর।' শক্ত-সমর্থ, গোলমত চোয়ালওয়ালা এক ক্যাপ্টেন বলল সাগ্রহে। 'আমি বরং খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দক্ষিণে নিয়ে যাই আমার কোম্পানিকে। ওদের ঘেরাও করতে না পারলেও অন্তত ওদের আগে গিয়ে পড়তে পারব। এইটেই হবে আমাদের কৃতিত্ব।'

একমত হল সবাই। কর্নেল বললেন, 'পদাতিককে ঘোড়ায় চাপানোটা আমার পছন্দ নয়।'

—'কিন্তু আমরা তো আগে তা করেছি, স্যর। ডজ থেকে ওদের দূরে রাখবেন আপনি। জানেন তো স্বেচ্ছাবাহিনী যদি এগিয়ে যায় তাহলে কি গোলমালটাই না শুরু হবে।'

—'এ সুযোগটা নেওয়া যেতে পারে।' কর্নেল বললেন ধীরে ধীরে। 'যাই হোক না কেন, তুমি হয়তো মিলতে পারতে মারের সঙ্গে। সেও এই চায়, কিন্তু কেন যে চায়

তা ভগবানই জানেন। এখনও তো তার সঙ্গে দুটো কোম্পানি আছে। উত্তরমুখো এখানে যদি না আসে তাহলে তোমাকে কাজ করতে হবে তার অধীনে।'

ভ্যানেস্ট শুনল সবই, কিন্তু কানে গেল না কিছুই। পালানোর চিন্তায় একেবারে বিভোর সে। সিদ্ধান্ত করে ফেলল পালাবে আজ রাতেই, আর তারই ভয়ে যেন হাতুড়ি পেটা শুরু হয়ে গেল তার বুকে।

কর্নেলের কথায় তার সম্বিৎ ফিরল, 'আজ রাতেই ক্যাপ্টেন সেডবার্গের সঙ্গে যাবে তুমি। তিনি পৌঁছে দেবেন তোমাকে তোমার দলে।'

আলামোর 'বারে'র সামনে দাঁড়িয়ে হুইস্কির অর্ডার দিল সাটন আর ম্যাকগ্রাথ। মদ ঢেলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিলতে লাগল ঢকঢক করে, এক একবারের দাম পঞ্চাশ সেণ্ট। পর পর তিনবার নির্জলা গিলে তবে কাটল বমি বমি ভাবটা। তারপর মেজাজ খোস হল দুজনের, খাওয়া শুরু করল লালচে 'চীজ' আর খাস্তা বিস্কুট।

—'খিদে পেয়েছে?' ভালোমানুষের মত জিজ্ঞাসা করল মদওয়ালা। 'কিছু শুয়োরের মাংস আর ডিম দিতে পারি।' লোকটা মোটাসোটা, গড়ানে কাঁধ, টাক মাথাটা সাদা চকচকে, ডিমের মত পালিস করা। 'আর নয়ত, মুরগির ঠাণ্ডা মাংসও দিতে পারি।' আরো বলল, 'ডজ শহরে গো-মাংসের কোন বিশেষত্ব নেই।' জিজ্ঞাসা করল, 'আজই এলেন?'

ঘাড় নাড়ল তারা। আর একবার মদ গিলল দু'জনে, মুখে পুরে দিল আরও বেশি করে খাস্তা বিস্কুট আর 'চীজ'।

—'এখানেই পাবেন সব।' বুঝিয়ে বলল মদওয়ালা।

—'এর চেয়ে অনেক ভাল খাবার দেখা আছে আমার।'

—'তা থাকবে বৈকি, কিন্তু ডজ শহরে নয়।' উত্তর দিল সে। কোল্ড-ওয়াটার থেকে আসা হচ্ছে?'

—'তা দিয়ে তোমার দরকার কি হে?' গরম হয়ে উঠল সাটন।

—'অপরাধ নেবেন না।'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' হাসল ম্যাকগ্রাথ। মেজাজ খোস হতে শুরু করেছে তার। বোতলটা শেষ করে দু'জনে কড়মড়িয়ে খাস্তা বিস্কুট আর চীজ খেতে খেতে খালি করে ফেলল প্লেটখানা। নিচু হয়ে প্লেটখানায় বিস্কুট আর চীজ সাজাতে সাজাতে মদওয়ালা জিজ্ঞাসা করল কাউণ্টারের নিচে থেকেই, 'শুনতে পেলাম, শী-এনরা নাকি আসছে এই পথেই।'

—'আসতে পারে।'

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মুরগির মাংসের কয়েকটা টুকরো দিয়ে দিয়েছি। খেয়ে ফেলুন কর্তা ওরা এসে পৌঁছনোর আগে আগে।'

ভারি গলায় সাটন বলে উঠল, 'লাল-বেজন্মাদের ঠেঙানি দিতে ইচ্ছে করছে আমার।'

আর একটা বোতল রাখল মদওয়ালা 'বারে'র উপর। বোতলটা তুলে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিল ম্যাকগ্রাথ, এগোলো একটা টেবিলের দিকে। মদওয়ালা বলল, 'বিস্কুট আর চীজ এনে দিচ্ছি আরও কিছু।'

চেয়ারে কাত হয়ে ধপাস করে বসে পড়ল সাটন, আবার মদ ঢালল ম্যাকগ্রাথ। ধীর মন্থর নাছোড়বান্দা ভঙ্গিতে মদ গিলতে লাগল সাটন, মাতাল হতে চায় সে, কিন্তু হতে পারছে না সহজে। সে যেখানে খেল দু গেলাস, ম্যাকগ্রাথ খেল এক গেলাস; তারপর শিস দিতে লাগল পিয়ানোর সুরে সুর মিলিয়ে। দরজার দিক থেকে একবারও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না সে, যত লোক ঢুকতে লাগল, চোখ রইল সবার উপর।

আলামোর এক কোণ থেকে আর-এক কোণ পর্যন্ত চলে গেছে 'বার'টা, ছাব্বিশ হাত হবে লম্বায়, গিয়ে মিশেছে একটা ছোট খাড়া মত পিয়ানোর সঙ্গে। একটা ছোট-খাট টাকমাথা লোক দুলছে টুলের উপর বসে; বারবার বাজিয়ে চলেছে একই 'টপ্পা' সুর। সারবাঁধা সরু সরু গেলাসগুলো টুং টাং করছে বাজনার তালে তালে, হাতের কাছেই রয়েছে গাঁজলা-মরা আধ জগ বিয়ার। মেটে রঙের কাঠের গুঁড়োর উপর টেবিলগুলো বসানো, কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো নিচের মেঝের চারপাশে অনেকটা বেড়ার মত। ঘরের শেষ প্রান্তে দুটো দরজা, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়দের কোথায় যেতে হবে তার জানান দিচ্ছে স্পষ্ট করে। দুই দরজার মাঝখান থেকে রং-না-দেওয়া কাঠের সিঁড়িটা কোথায় উঠে গেছে কে জানে।

জন দুয়েক লোক দাঁড়িয়ে 'বারে'র ধারে, আরও দশ-বারজন লোক দু'জায়গায় বসে গেছে তাসের খেলা নিয়ে। একেবারে কোণের দিকে 'রুলেৎ' খেলার চাকা আর ঘুঁটির টেবিল পড়ে আছে রাতের জন্য। আর একটা টেবিলে উলটে ফেলা একটা হুইস্কির গেলাসের তলানির উপরে নেতিয়ে পড়ে আছে ফুলো ফুলো দুখানা হাত, চোখে পড়ে কোঁকড়ানো হলদে চুল আর লাল রঙের গাউন। দম আটকানো অস্বস্তি-কর গন্ধ ঘরের মধ্যে—সে গন্ধ বর্ণনারও বাইরে।

মাতলামি শুরু হল সাটনের; সে বলল, 'দেশটা হবে শাদা-চামড়ার, কিন্তু কাজে তো তা দেখি নে।'

—'ঠিক বলেছ।' সায় দিল ম্যাকগ্রাথ। তাগড়া চেহারা সাটনের, মাতাল হলেই সায় দিয়ে চলে ম্যাকগ্রাথ।

—'বেশ,' বোকার মত হেসে বলল সাটন। 'মাথার ছোলা-চামড়া নিয়ে কি করব জান?'

—'কি করবে?'

—'ঠিক এইখানে, এই কনুইতে সেলাই করে রাখব, ঠিক এই কনুইতে।' বোতলটা তুলে নিয়ে টলতে টলতে চলল সে 'বারে'র দিকে।

পিছনে চলতে চলতে ম্যাকগ্রাথ বলল, 'বস, বস।'

—'দেশটা বিজ্‌বিজ্‌ করছে ইণ্ডিয়ানে—'

—'চল বসবে।'

লম্বা মত বেলে রঙের চুলওয়ালা একটা লোক তাকাল একবার মদওয়ালার দিকে, তারপর হাত ধরল সাটনের, 'মশাই, শুনছেন ?'

সতর্কভাবে ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল সাটন। সরে গেল ম্যাকগ্রাথ, মুখে তখনও লেগে আছে হাসিটুকু। লম্বা লোকটার লাল মুখখানা দাগে দাগে ভর্তি, কথা বলতে লাগল সে চিন্তিতভাবে টেনে টেনে।

—'ওদের কোথায় দেখেছেন আপনারা ?'

—'কাদের ?'

—'শী-এনদের।'

গর্জন করে উঠল সাটন, 'আমি দেখিনি। ওরা আসছে ডজের দিকে।'

—'কি করে জানলেন আপনি ?'

—'কি করে জানলাম !'

অন্য সবাই সরে এসে দাঁড়াল 'বারে'। কাউন্টারের পাশের লোকটা গেলাস মুছতে মুছতে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল সাটনের দিকে। ক্ষুদে টেকো লোকটা ঘুরে বসল টুলের উপর। গেলাসে ঢেলে নিল বিস্বাদ বিয়ার। পিয়ানো থেমে গেল টুংটাং করে। শক্ত-সমর্থ জোয়ান চেহারা, ধোপদুরস্ত একজন লোক, লোহার মত চুল আর গোঁফের রং তার—হয়ত কোন র‍্যাঞ্চ মালিক, কিংবা কোন জুয়াড়ি, নয়ত কোন ইঞ্জিনিয়ার হবে—নিস্পৃহভাবে কতকটা অবজ্ঞাভরেই বলে উঠল, 'যদি ইণ্ডিয়ানদের দেখেই থাকেন, তাহলে বলুন না কেন, মশাই !'

পিয়ানো-বাজিয়ে বিয়ারটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে এগিয়ে এল ভিড়ের কাছে।

—'আমরা একটা সিপাইয়ের সঙ্গে এসেছি।' ম্যাকগ্রাথ বলে উঠল তাড়াতাড়ি। 'সে-ই বলেছে আমাদের।'

—'শী-এন ? কতজন ?'

—'একটা গোটা দল, লুটপাট করতে করতে।' সাটন বলল। গলাটা চড়িয়ে হেঁড়ে গলায় বলল আবার, 'একটা গোটা দল।'

—'কোত্থেকে আসছেন আপনি ?'

—'রীডার থেকে। তার খোঁজে দরকার কি ?'

—'আছে বৈকি।' মাথা নাড়ল জোয়ান লোকটা। একটু একটু করে দুটো নীল চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল সাটনের সর্ব-অবয়ব, ছেঁড়া 'ওভারঅল', ছেঁড়া পুরনো নোংরা নীল সার্ট, তালিব লজ্জা নেই কোথাও, ক্ষুরের সংস্রব ত্যাগ করায় কালো হয়ে উঠেছে ক্ষতবিক্ষত মুখখানা, গড়নটা বেশ বড়সড়, মাথা ভারি।

চোখে চোখে তাকিয়ে লোকটাকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করল সাটন। সঙ্গীর জামার হাতায় টান মারল ম্যাকগ্রাথ। সাটনের চোখের দিকে শান্তভাবে চেয়ে রইল জোয়ান লোকটা। গলা-খোলা বাদামি রঙের জিনের সার্ট গায়ে লালচে মুখ, রোগা-মত

একজন—রেল-অফিসের কেরানী কিংবা টেলিগ্রাফ অপারেটর হবে—সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'কেন খামোখা ইণ্ডিয়ানদের কথা শুনিয়ে ঝামেলা শুরু করেছেন?' তার কণ্ঠস্বরে মৃদু প্রতিবাদের সুর থাকলেও সাটনের মেজাজ খিঁচড়ে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। দুম করে ঘুষি মেরে সটান শুইয়ে দিল তাকে মাটিতে। জোয়ান লোকটা নড়ল না একটুও, দৃষ্টিও সরিয়ে নিল না সাটনের মুখ থেকে। বাদামি রঙের জিনের জামা-পরা লোকটা পড়ে রইল মাটিতে; পিস্তল নেই তার কাছে। পরে হাঁটুতে আর পায়ে ভর দিয়ে সরে এল ভিড়ের বাইরে—একটুখানি।

সাটনের দিকে পিছন ফিরে জোয়ান লোকটা ইচ্ছে করেই এগিয়ে গেল মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার কাছে, দাঁড় করিয়ে দিল তার পায়ের উপর, তারপর তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল মদের আড্ডা ছেড়ে।

—'শী-এনদের খবর আমি কি করে জানলাম—' হাতের মুঠো ঘষতে ঘষতে বলে উঠল সাটন।

—'আমারই ইচ্ছে হচ্ছিল, ধাঁ করে লাগিয়ে দিই একখানা।' মদওয়ালা বলল আগ বাড়িয়ে।

খিকখিক করে হেসে উঠল পিয়ানো-বাজিয়ে, একটা চাপড় মারল তার উরুতে।

বাইরে এসে ঈষৎ কম্পিত হাতে চোয়ালটা ঘষতে ঘষতে লালমুখো লোকটা বলল, 'ধন্যবাদ, মি. ব্লেক।'

—'এই রকম লোচ্চা ঘোড়সোয়ারদের জন্যে জঘন্য হয়ে উঠেছে ডজ শহর। ওদের কাছে চুপচাপ থাকাই ভাল। ওরা থাকে না অবশ্য বেশিদিন।'

—'ইণ্ডিয়ানদের কথা যা বলছিল লোকটা, তা সত্যি। আজ সকালেই খবর এসেছে তারে।'

—'লড়িয়ে দল?'

—'ওই ধরনেরই মনে হয়। যে শী-এনরা চলে এসেছে সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে তারা নাকি যাচ্ছে উত্তরমুখো, কিন্তু কেউ তাদের সম্পর্কে কিছু জানে না। ব্যাপারটা আমি চেপেই রেখেছিলাম। ইণ্ডিয়ানদের কথা শুনলেই ক্ষেপে ওঠে লোকজন।'

—'ঠিক যেমন শিকারের বেলায়।' ব্লেক বলল চিন্তিতভাবে। 'মানুষই তো সবচেয়ে বড় শিকার। আর এদেশে লাল-চামড়া শিকারের মরশুম তো সারা বছরই। যাই হোক, এখন র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়া উচিত আমার—'

—'লোকে বলে তিনশো। তাহলে তো মেলা ইণ্ডিয়ানই।'

—'ওদের পেছনে রক্ষীবাহিনী পাঠালে খারাপ হয় বলে মনে হয় না।' ব্লেক চলল তার র‍্যাঞ্চ, ঘোড়া আর গরু-ভেড়ার কথা ভাবতে ভাবতে, একখানা বাড়ি তৈরি করতেই খরচ পড়েছে ছ'হাজার ডলার। বলল, 'ওরা যাচ্ছে কোন্‌দিকে?'

—'সেইটেই তো আসল কথা। আমি জানি নে তা। এখানে ফৌজ আছে এক রেজিমেণ্ট, এ সব ব্যাপারে নজর রাখবে তারাই।'

—'ডজের অনেক উপকারই তো করল এই রেজিমেণ্ট!'

—'তবু এটাই আইন, মি. ব্লেক। এই আইনেরই যে অভাব আছে আমাদের এখানে একথা আপনি স্বীকার করতে বাধ্য।' চোয়ালটা ঘষতে ঘষতে তিক্ত হাসি হাসল সে। 'কেউ যদি লড়তে জানে তাহলে তো ভালই, কিন্তু যদি না জানে—তাহলে একেবারে না থাকার বদলে যে কোন একটা আইন থাকাই ভাল। ধরুন, ইণ্ডিয়ানদের মারতে শুরু করল ওরা। আপনি যে চোখেই দেখুন না কেন—ওরা উচ্ছৃঙ্খল জনতা ছাড়া আর কি? একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা মিলে একজনকেই ঠেঙিয়ে মারুক, কি একশো অথবা তিনশোজনকেই মারুক, পার্থক্য কোথায় এর মধ্যে?'

—'তারা মারবে তাদের ঘর-সংসার বাঁচাবার জন্যে।' ব্লেক বলল অন্যমনস্কের মত।

—'ডজ শহরে ঘর-সংসার? কিসের ঘর-সংসার?'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্লেক। রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করল দুজনে। খবরের কাগজের অফিসের উল্টো দিকে এসে দাঁড়ালে কি যেন বিড়বিড় করে বলল টেলিগ্রাফ অপারেটর। তারপর চলে গেল সেখান থেকে। তার চলে যাওয়াটা নজরেই এল না ব্লেকের।

শেষ বেলাকার ছায়া ঘনিয়ে আসছে শহরে। লোকজন এসে জড়ো হচ্ছে শহরের বুকে। কেউ চলেছে ঘোড়ার পিঠে একা একা, কেউ বা জোড়ায় জোড়ায়, কেউ বা দল বেঁধে। একদল রেল-মজুর গাদাগাদি করে চলছিল একটা ঠেলাগাড়িতে, হেঁচকা টানে সেটাকে লাইন থেকে নামিয়ে নিয়ে রেখে দিল কেলি'স প্লেসের সামনে। ঝকর ঝকর করা ছোট্ট একটা চ্যাটালো গাড়িতে ফ্রণ্ট স্ট্রীট ধরে আস্তে আস্তে চলেছে একটি সুইডিশ পরিবার চোখ বড় বড় করে। পিয়ানো বাজছে বহু জায়গায়, তাদের শব্দে মনে হয় যেন ছোটখাট একটা কার্নিভাল।

শেরিফের অফিসে ঢুকে পড়ল ব্লেক, অফিসটা কাঠের তক্তা দিয়ে ঘেরা বাক্সের মত, ভাঙা কাঁচের জানলা। শেরিফ ছিলেন অফিসে, ঝিমুচ্ছিলেন চেয়ারে বসে। যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল ইয়ার্প পুরনো একটা নোট-বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাগজের তীক্ষ্মমুখ বর্শা বানাচ্ছিল। একমুঠো সিগার বার করল ব্লেক।

সে সময়ে ডজ শহরের শেরিফ ছিলেন ব্যাট মাস্টারসন। লোকটা শক্ত-সমর্থ, করিৎকর্মা; তাঁর পূর্ববর্তীদের অনেককেই কর্মক্ষেত্রে বন্দুক হাতেই মরতে হয়েছে, এটা ভালভাবে জেনেই কাজ করে যাচ্ছিলেন তিনি। ডজ শহরের শেরিফের পদটা আদৌ লোভনীয় নয়; এটা একটা বিশ্রী ঝুঁকি, একটা আশা—চোর-জোচ্চোরদের দাবড়ে রাখা। ভদ্রলোকেরা এ শহরে নিরাপদে বাস করবে, শহরকে সাফ করে দেবেন, এ ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক শেরিফই দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাট মাস্টারসনই

প্রথম শেরিফ যিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার পক্ষে অনেক দিন বেঁচে থাকার লক্ষণ দেখাচ্ছেন।

ব্লেকের সঙ্গেই ইয়ার্প কথাবার্তা বলে সময় কাটাচ্ছে শুনতে পেয়ে সাড়া দিলেন মাস্টারসন। ঝাঁকুনি দিয়ে সতর্কভাবে চেয়ারখানাকে নামিয়ে দিলেন চার পায়ের উপর; মাথা ঝাঁকালেন তিনি; সিগারটা তুলে নিলেন, কামড়ে ফেলে দিলেন শেষের দিকটা—তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি সতর্ক, সুচিন্তিত। যার বেঁচে থাকাটাই নির্ভর করে সতর্কতার উপর, দিনে রাতে সব সময়ে প্রতিটি কোণ থেকে ওজন করা ভঙ্গুর জিনিসের মত যার জীবন—এই ধীরস্থির হিসাব করা অঙ্গভঙ্গি—সেই মানুষেরই। ব্লেকের দেশলাইতে সিগার ধরাতে নিচু হলেন তিনি; কিন্তু মাথা নাড়ল ইয়ার্প, পাতলা চেহারা ইয়ার্পের, লড়ুয়ে-মোরগের মত সতর্ক সাবধানী ভাবখানা। সব সময়েই পিস্তলটা নাড়াচাড়া করে হাতের আঙুলগুলো, শব্দ ওঠে লোহার সঙ্গে নখ ঘষার।

—'গুণ্ডামি বদমায়েসি কেমন চলছে?'

— শান্ত।'

—'শান্ত থাকা ভাল।'

—'খুবই ভাল।' ইয়ার্প বলল।

মাস্টারসন বললেন, 'বাজারের খবর কি?'

—'বেড়েছে এক ডলার কুড়ি সেণ্ট।'

—'বেশ ভালই তো।'

—'আরও ভাল হতে পারত,' ব্লেক বলল। 'গরু-ছাগলে আজকাল বেশি টাকা আসে না।'

—'তবু তো আসে।' একটা কাগজের বর্শা ছুঁড়ে দিয়ে টেনে টেনে বলল ইয়ার্প। 'শান্তি বজায় রাখতে রাখতে এমন হাঁপিয়ে উঠেছি আমি, কুড়ি ডলার মাস মাইনেতেও মুনিষ খাটতে রাজি।'

—'আমার যদি পরিবার থাকত, ছেলেপুলে থাকত,' অন্যমনস্কের মত ব্লেক বলল, 'টাকার জন্যে রক্তজল করতে হত এখনো আমাকে। যা আছে, তাতেও যখন আগুন লাগবে তখন ওখানেই থাকব, না ডজে আসব ভেবে ঠিক করতে পারছি না।'

—'ইণ্ডিয়ানদের কথা তাহলে তোমারও কানে গেছে।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন শেরিফ।

—'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, আপনারা শুনেছেন কিনা।'

—'শুনেছি নিশ্চয়ই।' ইয়ার্প বলল মৃদু হেসে। 'না শুনে পারার উপায় নেই। শিকারের জন্যে বাইসন কিংবা চোরাকারবারের জন্যে হুইস্কি খুঁজে না পেলে অথবা টাকা চুরি করতে না পারলেই প্রতিটি গুণ্ডা আর ডাকসাইটে লোচ্চা ঘোড়সোয়ার খেলা করতে চায় মাথার চামড়া নিয়ে।'

—'মুখিয়ে আছে লড়াই করার জন্যে,' বিড়বিড় করে বললেন মাস্টারসন।

—'এভাবেও দেখা চলতে পারে ব্যাপারটা।' স্বীকার করল ব্লেক। 'অন্যভাবে দেখতে গেলে, আপনি বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলেন বাড়িখানা চূর্ণবিচূর্ণ, গরু-ভেড়ার পাল ছত্রভঙ্গ, যদি বরাত-জোর থাকে তাহলে হয়ত আপনি বাড়ির বাইরে রয়ে গেছেন।'

—'এখনও তো কোন কিছু পোড়ায়নি তারা।'

—'ওভাবে বাজে যুক্তি দেখিয়ে লাভ কি ?' ব্লেক বলে উঠল।

—'বেশ তো, বেশ তো, কি চাও তুমি ? স্বেচ্ছাবাহিনী নাগরিকদের সশস্ত্র বাহিনী ? কোথায় আছে শী-এনরা ? দেখেছ তাদের ? ঈশ্বরের দিব্যি, আমিও এখনো জানি না পালিয়েছে কতজন, কোন্‌দিকেই বা চলেছে তারা। বাদবাকি সকলের সঙ্গে যেতে পারি আমিও, চিৎকার করতে পারি বন্দুক উঁচিয়ে, মার—কাট হতভাগা ইণ্ডিয়ানদের। কিন্তু কিসের জন্যে ? এর ফল ভাল হতে পারে না কখনো। আমি চেষ্টা করছি শান্তি বজায় রাখতে।'

—'হয়ত অনেকদিনই বজায় রাখতে পারবেন আপনি।'

—'হয়ত পারব। কিন্তু ডজের শান্তি বজায় আমি রাখবই। যথেষ্ট সৈন্য আছে

—'যথেষ্ট ভীরুর দলও আছে এই ডজ শহরেই।' বলে উঠল ব্লেক।

ব্লেকের দিকে তাকিয়ে রইলেন মাস্টারসন। শিস দিয়ে উঠল ইয়ার্প। পরে শান্ত কণ্ঠে মাস্টারসন বললেন, 'তোমাকে তো আমি অনেকদিন থেকেই জানি, ব্লেক।'

তারপর কিছুক্ষণ বসে রইল তারা চুপচাপ।

দরজার সামনে ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ শুনেও নড়ল না কেউ ; হুড়মুড় করে এক ঘোড়সোয়ার ঘরে ঢুকতে একটু ঘাড় ফেরালেন মাস্টারসন। ইয়ার্প বলে উঠল, 'আরে, জিমি যে !' ছেলেটার মুখটা চেনা চেনা মনে হল ব্লেকের।

—'ফুলারদের ওখানে চড়াও হয়েছে ওরা।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ছেলেটি।

—'কেন ?'

—'একটু স্থির হও, জিমি।' ইয়ার্প বলে উঠল।

—'ওই হতভাগা ইণ্ডিয়ানরা।'

মৃদু হাসল ব্লেক। মাস্টারসন বলে উঠলেন তাড়াতাড়ি, 'বস, জিমি। কি সব বলছ মাথামুণ্ডু।'

—'বললাম তো ! চড়াও হয়েছে ফুলারদের উপর। সারাদিন গুলিগোলা চালিয়েছে, ওদের শুদ্ধুই জ্বালিয়ে দিয়েছে সব।'

—'কখন হয়েছে এটা ?'

—'কাল রাতে।'

—'নিজে দেখেছ তুমি ?'

—'না, কিন্তু লেনি র‍্যাণ্ড দেখেছে। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে ও, আমিও তাই। লেনি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল ফুলারদের ওখানে, এমন সময় শুনতে পেল গুলি-

গোলার শব্দ, যেন লড়াই বেধেছে বড়রকম। আর এগোয়নি সে ; কিন্তু ও বলে যে নিশ্চিত হাজারটা বন্দুক হবে। ও দেখেছে আগুন জ্বলছে দূরের আকাশে, মাঠের আগুন দেখতে যেমন।'

—'কোন্ জায়গায় এটা ?' জিজ্ঞাসা করল ব্লেক।

—'মেডিসিন লজ নদীর উজানে।'

—'ফুলারদের বাড়ির দিকেই বটে।' স্বীকার করল ইয়ার্প। 'কিন্তু এগিয়ে দেখল না কেন সে একবারও! বুড়ো পপ ফুলারকে সাবাড় করতে তো লড়াইয়ের দরকার নেই ওদের। ঠিক জান, গুলিগোলার আওয়াজ শুনেছে ও ?'

—'নিশ্চয়ই, ঈশ্বরের দিব্যি।' বলে উঠল ছেলেটি।

ব্লেক বলল, 'কারণ না থাকলেও গুলি চালায় ওরা।'

ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন মাস্টারসন, ডেস্কের কাছে গিয়ে কোমরে বেঁধে নিলেন পিস্তলটা। ইয়ার্পকে বললেন, 'আমি একটু ঘুরব চারধারে। একবার কেল্লায় যাও তুমি। কথা বলে এস চটপট। ক্যাপার দল নির্ঘাত বেরুবে ঘোড়া ছুটিয়ে, একটা কি দুটো ফৌজের কোম্পানি তারা পেতে পারে হয়ত।'

তখনো ঘুষিলাগা চোয়ালটা ঘষছিল টেলিগ্রাফ অপারেটর। খবরের কাগজের অফিসে বসে শুনছিল, সম্পাদক মশাই সোজাসুজি মুদ্রাকরকে সম্পাদকীয় বলে চলেছেন মুখে মুখে। সরকারি কাজ ছাড়াও স্ট্যানলি গারবুর্গ 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র কানসাসের সংবাদদাতা। এ পদটা তার পাকাপাকি নয়, যখনি কোন খবর পায় পাঠিয়ে দেয় কাগজের অফিসে, আশা করে হয়ত কাজে লাগবে খবরটা। যদি খবরটার গুরুত্ব বাড়ে তাহলে অফিস থেকে তার জন্য একজন নিয়মিত সংবাদদাতাকে পাঠানো হয়। তবু তার ছোট ছোট খবরকেই অমূল্য সম্পদ মনে করে সে রেখে দেয় কাগজগুলো।

সম্পাদক এট্‌কিনের ছোট ছোট করে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা গালপাট্টার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবছিল এরই কথা, তার সবচেয়ে বড় সংবাদের কথা ; এই তার শ্রেষ্ঠ সুযোগ ; এই সঙ্গে অবশ্য মনে মনে আশাও করছিল ব্যাপারটা গড়াবে না বেশি দূর। মনে জাগছিল তার টেলিগ্রাফের টরে টক্কাগুলো—ওদের মারফতেই এসেছে ইণ্ডিয়ানদের পালানোর সংবাদ, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের সংবাদ ; ধীরে সুস্থে সমতলের সমস্ত অঞ্চল থেকে জড়ো করে তৈরি করা হচ্ছে এক বেড়াজাল, আপাতদৃষ্টিতে কোন ফাঁক নেই তাতে। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে অতি সামান্যই জানে সে, সমতলের প্রত্যেকেরই যেমন নিজস্ব ধারণা আছে ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে। তবুও এ তার জানা যে অতীতের বস্তু হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই জিনিসটা, চিরকালের জন্য চুকেবুকে গেছে ওদের ব্যাপার। এটা অন্য ধরনের কিছু একটা—

শুনতে লাগল, এট্‌কিন বলে চলেছেন, 'কতকাল—আর কতকাল স্বাধীন আমেরিকানরা এই ভয়াবহ আতঙ্কের ছায়ায় বাস করিবে ? কতকাল আর এই লাল

পদ্রব তাহাদের বাড়িঘর, আত্মীয়-পরিজনকে ভীতির অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিবে? আমরা বলি, অনেক দিনই তো কাটিল! আমরা বলি, আমাদের আত্মীয়-পরিজনকে আর বর্বরতার করাল দংষ্ট্রার খোরাক হইতে দিব না। স্বাধীন মানুষের প্রতি আমাদের আহ্বান, ওঠ, জাগ, ধ্বংস কর উহাদের! আমাদের আহ্বান, ডজ শহরের নাগরিকবৃন্দ, আপনাদের বাসভূমিকে রক্ষা করুন! শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য বন্দুক কাঁধে তুলিয়া লউন! আঘাত করুন উহাদের! এমন আঘাত করুন যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের উপর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পবিত্র ক্রোধ নামিয়া আসিয়াছে! এমন শিক্ষা দান করুন যাহাতে কোনকালেই যেন তাহারা আর সংরক্ষিত এলাকার বাহিরে না আসিতে পারে—'

গারবুর্গ শুনছিল। মুখে তার মৃদু হাসি। গরু-চোর, বাইসন-শিকারী, ডাকাত, হুইস্কি-চোরাকারবারি, টেক্সাসের লোক—সকলের সম্পর্কেই এই একই কথা, একই উত্তেজক ভাষা, একই অভিশাপ বর্ষণ করতে শুনে আসছে সে। এট্কিন কখনো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন না তাঁর সম্পাদকীয়ের। তা যদি করতেন, তাহলে ডজ শহরের ভদ্রলোকেরা পড়ত তাঁর সম্পাদকীয়গুলো। সীমান্তের সংবাদপত্রের সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় না জানতে হলে পূর্বাঞ্চলের সংবাদপত্র এমনিতে পড়ে না কেউ।

বলা শেষ হলে একগাল হেসে পুরনো পাইপ কামড়াতে কামড়াতে টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাছে এসে দাঁড়ালেন এট্কিন। বললেন, 'জানিয়ে দিলাম, হ্যাঁ।'

—'আপনি কি এতই ঘৃণা করেন ইণ্ডিয়ানদের?'

—ঘৃণা করি ওদের? কোনদিন দেখিইনি কোন ইণ্ডিয়ানকে। দো-আঁশলা মিকি ছাড়া কথাই বলিনি আর কারো সঙ্গে। কিন্তু ওরা হচ্ছে প্রগতির প্রতিবন্ধক, ঠিক ডাকাতরা যেমন। প্রগতি কখনো থেমে থাকতে পারে না।'

—'তবু, আমি হলে ছাপতাম না।' গারবুর্গ বলল।

—'কেন?'

—'এমনিই তো অনেক গোলমাল হবে। আর তাকে বাড়াই কেন? ইণ্ডিয়ানরা তো ডজের কাছে আসেনি। অত্যাচারেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত ওদের দেশে, উত্তরে ফিরে যেতেই চায় ওরা। আর কিছুই চায় না।'

—'আর, যে জমির জন্য আমরা লড়েছি, সে জমি ওদের ছেড়ে দিয়ে বলব নাকি, যাও হে তোমরা, নির্বিবাদে চলে যাও।'

—'কেন নয়?'

—'ওহ্!' সম্পাদক মশাই থুথু ফেললেন। 'বেরিয়ে যাও তুমি! কাপুরুষদের নিঃশ্বাসও অসহ্য আমার কাছে। ভাগো এখান থেকে।'

অন্ধকারের মধ্যেই ডজ কেল্লা থেকে বেরুল ফৌজিদলটা ঘাঁটি ছেড়ে। পুব-দক্ষিণে আড়াআড়ি রীভার আর মেডিসিন লজ নদীর দিকে না গিয়ে চলল দক্ষিণে

হুইটম্যানের দিকে। সেডবার্গ মনে মনে ভাবল, রেনো কেল্লার সৈন্যরা শী-এনদের হয় আটকেছে, নয়ত দেখতেই পায়নি একেবারে। ঘোড়সোয়াররা আটকানোর পরও যে ইণ্ডিয়ানরা পালাতে পারে, একথায় মোটেই আমল দিল না সে; অন্যদিকে, যারে যদি ধরতে পারতেন ওদের তাহলে খবর আসত ডজ কেল্লাতে। তাই, এ সম্ভাবনাই বেশি যে রেনো কেল্লার সৈন্যরা একেবারেই দেখা পায়নি ওদের। দেখে শুনে মনে হয়, উত্তরেই গেছে ওরা, তা যদি গিয়ে থাকে তাহলে সান শহরের উত্তরে যে সৈন্যরা রেল-লাইনে টহল দিচ্ছে খোলা গাড়িতে করে, তাদের সঙ্গে আটকাতে পারবে পুব-পাশটা। তা সত্ত্বেও, কোন এক সহজাত সংস্কারের বশেই শী-এনরা অনেকখানি জায়গা পাক দিয়ে চলে যেতে পারে পশ্চিমে, হয়ত মনে মনে ভাবতে পারে, যে অঞ্চলে মানুষের বসতি সবচেয়ে কম, তাদের পালাবার সবচেয়ে ভাল রাস্তা সে দিক দিয়েই। এই পথেই যাওয়া দরকার তার; আর তাই কপাল ঠুকে সেই রাতেই খচ্চরের পিঠে পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে চলল দক্ষিণমুখো। কানসাসের সমস্ত অঞ্চল থেকে সেদিন বিকেলের দিকে ইণ্ডিয়ান আক্রমণের যে-সব গুজব ডজ শহরে ছড়িয়েছে, কোন অর্থই হয় না সেগুলোর; কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না তাদের। দক্ষিণে গেলেই একমাত্র ধরা যেতে পারে ওদের, তাই দক্ষিণেই চলল সে; মনে মনে ইচ্ছে, পুব দিকে ঘুরে যাবে গোল হয়ে, যে পথ দিয়ে মারে গেছেন সেই পথ খুঁজে নেবে পরদিনই।

তার সঙ্গে স্কাউট হিসেবে আছে দো-আঁশলা 'ক্রো' বুড়ো পিটি জেমিসন। কানসাসের দক্ষিণ-পুবের দেশটা তার নখদর্পণে। বাড়তি সাহায্য হিসেবে আছে স্পষ্ট একখানা চাঁদ, আর তারার শ্বেতাভ পরিচ্ছন্ন আলো, এ ধরনের আলো দেখা যায় কেবল উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে, মরুভূমি, আর ধু ধু বিস্তীর্ণ সমতলেই। সৈন্যরা চলল পাশাপাশি, বেশি কথা বলল না কেউ, কিছুটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল খচ্চরের পিঠে, তা সত্ত্বেও এগুতে লাগল সময়মাফিকই। তারা ক্লান্ত হয়নি, কারণ খাওয়ার পর দু' ঘণ্টার বিশ্রাম পেয়েছিল। কিন্তু তবু সারা রাত চলে চলে খচ্চরগুলোর যে হাল হল তা মোটেই আরামদায়ক নয়।

দলটার প্রায় মাথায় মাথায়, সেডবার্গের কয়েক হাত পিছনেই চলছিল ভ্যানেস্ট। আর ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়ল সে, অবসন্ন হয়ে এল তার শরীরের ভিতরটা, আগাগোড়া শিথিল হয়ে এল সমস্ত মাংসপেশী। এখনও পর্যন্ত তার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না যে, ডজ শহরের ফুর্তি এল, আর চলেও গেল এত অল্প সময়ের মধ্যে, আর সে ফিরে চলেছে ইণ্ডিয়ানদের কাছে, নয়ত রেনো কেল্লার লাল-হলদে একঘেয়ে নারকীয় আবেষ্টনীতে।

সে শুনতে লাগল সেডবার্গ কথা বলছে স্কাউটের সঙ্গে। দু'জনের উপরই জেগে উঠল তার ঘৃণা। ঘৃণা জাগল তার ধু-ধু বিস্তৃত এই হতাশ্বাস সমতল দেশের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি জিনিসের উপর। মনে মনে কামনা করতে লাগল, যদি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই হয়, তাহলে সেডবার্গ যেন মরে, সে যেমন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে তেমনি

যন্ত্রণাই যেন ভোগ করে সেডবার্গ। জঘন্য মনে হল তার স্কাউটের কণ্ঠস্বর, ইণ্ডিয়ানদের মত ঝঙ্কারময় স্বরাঘাত দিয়ে স্কাউট বলছিল সেডবার্গকে, 'ওরা লড়ে ভয়ঙ্কর, ঠিক বুনো বেড়ালের মত মনে হচ্ছে, খুঁজে পাব ওদের, সাবধানে এগুতে হবে আমাদের, বুনো বেড়ালের সামনে অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে ইঁদুর এগোয়।'

—'খুঁজে বার কর ওদের।' সেডবার্গ বলল। 'খুঁজে বার কর, তাহলেই হবে। তারপর যা করার আমি ঠিক করব।'

—'ঠিক, ঠিক। কিন্তু, আমার মতে সাবধান হয়ে যাওয়াই ভাল, মি. ক্যাপ্টেন।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল তারা। ঘাসগুলো লম্বা, উঁচু উঁচু, কালো আর ভিজে। খচ্চরগুলোর খুরের আওয়াজে নেকড়ের পাল চেঁচিয়ে উঠতে লাগল উদ্ধত স্পর্ধায়; একবার তারা গিয়ে পড়ল ভয়-পাওয়া একদল বাইসনের ভিড়ের মধ্যে। ইতিমধ্যেই কাঁটা-তারের বেড়ায় বেড়ায় ভাগ হয়ে গিয়েছে সমতলের দেশ; তাদের পাশ দিয়ে দিয়ে চলতে লাগল তারা। প্রায়ই চোখে পড়তে লাগল খড়খড়ি-বন্ধ রাঞ্চ আর গোলাবাড়ির কালো কালো মূর্তি। কখনো বা কানে আসতে লাগল ঘোড়ার ডাক, আর খোঁয়াড়ে আটকানো গরু-ভেড়ার গুঁতোগুঁতির আওয়াজ। একবার একটা পাহাড়ের উপরে উঠতেই দেখতে পেল নিচের দিকে একটা মাংস-ঝলসানোর অগ্নিকুণ্ডের করুণ আভা; কাঠের টুকরোর মত ছড়িয়ে পড়ে আছে 'কাউবয়'দের মূর্তিগুলো, ঠিক যেন চাকায় লাগানো পাখির মত। দুদিকে প্রায় পাঁচশো গজ ধরে ছড়িয়ে টহলদাররা এগিয়ে চললেও চোখে পড়ল না কোন-কিছুই, ইণ্ডিয়ানদের ভালো-মন্দ কোন চিহ্নই না; কোন রাঞ্চ-বাড়িও পুড়ছে না, শখানেক অগ্নিকুণ্ডের হদিস দেবার মত আকাশেও ঝলসে উঠছে না আগুনের কোন আভা।

গড়িয়ে চলল রাত। জিনের উপরই ঝিমুতে ঝিমুতে চলল সৈন্যরা, ঝুঁকে পড়ল মাথাগুলো, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে ফুটে উঠতে লাগল বিরক্তির চিহ্ন; এ ছাড়া সব চুপচাপ, রাতের মত গাঢ় নিস্তব্ধ—শুধু ঘোড়ার খুরের একটানা খট্ খট্ শব্দে ভেঙে যেতে লাগল নিস্তব্ধতা। এভাবেই এগিয়ে চলতে চলতে এক সময় দোয়াতের কালির মত কালো হয়ে এল আকাশের কালচে নীল রং; তার ওপর রং বদলে দেখা দিল অনুজ্জ্বল, একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন ভোরের ধূসর আভা।

—'মনে হচ্ছে, কোনই লাভ হবে না।' বলে উঠল জেমিসন। তারপর মুহূর্ত পরেই লাগাম টেনে ধরল ঘোড়ার। দাঁড়িয়ে উঠল রেকাবের উপর, কানের পাশে দু হাত রেখে শুনতে চেষ্টা করল কিছু যেন। সবাইকে থামাবার জন্য হাত উঁচু করল সেডবার্গ; দুটো টহলদার দলই অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াল গোল হয়ে।

—'ভারি মজার শব্দ শুনতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে।' এধার ওধার মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে একগাল হেসে স্কাউট বলল, 'মনে হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি কিছু একটা।'

—'কি শুনতে পাচ্ছ?'

—'বলতে পারব না—হয়ত কিছুই না। হয়ত ঘোড়ায় চড়ে চলেছে অনেক লোক।'

—'কোথায়?'

সামনের দিকে দেখিয়ে দিল স্কাউট। কান খাড়া করল সেডবার্গ শুনবার জন্য ঘোড়াগুলো ডেকে উঠল বিচলিত হয়ে, ঘুমের চটকা ভেঙে ফেলে হিম-শীতল রাইফেল-গুলো মুঠো করে চেপে ধরল সৈন্যরা, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তৃণ-প্রান্তরের ভোর-বেলাকার হিমে। তারপরই শোনা গেল স্পষ্ট, আগের মুহূর্তেও কিছু শুনতে না পারলেও পরমুহূর্তেই বুঝতে পারা গেল সেটা—বহু দূরে যেন চাপা শব্দে দামামা বাজছে গুড় গুড় করে।

—'বেশি দূরে নয় ওরা।' জেমিসন বলল।

—'কতজন হবে বলে মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্কাউট। 'বোধ হয় শ দুয়েক, তার বেশিও হতে পারে।'

সেডবার্গ ভাবল মনে মনে, ওরা ইণ্ডিয়ানও হতে পারে, মারে আর তাঁর লোকজনও হতে পারেন।' পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সৈন্যদের দিকে, গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ওরা, সারা রাত চলে চলে অবস্থা হয়েছে শোচনীয়, বন্দুক ধরে রেখেছে হাতের মুঠোয়, গরু-ভেড়ার মত ধাক্কা-ধাক্কি করছে ওদের খচ্চরগুলো, থামাতে পারছে না কেউ। লক্ষ্যের মুখোমুখি এসে ঠিক কি করা উচিত ভেবে পেল না সে। পদাতিক বাহিনীর অফিসার সে, তাই প্রথমেই মনে এল সৈন্যদের খচ্চর থেকে নামিয়ে আক্রমণের জন্য লাইন বাঁধতে বলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। কিন্তু তাহলে ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে—যদি ওরা ইণ্ডিয়ানই হয়—খুবই সহজ হবে ওদের এড়িয়ে যাওয়া। তাই অপেক্ষা করতে লাগল।

গুঁড়িসুড়ি মেরে তার বিরাট পাঁশুটে রঙের ঘোড়ার পিঠে বসে বসে ভ্যানেস্ট ঘষছিল অসাড় উরু দুটো। তাকিয়ে দেখল, ইণ্ডিয়ানরা বেরিয়ে এল ভোরের কুয়াশার মধ্যে থেকে, নেমে এল ছোট একটা পাহাড়ের গা বেয়ে, সৈন্যদের কাছ থেকে প্রায় দুশো হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল থমকে। আর সেই মুহূর্তেই সে বুঝে নিল যে হেরে গেছেন মারে, হেরে গেছে সে নিজেও। অন্যত্র কোথাও নিরাপদে রয়ে গেল তার সঙ্গী-সাথীরা, আর সে এখানে একা একা ইণ্ডিয়ানদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—যেন এক নির্মম প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাগ্য তার সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করল অবশেষে।

—'হায় ভগবান!' ফিসফিস করে বলল স্কাউট। 'ভাবছি, আমরা ওদের ধরলাম, না ওরাই ধরল আমাদের।'

সেডবার্গ হাত নাড়াতেই সামনের দিকে এগিয়ে চলল খচ্চরগুলো। নিঃশব্দ, নিষ্কম্প ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ইণ্ডিয়ানরা, পরক্ষণেই জলের স্রোতের মত অনায়াস স্বচ্ছন্দগতিতে সরে যেতে লাগল তাদের অর্ধেকেরও বেশি।

—'ওই দিকে, ওই দিকে।' চেঁচিয়ে উঠল সেডবার্গ। 'বিউগিলার, নিকুচি করি তোমার, বিউগিল বাজাও।'

বিউগিলের আওয়াজ যেন একই কামনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলল মানুষ আর পশুদের। ছুটতে শুরু করল খচ্চরগুলো। স্কাউট কিন্তু রেকাবের উপর দাঁড়িয়ে উঠে টেনে ধরল সেডবার্গের হাত। বাধা দিয়ে বলল, 'ওরা সব মেয়েছেলে মি. ক্যাপ্টেন—পাগলের মত ছুটছেন মেয়েগুলোর পিছনে, ছেড়ে যাচ্ছেন যে কুকুর-সেনাদের, ওরা আক্রমণ করবে পেছন থেকে।'

এখন সব বুঝতে পারল সেডবার্গ। নারী আর শিশুরা সরে যাচ্ছে দক্ষিণ-পুবে, যেদিক থেকে ওরা এসেছে সেদিকেই। পুরুষেরা, আর যোদ্ধারা ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠে চড়ে গোল হয়ে সার্কাসের ভাঁড়ের মত ঘুরছে পাশ থেকে আক্রমণ করার জন্য। প্রাণপণে চেষ্টা করল সে সৈন্যদের ঘুরিয়ে নিতে; বে-কায়দায় পড়ে খচ্চরগুলো ধাক্কাধাক্কি শুরু করতেই চিৎকার করে হুকুম দিল থামতে।

তখন আকাশে দেখা দিয়েছে সূর্যোদয়ের গোলাপি আভা। নারী-শিশুরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওই দিকে, ঢাকা পড়ে মিলিয়ে গেল কুয়াশার আস্তরণে, আর, পরিবার-পরিজন নিরাপদ হয়েছে বুঝতে পেরে সৈন্যদের সামনে দিয়ে পুরুষেরা ঘুরতে শুরু করল উদ্ধত ভঙ্গিতে। তখনও পর্যন্ত গুলি ছোঁড়া হয়নি একটিও। যে-কোন ধরনের আক্রমণে খচ্চরগুলোকে এগিয়ে দিতে গিয়ে হতাশ হয়ে সেডবার্গ সৈন্যদের হুকুম দিল মাটিতে নেমে গুলি চালাতে। পাক খেয়ে খেয়ে নেচে ফিরতে লাগল ইণ্ডিয়ানরা।

আড়ষ্টভাবে খচ্চরের পিঠ থেকে নামল সৈন্যরা। ক্লান্ত একগুঁয়ে জানোয়ারগুলোকে অকথ্য শাপমন্যি করতে করতে ঝোলা-লাগাম ধরে টেনে আনতে লাগল ফাঁকায়; গুলি চালাবার জায়গা হবে ওতে; ভ্যানেস্ট বসে রইল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়সোয়ার হিসাবে সে জানে ভালভাবেই, হাস্যকর গোটা কৌশলটাই, প্রায় আত্মহত্যার সামিল। একমাত্র সে-ই বুঝতে পারল ঝাঁক বেঁধে আক্রমণ শুরু করল শী-এনরা, খচ্চরের সঙ্গেই ধস্তাধস্তিতে ব্যস্ত তখনো সৈন্যরা।

দেখতে পেল, জাপানি-পাখার মত গোল হয়ে ছড়িয়ে গেল শী-এনরা। ঝড়ের আগে যেমন করে ছোটে শিমুলতুলো, তেমনিভাবেই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদের উপর; চিৎকার করে, আওয়াজ তুলে, খচ্চরগুলোকে মাড়িয়ে, পিষে, ভিতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে একেবারে এলোমেলো করে দিয়ে গেল বিপর্যস্ত গোটা কোম্পানিকে। গুলি চালাতে লাগল সৈন্যরা, কিন্তু সেই ঘুরপাক-খাওয়া নৃত্যপর ঘোড়সোয়ারদের গুলি করা বুনো পায়রার ডানায় গুলি করারই সামিল। বেশি গুলি চালাল না ইণ্ডিয়ানরা। তাদের এলোমেলো দু'চারটে গুলিতেই সৈন্যরা মরার চাইতে খচ্চর-গুলোর লম্ফঝম্পই শুরু হল বেশি। ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়া ছুটিয়ে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। আর সৈন্যরা টানাহেঁচড়া করতে লাগল খচ্চরগুলোকে নিয়ে, উঠতে লাগল মাটি থেকে, অকারণ গুলি ছুঁড়তে লাগল শী-এনদের লক্ষ্য করে, শাপমন্যি করতে লাগল, আর লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতরে নিজের নিজের বন্দুক হাতড়াতে লাগল।

ভ্যানেস্টও চলে গেল কিন্তু। তার বিরাট পাঁশুটে রঙের ঘোড়াটা ছুট মেরেছিল আক্রমণের মুখে, আর ইণ্ডিয়ানদের সামনে পড়ে ঘোড়ার পেটেও রেকাব ঠুকে দিয়েছিল সে। মাথা ঘুরতে লাগল তার, পিঠ জুড়ে ছুরি বেঁধার মত বেদনা, কাঁধের নিচে বিঁধেছে একটা গুলি, তাক-না-করা এলোমেলো ছোঁড়া কোন সৈন্যের গুলি। মনে জেগে রইল তার একটি কথাই—সব শেষ হয়ে গেছে তার, সে চলেছে পালিয়ে, আজ সে বাড়িতে যাবে, ফিরবে না একবারও, একবারও থামাবে না তার ঘোড়া, ঘরে সে যাবেই।

সেভাবেই পাগলের মত ঘোড়া ছুটিয়ে চলল সে ইণ্ডিয়ানদের সামনে দিয়ে। তারপর, ইণ্ডিয়ানরা পুবদিকে তাদের নারী আর শিশুদের কাছে ফিরলে, ছাড়িয়ে গেল তাদেরও। একা একা ছুটে চলল ভ্যানেস্ট; বেগ কমিয়ে কিছুক্ষণ কদমে চলল পাঁশুটে রঙের বিরাট ঘোড়াটা, তারপর শুরু করল হাঁটতে, অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়ল একে-বারে। আর জিন থেকে ঝুলতে লাগল ভ্যানেস্ট, সবুজ শ্যামল উষ্ণ জার্সির প্রত্যন্ত প্রদেশের স্মৃতিগুলো স্পষ্ট জেগে রইল তার মনে। কেশর আঁকড়ে-ধরা আঙুলগুলো যখন আলগা হয়ে এল শরীরের ভারে, তখনও স্পষ্ট জেগে রইল সে স্মৃতি। তৃণ-প্রান্তরের মাথার উপরে উজ্জ্বল দেবদূতের মত সূর্য উঠে পড়লেও তার চোখে ঘনিয়ে এল রাতের অন্ধকার। আর, তারপর হাঁটতে শুরু করল পাঁশুটে রঙের বিরাট ঘোড়াটা, লম্বা ঘাসের ভিতরে ভ্যানেস্টের দেহটা হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে শুরু করল ঘাস খাওয়া, ভ্যানেস্টের একটা পা আটকে রইল রেকাবে।

ডজ শহরের লেডি গে থিয়েটারে অর্ধেক অনুষ্ঠান তখন শেষ হয়েছে, এমন সময় পর্দার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এসে দাঁড়াল সূত্রধার ফ্রাঙ্ক হেনিক, নমস্কার করল দর্শকদের। টিনের তৈরি 'ফুটলাইট'গুলোয় জ্বলছে হাজারটা মোমবাতি, তারই সামনে এসে দাঁড়াল সে। চোখে-মুখে ফুটে উঠল নিরীহ গো-বেচারি ভাব। হাত দুটো চেপে ধরে সে বলতে লাগল:

—'ডজ শহরের নাগরিকবৃন্দ, মার্কিন ভ্রাতৃবৃন্দ, রঙ্গরসের উদ্দেশ্যে আজ আপনাদের সম্বোধন করছি না আমি। রঙ্গরসের একটা সময় আছে, আর যখন লেডি গে থিয়েটারে প্রবেশমূল্য দিয়েছেন, তখন আপনারা যে রঙ্গরসের আশা করবেন তাতে অন্যায় কিছু নেই, সবচেয়ে ভাল রঙ্গরস, নাচ আর গানের আনন্দ অবশ্যই আশা করবেন আপনারা। কিন্তু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও একটা সময় আছে, আমি আজ সেই সময়ের কথাই বলতে উঠেছি। আমি যার কথা বলছি, তা হচ্ছে এক লাল-উপদ্রব—ক্যানসাসের উপর দিয়ে ভরাবহ তৃণ-প্রান্তরের অগ্নিকাণ্ডের মত ছড়িয়ে পড়েছে এই উপদ্রব। আমি বলতে উঠেছি এক লাল-বর্বরের কথা, সে শুধু আগুন জ্বালায়, খুন করে আর ধ্বংস করে। আমি বলতে উঠেছি সেই সব বীর-পুরুষদের কথা, 'ব্যারিকেড' করা ঘরের মধ্যে বসে আছে যারা গুঁড়ি মেরে, পাশেই নারী আর শিশুরা প্রার্থনা

করছে হাঁটু গেড়ে, যে ভয়ঙ্কর বর্বর তাদের প্রিয়-পরিজনদের ধ্বংস করতে চায় তাকেই বাধা দেবার জন্যে গুলি ছুঁড়ে চলেছে জানলা দিয়ে। ডজ শহরের নাগরিকবৃন্দ, আপনারা কি বসে থাকতে পারেন? তাদের যন্ত্রণার কিছুমাত্র অনুভব করেন না আপনারা? আপনাদের পবিত্র অন্তরে কি জেগে ওঠে না ক্রোধ আর আতঙ্ক? বর্বরতার হৃদয়হীন দানবকে আঘাত করবার জন্য ছুটে যেতে, বন্দুক কাঁধে তুলে নিতে কোন ইচ্ছেই কি হয় না আপনাদের? সে দানব জানে না প্রেম কি, খ্রীস্টধর্ম কাকে বলে; সে শুধু জানে মাথার চামড়া ছুলে নিতে, যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মানুষকে খুন করতে। তাই আপনারা কি করে ভুলতে পারেন সেই সব বীরপুরুষদের, কয়েক বছর আগেও যারা প্রাণ দিয়েছে জেনারেল কাস্টারের অধীনে; কেবল তারাই নয়—ফুলার, ক্ল্যানসি, লোগানদের মত অন্যান্য আরও সব সাহসী নরনারীদের, যারা পড়ে আছে মাথার চামড়া ছোলা রক্তাক্ত দেহে। রঙ্গরস বিতরণের জন্যে মাইনে-করা লোক আমি, আপনাদের মত পাকা যোদ্ধাদের কাছে আমার কথা হয়ত কিছুই নয়। কিন্তু আমি জানি, যদি আপনারা কেউ আমাকে ধার দেন একটা বন্দুক আর একটা ঘোড়া, সর্বপ্রথম আমিই যাব সবার আগে আগে। ভদ্রমহোদয়গণ, মহিলাবৃন্দ, আমার কথা আপনারা দয়া করে শুনেছেন, ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার জন্য।'

সমর-সঙ্গীত বাজাতে চেষ্টা করল অর্কেস্ট্রা। কিন্তু পাগলের মত জয়ধ্বনি তুলে দর্শকেরা ডুবিয়ে দিল বাজনার আওয়াজ। বারবার মাথা নোয়াতে লাগল ফ্রাঙ্ক হেনিক; কিন্তু দর্শকদের শান্ত করে অনুষ্ঠান চালানো আর সম্ভব নয়। স্টেজের কাছাকাছি যারা ছিল, তারা খুলে নিল জ্বলন্ত 'ফুটলাইট'গুলো; আর যে সার্থক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, তারই ধাক্কায় পড়ে হেনিক চলল মশাল-শোভাযাত্রার আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে। লেডি গে থিয়েটার ছেড়ে, ফ্রন্ট স্ট্রীট পেরিয়ে এসে দাঁড়াল লং ব্রাঞ্চ সেলুনে। ততক্ষণে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ডজ শহরের অলিতে গলিতে। মেয়ে-পুরুষের দল ছুটল লং ব্রাঞ্চ সেলুনে, গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে, চেঁচিয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে, হল্লা করে ডাকতে লাগল ব্যাট মাস্টারসনকে।

মাস্টারসন উঠলেন 'বারে'র উপরে, চেঁচিয়ে বললেন, 'চুপ কর, চুপ কর একটু।'

—'ঠিক বলেছ ব্যাট, আমরা আছি তোমার সঙ্গে।' চেঁচিয়ে উঠল তারা।

—'বেশ তো! তোমরা ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়তে কোমর বেঁধেছ দেখছি। বুঝতে পারি হয়ত তা। ওরা কানসাস চষে বেড়াচ্ছে এই খবরই তোমরা পাচ্ছ, তাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছ স্বভাবতই। কিন্তু এটা ছেষট্টি সালও নয়, আটষট্টি সালও নয়; শেষ হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই। একটা দল যদি ছাড়া পেয়ে লুটপাট করতে থাকে; সৈন্যরাই ব্যবস্থা করতে পারবে তাদের।'

(সখের সৈনিকদের মুর্দাবাদ জানাতে শিস আর বেড়ালের ডাক।)

—'বেশ তো, সৈন্যদের হয়ত তোমরা পছন্দ না-ও করতে পার—কিন্তু তারাই তো আইন!'

—'তুমিই আইন, ব্যাট। পাঠাও আমাদের!'

—'চুপ কর একটু! মাথা-গরম একদল নাগরিক দঙ্গল বেঁধে যাবে, আর যাকে দেখবে তাকেই গুলি করবে, এ চাই না আমি। যদি তোমরা মনস্থও করে থাক, তাহলেও কাজটা করতে হবে ভালভাবে, করতে হবে আমার কথামত। নয়ত বলে রাখছি, অনেকেরই ভবলীলা সাঙ্গ হবে।'

—'ঠিক বলেছ। পাঠাও আমাদের!'

—'বেশ, ইণ্ডিয়ানদের সন্ধানেই বেরুবে তোমরা। কিন্তু আজ রাতেই যেতে পার না। তার কারণ, প্রথমত, অন্ধকারে যদি গুলি চালাতে হয় তাহলে ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে বেশি মরবে তোমাদেরই লোক; দ্বিতীয়ত, ইণ্ডিয়ানরা আছে কোথায় তা জান না কেউ। খবর যা পাচ্ছি, তাতে রাজ্যের প্রায় বিশটা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে তারা। যতক্ষণ না সন্ধান পাচ্ছি তাদের, অপেক্ষা করতে হবে ততক্ষণ। আজ রাতেই কেল্লা থেকে খচ্চরে চড়ে এক কোম্পানি সৈন্য গেছে ওদের খুঁজে বার করতে। যতক্ষণ কেল্লা থেকে কোন খবর না পাচ্ছি ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাবাহিনীর জন্যে একটা নাগরিক কমিটি করতে হবে। কাল সকালে—তখনো যদি ইচ্ছে থাকে তোমাদের—কথা দিচ্ছি আমি, তোমাদের নিয়ে যাব।'

উল্লাস-চিৎকারের মধ্যে দিয়ে মাস্টারসন নামলেন 'বার' থেকে। সে চিৎকারের মধ্যে মৃদু আপত্তিও শোনা গেল তখন তখনই যেতে রাজি শুধু এমন দু'চারজনের। বেশির ভাগই কিন্তু আশ্বস্ত হল এই জেনে যে সকালের আগে পাকাপাকি হবে না কোন-কিছুই। লং ব্রাঞ্চের ভিড় পাতলা হয়ে জমল গিয়ে আলামো আর কেলি'স প্লেসে। টেকসাসের গরু-ভেড়ার কারবারী একসারে তিন বার করে মদ সাজিয়ে দিল ইণ্ডিয়ানদের উদ্দেশে ঘৃণা প্রকাশ করে—এমন ঘৃণা প্রকাশ করতে কেবল টেকসাসের লোকেরাই পারে। দু-বার করে মদ সাজাল জুয়াড়ি রাউডি কেস। শুরু হল নাচ। তাসের খেলা শুরু হল কয়েক জায়গায়। পিছনের ঘরে উঠে গিয়ে বসল নাগরিক কমিটি, নাম লিখতে শুরু করল স্বেচ্ছাবাহিনীর।

অধৈর্য, অস্থির, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল স্বেচ্ছাবাহিনী। আগের দিন রাতে প্রায় ছিল তিনশোজন, সকালে কমে গিয়ে দাঁড়াল শ'খানেকেরও নিচে। চেহারাটাও গেল পালটে। ছোট চাষী, ছোট রাঞ্চ-মালিক, ছেলেপুলের বাপ যারা, তারা সরে পড়ল। দশ ঘণ্টার মধ্যেই এই ব্যাপার; কয়েক গেলাস মদ টেনে, দু'চারটে বক্তৃতা শুনে, আর দশজনের সঙ্গে মিলে দেশের মাটি থেকে নরাধমদের উচ্ছেদ করতে যাওয়া এক কথা, আর সকালের স্পষ্ট আলোয় ইচ্ছে করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া, সে অন্য ব্যাপার। তার চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি ফিরে গিয়ে খামারের ফসল-টসল তুলে রেখে, জানলার খড়খড়ি বন্ধ করে ঘরে বসে থাকা। তখনও যদি ইণ্ডিয়ানরা আসতে চায়, তাহলে না হয় লড়াই করা যেতে পারে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে।

অপর কারণ হল বুড়ো পপ ফুলারের আবির্ভাব। গুজব যা রটেছিল সেইমত না মরে হাজির হল একেবারে জলজ্যান্ত মানুষটি; হাতে সার্প্স রাইফেল, নিজের হাতেই গোটাকয়েক শী-এনকে ধরাশায়ী করবার জন্য পাগল সে। যে-লড়াইতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে রটেছে, তার কথা যখন জিজ্ঞাসা করা হল, তখন সে সায় দিয়ে বলল যে, মেডিসিন লজ নদীর কাছাকাছি কোথাও লড়াই হয়েছিল বটে শী-এন আর সৈন্যদের মধ্যে। এ ছাড়া আর কিছুই জানে না সে, শুধু জানে যে শী-এনরা এগুচ্ছে ডজের দিকে। তাই সে এসে হাজির হয়েছে এখানে।

এতেই ঘুরে গেল ব্যাপারটা। যদি পপ না মারা গিয়ে থাকে, তাহলে আরও যে দশ-বারজনের মরার খবর রটেছিল হয়ত সেগুলোও একেবারেই মিথ্যে। আরও লোক চলে গেল দল ছেড়ে। তখন একদল টেকসাসের লোক খুঁজে বার করল দো-আঁশলা মিকিকে; হাবা-গোবা, নিরীহ পিউটি-ইণ্ডিয়ান সে, লুকিয়েছিল ব্রিগস জেনারেল স্টোরের কাউণ্টারের নিচে। এক পিউটি রমণীর প্রতি এক হুইস্কি-কারবারীর হঠাৎ-জাগা কামনার ফলেই মিকির জন্ম। পৃথিবীতে সে এসেছে একটা ট্যারাবাঁকা মাথা, আর আজব ধরনের কৃতার্থ-করা একগাল হাসি নিয়ে। একেবারে গো-বেচারা সে, খরগোসের মতো শান্ত, আঁতকে ওঠে কুকুর দেখলেই। পচাগন্ধ বাইসনের চামড়া ঘষা থেকে চাকর-বাকরদের ঘরদোর পরিষ্কার করা—যে কোন কাজ করতেই সে রাজি। আকারে-প্রকারে সে শী-এনদের থেকে শাদা মানুষের মতই পৃথক, এমন কি তার চেয়েও বেশি; শুধু তাই নয় কাঁথা-জড়ানো ইণ্ডিয়ানদের ভয় পায় সে, তাদের এড়িয়ে চলে সব সময়।

তাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এল তখন টেকসানরা। মালগুদাম থেকে চুরি-করা ক্রিয়োজাট মাখিয়ে দিল সারা গায়ে; আর শাদা মানুষ হলে যেভাবে পুড়িয়ে মারত তা না করে অবজ্ঞাভরে এক পা বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রাখল টেলিগ্রাফের খুঁটির সঙ্গে। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ফ্রণ্ট স্ট্রীট ধরে, পিস্তলের আওয়াজ করল বারকয়েক, তারপর সরে পড়ল সেখান থেকে। তখন স্বেচ্ছাবাহিনীর বাদবাকি সকলের চেয়ে একটু সাহসী জনকয়েক লোক একটা মই যোগাড় করে দড়ি কেটে নামাল মিকিকে। আধমরা হয়ে গেছে সে, অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছে ট্যারাবাঁকা মাথায় রক্ত উঠে। সেখানেই শুয়ে রইল সে, হাসতে চেষ্টা করল একটু। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন ব্যাট মাস্টারসন—অনেক দেরি করে ফেলেছেন তিনি। বহুকাল ধরে জানেন তিনি মিকিকে, এসেই তর্জন-গর্জন শুরু করলেন, দিব্যি করলেন ভগবানের নামে, দেখামাত্রই খুন করবেন তিনি টেকসানদের। কিন্তু যতই লম্ফঝম্ফ করুন না কেন, টেকসানরা চেনে মাস্টারসনকে, কেটে পড়ল তারা শহর থেকে, কেউ কেউ চেষ্টা করতে লাগল শেরিফকে ঠাণ্ডা করতে।

এতেই আরও লোক খসে পড়ল বাহিনী থেকে। সমস্ত কিছুর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মাস্টারসনের অফিসে ফিরে এসে ইয়ার্প মন দিল ফলক বানাতে। শেরিফ বললেন যে,

যদি ওরা এখনো বাইরে যাবার জন্য জিদ ধরে তাহলে তাঁকে অন্তত যেতে হবে সঙ্গে। দেখতে হবে ওরা নিজেরাই না মারামারি করে মরে।

এভাবে গড়িয়ে গেল সকালটাও। দলটা কমতে কমতে এসে দাঁড়াল জনা কয়েকে; একদল লোচ্চা-ঘোড়সোয়ার,—ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করার অথবা মাথার চামড়া কোটের কলারে সেলাই করে জাঁক দেখাবার সুযোগ পাবে তারা; রগচটা, ঝগড়াটে ছোকরা গোছের টেকসাসের ঘোড়সোয়ার, অর্থপিশাচ জুয়াড়ি, তাসের জুয়াড়ি, আর জনকয়েক মদের দোকানের কর্মচারী--সেলুনে ভিতর মদ খেয়ে মারামারির সময় গুলির হাত থেকে মাথা বাঁচাতে হদ্দ হয়ে গেছে তারা, এখন চায় নিজেরাই দু'চারটে গুলিগোলা চালাতে। মুদির দোকানের জনকয়েক কর্মচারীও রইল দলে, ব্যাপারটা তাদের কাছে মনে হল বেশ মজাদার, রোমাঞ্চকর অভিযান, দুটো বোকাসোকা ইংরেজ ছেলে, দুই ভাই, তারা বনভোজনের মত ফুর্তির ব্যাপার ঠাউরে নিয়েছে গোটা জিনিসটাকে; শেরিফ আর চারজন নিয়মিত প্রতিনিধি, একজন টেলিগ্রাফ অপারেটর —কাগজের জন্য খবর পাঠাবার ইচ্ছে তার; আর সর্বশেষ জনা-ছয়েক গরু-ভেড়ার কারবারী—ঘাসের জমি থেকে ইণ্ডিয়ানদের তাড়াতে সাহায্য যাতে হয়, তার জন্য যে-কোন কিছুতেই তারা রাজি।

অন্য সবাই—ছোট চাষী, রাঞ্চ-মালিক, রেলের আর স্টকইয়ার্ডের মজুর, উকিল, ডাক্তার আর ব্যবসায়ীরা সরে পড়ল। যারা রইল, তারা হয়ে উঠল অধৈর্য, ব্যস্ত হয়ে উঠল নিজেদের কাজের সাফাই দেবার জন্য। হুড়োহুড়ি শুরু করল তারা আলামোর সামনে দাঁড়িয়ে, ঘোড়ার পিঠে উঠতে লাগল, নামতে লাগল ঘোড়া থেকে, বন্দুক খুলতে লাগল, গুনতে লাগল কার্তুজগুলো, চিৎকার করে ডাকতে লাগল মাস্টারসনকে, তাঁকেই নিয়ে যেতে হবে ওদের, খুঁজে বার করতে হবে ইণ্ডিয়ানদের।

দলটি যদি যাবার জন্য জিদ ধরেই থাকে, তাহলে কিছু সৈন্য সঙ্গে থাকলে সবচেয়ে ভাল হবে, এই কথা ভাবার পরেই মাস্টারসন খবর পাঠিয়েছিলেন ডজ কেল্লায়। উত্তর যা পেলেন কার্যত তা প্রত্যাখ্যানই; বাড়তি সৈন্য হাতে নেই কর্নেলের। উত্তরের সঙ্গেই জানিয়ে দেওয়া হল, গত রাতেই এক কোম্পানি অশ্বারোহী-পদাতিক রওনা হয়ে গেছে শী-এনদের খোঁজে, আরও দুটো কোম্পানি খোলাগাড়িতে টহল দিচ্ছে রেল-লাইনে, আর চতুর্থ এক কোম্পানিকে পাঠানো হয়েছে খোদ ডজ শহরেরই আশ-পাশ আগালাতে। ডজ কেল্লাতেও মজুদ রাখতে হবে ফৌজ। নাগরিকেরা যদি শী-এনদের খোঁজে বেরুবার জন্য জিদ ধরে তাহলে নিজেদের দায়িত্বেই যেতে হবে তাদের।

'এই হচ্ছে শালা খচ্চর ফৌজ,' মাস্টারসন বললেন মনে মনে। ফৌজকে ঘৃণা করেন বলে নয়—এই উচ্ছৃঙ্খল জনতা, এই স্বেচ্ছাবাহিনী, ইণ্ডিয়ানদের হত্যা করার এই নির্বোধ সামগ্রিক উন্মত্ততার জন্য দায়ী হতে হবে একা তাঁকে। এই জন্যই বললেন তিনি রাগের মাথায়। নটা থেকে দশটা, দশটা থেকে এগারটা পর্যন্ত এটা ওটা বলে

তিনি আটকে রাখলেন ওদের। সারারাতের ধকলের পর ততক্ষণে ঘুম ভেঙেছে অল্পবিস্তর 'সতীসাধ্বী' রমণীদের। তাঁরা এসে দাঁড়ালেন আলামোর বারান্দায় সার বেঁধে, স্বেচ্ছাবাহিনীর লোকজনেরা কি ধরনের তাই ব্যাখ্যান করতে শুরু করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। ওঁদের মধ্যে আছেন লিলি আরাণ্ডি, আর গৌরবর্ণা, স্বর্ণকেশী, লাবণ্যময়ী কঙ্গো গ্রেস, মেরি স্মিথ, আছেন ফ্রিট্‌জি (অন্য কোন নাম নেই তাঁর), আর আছেন জলি গ্রীন—ফুরিয়ে গেছেন তিনি, কিন্তু জিভের ধার আছে যথেষ্ট। আরও আছেন জন দশ-বার। বিদ্রূপ, হাসি, আর গান জুড়ে দিলেন তাঁরা; 'ওগো, তোমরা অপেক্ষা করছ কেন গো, অপেক্ষা করছ কেন প্রাণ-বল্লভ, বীর-পুঙ্গবেরা।'

'হয় আপনি যেতে বলুন, নয়ত আপনাকে বাদ দিয়েই চলে যাব আমরা।' শেরিফকে বলে উঠল একজন গরু-ভেড়ার কারবারী।

প্রায় দশ মিনিট পরেই ডাব্‌ল শেল রাঞ্চের ঘোড়সোয়ার ক্যালি রিজউড হুড়মুড় করে এসে ঢুকল ফ্রন্ট স্ট্রীট ধরে; ঘেমে নেয়ে উঠেছে তার ঘোড়া, হাত দু'খানা নাড়াতে নাড়াতে লাগাম টানল সে, চিৎকার করে বলল, 'বাঁকের মুখে ঘাঁটি গেড়েছে ওরা, ফোর্ডের পশ্চিমে। হায় রে হায়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা এসে পড়ছে এখানে।'

এরপর আর ধরে রাখা যায় না দলটাকে, আর সেটা মাস্টারসনও বুঝলেন। হৈ হৈ শব্দে বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা ছুটল ফ্রন্ট স্ট্রীট দিয়ে; রেল-লাইন পেরিয়ে চারধারে ছড়িয়ে চলল তারা দক্ষিণে আর পুবে।

নদীর দিকে চোখ রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল সবাই একটানা ঘণ্টাখানেক ধরে। মাস্টারসন কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য। তিনি জানতেন, যদি ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম না দেওয়া হয়, তাহলে এমন অবস্থা হবে, আক্রমণ করা, লড়াই করা, ছোটা অথবা পালানো, কোন কাজেই লাগানো যাবে না তাদের। তাদের আটকে রাখা কঠিন; নদীর দিক থেকে ওঠা একটা টিলার উপরে হাসি-ঠাট্টা, হৈ-হল্লা করতে করতে তারা রাশ টানল ঘোড়ার। মুদির দোকানের কর্মচারীদের কয়েকজনকে মনে হয় ফ্যাকাশে, অসুস্থমত। টেকসাসের ঘোড়সোয়ারদের জনকয়েক নির্বাক, খানিকটা অবিশ্বাসের ছাপ মাখানো মুখে। বাদবাকি সবাই কিন্তু হাসি-ঠাট্টা, আর গুমোর জাহিরে মত্ত; সাটন নামে এক ক্ষতবিক্ষতমুখ লোচ্চা-ঘোড়সোয়ারের কাছ থেকে শুনতে লাগল যে-সব ইণ্ডিয়ানদের সে মেরেছে তাদের গল্প—অগণিত তাদের সংখ্যা, অপবিত্র কাপুরুষোচিত তাদের আত্মা, আর তারই সঙ্গে সায় দিতে লাগল তার ক্ষুদে সাঙাতটা, 'ঠিকই বলছে, সত্যিই মেরেছে ও!'

প্রায় দশ মিনিট রইল তারা সেখানে, তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে চাপতেই দেখতে পেল ইণ্ডিয়ানদের।

ব্যাপারটা ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত, যা অসম্ভব তাই সম্ভব হল বাস্তবে। কারণ,

দলের কেউই মনে মনে গভীরভাবে বিশ্বাস করেনি ব্যাপারটা। ব্যাপারটা তো বনভোজনের মত ফুর্তির ; হাজার হাজার মাইল সমতলের দেশে কেমন করে তারা খুঁজে পাবে একটা শী-এন দলকে ? এমন কি মাস্টারসনও ভরসা রেখেছিলেন যে ওরা কখনোই খুঁজে বার করতে পারবে না ইণ্ডিয়ানদের।

স্বেচ্ছাবাহিনী যেমন নদীর ভাঁটিতে এসেছে উত্তর থেকে, ওরাও তেমনি এল নদীর উজানে দক্ষিণ থেকে। একটা উঁচু জমির উপর উঠতেই চোখে পড়ে গেল হঠাৎ, যেমন-ধারা হয়ে থাকে তৃণপ্রান্তরে। সার বেঁধে দ্রুত এগিয়ে এল তারা, সামনে একদল যোদ্ধা চলেছে আগে আগে মেয়েদের নিয়ে, আর শিশুরা ঝুলছে ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠ থেকে বানরের মত, গৃহস্থালির জিনিসপত্র ঘোড়ার পিঠে বোঝাই, ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে কুকুরগুলো, আর একদল যোদ্ধা চালিয়ে নিয়ে আসছে পিছন দিকটা, দলের পাশে সার বেঁধে আছে পুরুষ আর তরুণেরা। স্বেচ্ছাবাহিনী যখন দেখতে পেল ইণ্ডিয়ানদের, ইণ্ডিয়ানরাও ঠিক তখনই দেখতে পেল স্বেচ্ছাবাহিনীকে। কিন্তু তারা দিক পরিবর্তন করল না কিংবা গতি কমাল না। কেবল নারী আর শিশুরা কাছাকাছি হয়ে এল প্রায় অজ্ঞাতসারেই, তাদের ঘিরে রইল পুরুষেরা, যেমন করে ফিতে দিয়ে বাঁধা থাকে মিছরির চ্যাপ্টা মোড়ক।

গর্জন করে উঠল সাটন, 'হা ঈশ্বর!'

চিৎকার শুরু করল টেকসাসের লোকগুলো, বাক্যহীন শব্দের চিৎকার। ভীষণ ভাবে জল নাড়ালে যেমন হয়, ঘোড়ার পিঠে চড়তে লাগল দলটা তেমনিভাবে। ইংরেজ ছেলে দুটো তাকাল এ ওর দিকে, বোকার মত হাসতে হাসতে, সন্ত্রস্তভাবে একজন হাত দিয়ে স্পর্শ করল আর-একজনের হাত। পেটের ভিতরটা ঘুলিয়ে উঠল টেলিগ্রাফ অপারেটরের, গলা শুকিয়ে গেল, তেতো হয়ে উঠল মুখ। ঘাস খাচ্ছিল ঘোড়াটা, তাকে টানাটানি করতে করতে বমি শুরু করল মুদির দোকানের একজন কর্মচারী।

হল্লাবাজ উচ্ছৃঙ্খল জনতা দেখে জোয়ানমত একজন র‍্যাঞ্চ-মালিক বলল অবজ্ঞাভরে, 'এদের কি হবে, ব্যাট?'

কাঁধ ঝাঁকালেন শেরিফ, চাপড় মারলেন তাঁর ঘোড়ার পিছনে। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে পড়ল দলটা, এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল এলোপাথাড়ি। বন্দুকগুলো নড়ছে, কাঁপছে, গুলি লাগল না কোন কিছুতেই, বেশ স্পষ্ট নিশানার মধ্যে ইণ্ডিয়ানরা দাঁড়িয়ে, এমন কি তাদের গায়েও লাগল না তবু।

টেলিগ্রাফ অপারেটরের মনোগত ইচ্ছা, সে সব ব্যাপারটা দেখবে। নিজেকে বলল সে বারবার, 'দেখবই আমি দেখব, মনে করে রাখব, পরে লিখে রাখব কাগজে।' তবু যা কিছু সে দেখতে পেল তা কয়েকটা ঝলকের মত মাত্র, টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়ে আসা টরেটক্কার মত। ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়াগুলোকে বেগ কমিয়ে এনে হাঁটাতে শুরু করা পর্যন্ত শুধু স্পষ্ট দেখতে পেল সে, তারপরই ঝাপসা হয়ে গেল সব।

জানতেও পারল না সে, পরে কেমন করে দাঁড়িয়ে গেল ইণ্ডিয়ানরা, স্ত্রী-পুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে গেল সার বেঁধে, সংকল্প-কঠিন, কঠোর, পরিশ্রান্ত-মুখ মানুষের দল তাকিয়ে রইল পুরনো রাইফেল কারবাইন আর সেকেলে লম্বা-নল পিস্তলের নিশানা করে, দাঁড়িয়ে রইল শিঙ-বাঁধানো চ্যাপ্টা ধনুকে ছিলে টেনে, তীরগুলো কাঁপতে লাগল একটু একটু—দাঁড়িয়ে গেল আদিম যুগের বর্শা আর পালকের পাড়-দেওয়া ঢাল নিয়ে।

একই সঙ্গে একবারই গুলি চালাল ইণ্ডিয়ানরা, একটিমাত্র ধাক্কা; তাতেই ডাক ছেড়ে সামনে পা তুলে লাফিয়ে উঠল স্বেচ্ছাবাহিনীর ঘোড়াগুলো। তাতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আক্রমণ। ধাক্কাধাক্কি করে পিছনে ফিরতে লাগল দলটা, কেউ বা একসঙ্গে, কেউ বা একা একা, ছুট লাগাল একদল ঘোড়া, পিঠের সোয়ারদের আগ্রহ নেই তাদের ফেরাবার, একদল লাফিয়ে উঠতে লাগল সামনের পা তুলে, সোয়াররা চেষ্টা করতে লাগল পিঠে চাপতে; কয়েকটা সোজা গিয়ে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল শী-এনদের উপর। তারই ফলে ঘাসের ভিতর পড়ে রইল সাটন, হৃদ্‌পিণ্ডে বিঁধে রইল একটা ভাঙা বর্শা, মুখখানা প্রশান্ত—দুঃখবেদনা, অভাব, ছোটখাট ঘৃণা, বাসনা-কামনা আর নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা—মুক্ত সব-কিছু থেকে, কোন কিছুই নেই আর, আছে শুধু শান্তি—সে শান্তি এসেছে এক 'কুকুর-সেনা'র বর্শার ভয়াবহ আঘাতে। তারই ফলে, সেই যে ইংরেজ ছেলেটা, কারও উপর ঘৃণা ছিল না যার, যার কাছে এটা মনে হয়েছিল একটা বন-ভোজন—ছুটতে লাগল ঘোড়ার পিঠে আগাগোড়া শী-এনদের আস্তানার মধ্যে দিয়ে, জ্যাকেট কেটে পিঠে গেঁথে দিয়েছে একটা মাথা-বাঁকানো তীরের ফলা, জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ফুসফুস্, চলে গেল সে সব ছাড়িয়ে, আঁকড়ে ধরে রইল জিনটা, কেঁদে কেঁদে ডাকতে লাগল তার ভাইকে, মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে লাগল তার। আর জনকয়েক পড়ে গেল ঘোড়া থেকে, যেমন পড়ে গেল ব্লেক, সেই রাঞ্চ-মালিক—একটা গুলি লেগেছে তার মাথায়, অতি দ্রুত মৃত্যু হল তার।

আবার মনে করবার চেষ্টা করল টেলিগ্রাফ অপারেটর, চেষ্টা করল দেখতে, চেষ্টা করল পর পর ঘটনাগুলো সাজাতে, ঠিক লিখতে গেলে যেমনটি করতে হয়। এক হাতে অন্য হাতটা চেপে ধরে বসে রইল সে, একটা আঙুল উড়ে গেছে তার, আড়াল করে রইল সেটা, তাকিয়ে রইল ইণ্ডিয়ানদের দিকে—ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে তারা, কানে আসতে লাগল ব্যাট মাস্টারসনের গালাগালি; ভাবতে লাগল মনে মনে:

—'আর কি আশা করেছিলেন তিনি? আঙুল ছাড়া কি গতি হবে আমার? রক্ত বন্ধ হবে কেমন করে?'

হতাশ হয়ে ঘোড়ার রাশ টানলেন মাস্টারসন; এলোমেলো ছত্রভঙ্গ স্বেচ্ছা-বাহিনীকে দেখলেন চারপাশে তাকিয়ে। আরকানসাস নদীর দিকে, কানসাসের তৃণপ্রান্তরের হলদে ঘাসের ভিতরে ইতিমধ্যেই মিলিয়ে যেতে লাগল শী-এন দলটার অদ্ভুত আশ্চর্য অদম্য সংহতি।

ষষ্ঠ পর্ব

সেপ্টেম্বর ১৮৭৮

বেড়াজাল

পিছনে পিছনে চলেছেন মারে। তাঁর লোকজন সব শ্রান্ত, ক্লান্ত, ধুলোমাখা, নোংরা। এমন একটা কিছু চোখে পড়ল ওদের মধ্যে, আগে যা দেখা যায়নি। সকালের কড়া রোদে মাথা নিচু করে উইণ্ট বললেন মারেকে, 'কখনো শিকার করেছ ?'

—'শিকার ?'

—'কুকুর নিয়ে, মানে, এই ধর শিকারী কুকুর নিয়ে তিতির শিকার। লক্ষ্য করেছ মাটির উপর সে কেমন ছুটোছুটি করে ?'

—'শিকার করা অপছন্দ করি আমি।' মারে বললেন। 'শিকার করতে হয় যাকে, মানুষ হিসাবে তার মধ্যে কিছু গলদ আছে, এই ভেবে আসছি আমি চিরকাল।'

কাঁধ ঝাঁকালেন উইণ্ট। বললেন, 'আমি পছন্দ করি, কিন্তু কিছু আসে যায় না তাতে। আমি ভাবছি লোকজনের কথা। তাকিয়ে দেখ ওদের দিকে।'

—'ক্লান্ত হয়েছে ওরা।'

—'ওরা এখন লড়তে চায়—আগে চায়নি লড়তে।'

—'যাদের জন্যে ঘুরছে, তাদের খুঁজে বার করতে চায় ওরা।' মারে বললেন। 'লড়তে চাইছ তো তুমি। হতভাগা ইণ্ডিয়ানদের স্বপ্ন দেখছ তুমি। মনে করছ, আর কিছুই নেই দুনিয়াতে।'

পথের চিহ্ন খুঁজে বার করবার জন্য ঘোরেন তাঁরা সামনে পিছনে, জিজ্ঞাসা করেন লোকজনকে, 'খবর জান ইণ্ডিয়ানদের ?'

রাতে পান রাঞ্চ-বাড়ি, খড়খড়ি বন্ধ করা, কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ করে, ধাক্কাধাক্কি করে গরু-ভেড়া, আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তারা। মারে চেঁচিয়ে ডাকেন, কে আছ, শুনছ, কে আছ ?' ঘুমের চটকাটুকু না ভাঙতেই রাগতে রাগতে মালিক যখন বেরিয়ে আসে বন্দুক হাতে, তার লম্বা শাদা রাত্রিবাসে চেহারাটা দেখায় হাস্যকর। হয়ত মনে মনে ভাবে, 'দিনের বেলা ঘোড়া দাবড়ে, রাতটা ঘুমুতে পারে না বেটাচ্ছেলেরা ? ফৌজকে ঘেন্না করি, ঘেন্না আমার উর্দি জিনিসটার উপরেই। চলে যায় না কেন ব্যাটারা আমাকে রেহাই দিয়ে ?'

—'ইণ্ডিয়ানদের দেখেছ ?' কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করেন মারে।

—'না—বলেছি তো দেখিনি। কোত্থাকার আহাম্মুকের দল। পাঁচ বছরের মধ্যে আমার মোলাকাত হয়নি কোন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে।'

তারপর সৈন্যদের মধ্যে থেকে শোনা যায় বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য। বড় বড় পাঁশুটে রঙের ঘোড়াগুলো খুঁড়তে শুরু করে ঘাসের জমি, সামনের আঙিনা, এলোমেলো করে খামারবাড়ির সম্পত্তি। মালিককে আশ্বাস দিয়ে সৈন্যরা বলে, ফুর্তির ব্যাপার নয় এসব—তার মত লোককে বাঁচাবার জন্যই গরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছে সারা দেশটা।

-'বলেছি তো, পাঁচ বছরের মধ্যে মোলাকাত হয়নি কোন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে।'

মারে বলল উইণ্টকে, 'একজন স্কাউট পেলে ভাল হত। হয়ত ওরা জানে না কিছুই। অর্ধেক সময়েই আমার মনে হয়, ওরা জানে না। কিন্তু ওরা জানে বোধহয়; জানে তারা কোথায় যাচ্ছে। যদি জানতে পারতাম আমরা যাচ্ছি কোথায়।'

—'যাচ্ছি উত্তরে।'

—'যদি কুকুর-সেনারাও উত্তরে গিয়ে থাকে—'

কাঁধ ঝাঁকান উইণ্ট।

ভোরের আগেই তাঁরা গিয়ে পৌছুলেন গ্রীনসবার্গে, নিশাচর ডাকাত কিংবা ভূতপ্রেতের মত রাত্রির অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে, জাগিয়ে দিলেন গোটা শহরটাকে। আতঙ্কে, বিস্ময়ে জানালায় জানালায় দেখা দিল কয়েক শো মাথা, মেইন স্ট্রীটে নীলচে-কালো রঙের এক দীর্ঘ সারি এসে দাঁড়াল শেরিফের অফিসের সামনে। বিশ্রামের নির্দেশ দিতেই ঘোড়া থেকে নেমে বসে পড়তে লাগল মাটিতে।

—'শেরিফ!' চিৎকার করে উঠলেন উইণ্ট। গোটা শহর, কি গোটা দুনিয়ায় সে চিৎকারে জেগে উঠে অভিশাপ দেয় কিনা সে খেয়ালও রইল না তাঁর, তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'শেরিফ!'

শেরিফ থাকেন, অফিসের পিছন দিকে। হাতে একটা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি, রাতের জামার উপরেই টেনে দিয়েছেন প্যাণ্টটা। ছোটখাট মানুষ তিনি, ডিমের মত মাথাটার চারপাশে এলোমেলো ঢেউখেলানো এক বোঝা চুল।

—'বন্দুক নামিয়ে রাখুন, শেরিফ।' উইণ্ট বললেন।

—'এমন ভাবে ভদ্রলোকের শহরে ঘুম ভাঙাতে কে বলেছে তোমাদের?'

—'ইণ্ডিয়ানরা ঘুম ভাঙালে দিব্যি খুশি হতেন বোধহয়, শেরিফ মশাই।'

—'ইণ্ডিয়ানরা?'

—'ঘুমুতে দাও ওকে।' বীতশ্রদ্ধ হয়ে মারে বললেন উইণ্টকে। 'একটা স্কাউট দিতে বল ওকে, তারপর ফিরে গিয়ে ঘুমোক ও।'

ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে সৈন্যরা। ঘোড়ার পাশে রাস্তার উপরেই বসেছে তারা, ঝিমুচ্ছে সবাই, নুয়ে পড়েছে মাথা, হাত ঝুলে পড়েছে পাশে।

—'একটা স্কাউট চাই আমাদের।'

গোটা শহরই জেগে উঠেছে ততক্ষণে। ইণ্ডিয়ানদের গন্ধ গিয়ে পৌছেছে নাকে। ঘুম ভাঙার জন্য এখন আর কোন ক্ষোভ নেই তাদের। পুরনো দিনের মতই

আজকের এই ব্যাপার। রাস্তার দু-ধারে ব্যারিকেড খাড়া করারও প্রস্তাব তুলল তারা। 'লড়ব শেষ পর্যন্ত, টের পাইয়ে দেব মজা', মন্তব্য চলল মুখে মুখে।

—'একটা স্কাউট—শুধু একটা স্কাউট দরকার।'

—'পপ ফিলওয়ে আছে।' শেরিফ বললেন। 'বিশ্বাস কর, গোটা দেশটাই জানে সে—সামনে, পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে সব দিকেই।'

—'কোথায় সে?'

—'ঝানু ইণ্ডিয়ান লড়িয়ে,' শেরিফ বললেন। 'ও যখন ইণ্ডিয়ানদের মাথার চামড়া ছুলতে শুরু করেছে, তখন তুমি বাছা, দুগ্ধপোষ্য শিশু।'

—'বেশ তো, কোথায় সে?'

চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু হল পপকে। ভিড় সরে গেল, তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এল ধবধবে পাকা-দাড়িওয়ালা, হাড্ডিসার বুড়ো।

—'এই এলেন আমার ঠাকুদ্দা।' দাঁত বার করে হেসে উঠল গ্যাটলো।

—'জান এ অঞ্চলটা? স্কাউটের কাজ করেছ কখনো?' অধৈর্যকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মারে।

—'স্কাউটের কাজ? হায় ভগবান; মেজাজ এত খচে আছে কেন, বাছা?'

—'একজন স্কাউটের দরকার আমাদের—শী-এনদের গুলিতে মারা গেছে আমাদের স্কাউট।'

—'শী-এনদের খুঁজছ তোমরা?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মারে, খিকখিক করে হেসে উঠল গ্যাটলো। উইণ্ট বললেন, 'শোন পপ, আমাদের স্কাউটের কাজ করতে রাজি আছ? আমরা একদল কুকুর-সেনাকে খুঁজে বার করতে চাই—প্রায় তিনশো হবে সংখ্যায়, চলেছে উত্তরে। ওদের পেছন পেছন আমরা আসছি দক্ষিণের এলাকা থেকে, ওদের হারিয়ে ফেলেছি মাত্র গতকাল। কাছাকাছি কোথাও আছে তারা নিশ্চয়ই, বড়জোর মাইল কুড়ি দূরে। রোজ পাবে তিন ডলার করে, আর বোনাসের জন্যেও বলে কয়ে দেব কর্নেলকে। কেমন মনে হয় প্রস্তাবটা?'

একজন এক তাল তামাক দিল বুড়োকে, এক কামড় নিয়ে চিবুতে লাগল চিন্তিত মুখে। অবশেষে বলল, 'মনে হচ্ছে তো ভালই। কিন্তু বাছা, হুকুম চালাতে যেও না আমার উপর, কোন বেজন্মা উর্দি-ওলা হুকুম চালিয়ে যাবে, সেইটেই আমার সবচেয়ে অসহ্য।'

—'তাই হবে।' ঘাড় নাড়লেন উইণ্ট।

—'একটা বন্দুক আর একটা ঘোড়া নিয়ে আসছি আমি।'

—'এসব সৈন্য বিভাগের অর্থের অপচয়।' বুড়ো চলে যেতেই বলে উঠলেন উইণ্ট। সৈন্যদের নির্দেশ দিল সার্জেণ্ট ক্যামরুন, টেনে দাঁড় করিয়ে দিল পায়ের উপর, গালাগালি দিতে দিতে বসিয়ে দিল ঘোড়ার পিঠে। টেলিগ্রাফ অপারেটরকে

খুঁজতে গেলেন মারে। খিকখিক করে হাসতে লাগল গ্যাটলো, তারপর শুরু করল ঝিমুতে; আওড়াতে লাগল টুকরো টুকরো ছড়া, ঝিমুতে লাগল আবার। পনের মিনিটের মধ্যেই তারা ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে। আপন মনে চাপা হাসি হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন দুজনকে গল্প বলে চলল ফিলওয়ে,—সেই সময়কার গল্প যখন তরুণ ছিল এই সমতলের দেশ।

পশ্চিমে ঘুরিয়ে নিলেন মারে তাঁর দলবলকে, তারপর উত্তরে, পরে আবার ঘুরলেন পশ্চিমে। নির্বোধ নয় বুড়োটা; কপালগুণেই হোক আর দৈবাৎই হোক, জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে সূর্যোদয়ের ম্লান আলোয় সে খুঁজে বার করল পথের রেখা।

—'কুকুর-সেনাদের?' জিজ্ঞাসা করলেন মারে।

—'তুমিই তো বলেছ বাছা, এ এলাকায় আর-কোন ইণ্ডিয়ান নেই।'

—'কতক্ষণ আগে গেছে ওরা?'

—'আমি তো আর শিকারী কুকুর নই, বাছা।'

—'একটু চেষ্টা কর, পপ।'

সতর্ক হয়ে ঘোড়া থেকে নামল বুড়ো; তারপর মাড়ানো ঘাস, আর গুঁড়িয়ে যাওয়া মাটির চওড়া পথের নিশানায় ঘুরে বেড়াল সে। জিনের উপরে আলগোছে বসে জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে দেখতে লাগল সৈন্যরা। হাতে নিয়ে মাটি পরখ করল স্কাউট, কুড়িয়ে নিল ঘাসের ডগা, আলগোছে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল ঘোড়ার খুরের দাগ। তারপর বলল, 'বোধহয় ঘণ্টাখানেক আগে?'

—'ঘণ্টখানেক?'

—'দু ঘণ্টা হতে পারে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বলতে পারছি না ঠিক; তবে বেশিক্ষণ আগে নয়।'

মারে বললেন, 'এখানে বিশ্রাম করব আমরা; তারপর যাব পিছনে পিছনে।'

প্রথম উত্তেজনায় তিনি চাইলেন তখন-তখনি এগিয়ে যেতে। ইণ্ডিয়ানদের আবার খুঁজে বার করবার, আবার তাদের আঘাত করবার, আরও বেশি বেশি শক্তি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার এক অস্বস্তিকর, বেদনাদায়ক আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে তাঁর। সেই আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে টানছে তাজা ক্ষতের মত।

ঘণ্টাকয়েক ঘুমিয়ে নেওয়ায় ভালই হল সৈন্যদের। মারে বুঝতে পারলেন কেন উইণ্ট ভাবছিলেন শিকারী কুকুরের কথা। পথের রেখা ধরে সবাই চলেছে এখন, তাড়া দিচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। প্রথম প্রথম, ইণ্ডিয়ানরা ছিল শুধুই ইণ্ডিয়ান—সমতল অঞ্চলে ফৌজ রাখবার হেতু মাত্র। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করেছে কেউ কেউ, লড়াই করতেও হবে আবার। ফৌজ আর ইণ্ডিয়ান—দাঁড়িপাল্লার দুই দিকের পাল্লা যেন; একজনকে থাকতে হলে থাকতে হবে অপরজনকেও। এ ব্যাপারে প্রথমদিকে, এমন কি সৈন্যদের মধ্যেও অনেকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল শী-এনদের

প্রতি ; 'লাল-বুনো' অথবা অন্য যা খুশি তাই বল না কেন 'কুকুর-সেনা'দের, কিছুতেই এড়ানো যায় না কিন্তু সত্য ঘটনাকে। সেই সত্য ঘটনা হচ্ছে এই যে ফৌজে-ঘেরা দেশের হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে একটা জাত চলে যেতে চায় নিজের দেশে, তারা হতে চায় স্বাধীন। এ জিনিসটা বুঝতে পারে তারা অনেকটা ; জিনিসটা পাগলামি, কিন্তু প্রশংসনীয় একদিক থেকে।

কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই যে শ্রদ্ধার ভাব, তার ভিত্তি ছিল এই ধারণার উপর যে ধরা পড়বে ইণ্ডিয়ানরা, তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা যাবে তাদের। যে-কোন ইণ্ডিয়ান শুরু করতে পারে এ ধরনের ব্যাপার, কিন্তু শাদা মানুষেরা কখনোই শেষ করতে দিতে পারে না তাকে। বড় বেশি রকমের সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে এই ইণ্ডিয়ানরা।

বড় বেশি ফাঁকি দিতে পারে ওরা, ঠিক তেলচকচকে 'স্টোয়াট' পাখীর মত। যুক্তরাষ্ট্রের ঘোড়সোয়ারদের দু'দুটো কোম্পানিকে বোকা বানানোর অধিকার নেই তাদের। ইণ্ডিয়ানদের সাফল্যের পরিমাণের অনুপাতে বাড়তে লাগল সৈন্যদের ক্রোধ। নিজেরাই বলাবলি করতে লাগল তারা, আর নয়, এই শেষবার।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পপ ফিলওয়ে, বুড়ো মারে আর উইন্টের মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে বসে চলেছে। ধূসর রঙের ঘোড়ার পিঠে নীল-কোর্তার দীর্ঘ সারিটা চলল অফিসারদের পিছনে পিছনে, দুজনের পর দুজন করে। একটানা সকালের উত্তপ্ত রোদে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে গেল তারা জোর কদমে। ঘন-ঘাসের জমি পেরিয়ে তারা এসে পড়ল ঊষর বন্ধুর প্রদেশে।

—'শীগগিরই আমরা পৌঁছে যাব আরকানসাসে।' উইন্ট বললেন।

—'খুব সম্ভব মাইল দশেক হবে।' সায় দিল বুড়ো। ঘুম পাচ্ছে তার, ঘোড়ার পিঠে বসেই ঝিমুতে শুরু করল সে, ঝুঁকে পড়তে লাগল মাথাটা। উইন্ট বললেন 'ঘুমিয়ে পড় না পপ।'

—'কি বললে বাছা ?'

পথের দিকে দেখিয়ে দিলেন মারে।

—'হায় ভগবান,' বুড়ো বলে উঠল। 'পথ দেখে চলতে পারছ না, বাছা ? পথটা সমান ; পরিষ্কার সোজা গেছে। দরকার হলে, চোখ বুজেই আমি চলে যেতে পারি কানাডির সীমানা পর্যন্ত।'

—'তুমি হয়ত পারবে—'

—'না, না, তা নয়, বাছা। অস্থির হয়ো না। 'কুকুর-সেনার'ও তো মানুষ নয় কি ? তাদেরও ঘুমুতে হবে, বিশ্রাম করতে হবে। তোমরা যা বললে, তা থেকে বুঝতে পারছি, ছুটিয়ে ছুটিয়ে তারা প্রায় আধমরা করে এনেছে ঘোড়াগুলোকে। বেশ তো ওদের পথের ধারেই তাঁবু ফেল না কেন তোমরা, হয়ত দুপুরের দিকে, হয়ত সন্ধ্যের আগেই ধরে ফেলতে পারবে ওদের।'

বুড়োর অনুমানটা সত্যি বলে প্রমাণ করে দিল দলছুট ভেড়ার পালের এক

রাখাল। সৈন্যদের পাশে পাশে কিছুক্ষণ যাবার জন্য ভেড়ার পালটাকে পিছনে রেখে এল লোকটা। জাতে সে মেকসিকান, কাজ করে 'মিস্টার কেণ্টের'। কথা বলে তড়বড়িয়ে স্প্যানিশ আর ইংরেজি মিশিয়ে। জেরা করতে লোকটা বলল, একদল বুনো গেছে এ পথ দিয়ে, মাঠের শেষ সীমা পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছিল তারা মেঘের মত।

—'কতক্ষণ আগে ?'

—'প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে।' সে উত্তর দিল। 'যমের বাড়িতে পাঠাচ্ছ ইণ্ডিয়ানদের, তাই না সিপাইজি ?'

ঘোড়ার পেটে রেকাবের ঘা দিলেন মারে। যেমন করে ধোঁয়া ওঠে ট্রেনের, তেমনি করে ধুলো উড়িয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলল নীলরঙের লম্বা সারিটা। দাঁড়িয়ে পড়ল মেকসিকানটা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াতে লাগল তাদের দিকে।

গুলির আওয়াজ যখন কানে এল তাদের, খুব বেশিক্ষণ যায়নি তখনো। বহুদূর থেকে গুলির আওয়াজকে গাছের ডালভাঙার শব্দের মত মনে হতে পারে, কিম্বা বাতাস যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে মনে হতে পারে পটকা ফুটিয়ে চলেছে কেউ যেন। অনেক সময় শুনে মনে হয়, কিচিরমিচির করছে একদল অদ্ভুত ধরনের পাখী। দলটাকে দাঁড় করালেন মারে, মুরগির মত ককিয়ে উঠল ফিলওয়ে।

—'ওই তোমাদের 'কুকুর-সেনা'রা।' খিকখিক করে হেসে উঠল সে; নিজের সাফল্যে গর্বিত সে। ঘাড় কাত করে তাকাল পথের দিকে, যেমন করে শিল্পী তাকায় নিজের হাতে আঁকা ছবির দিকে।

—'জোর গুলি চলছে।' উইণ্ট বললেন।

কেউ কোথাও নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ; একদল কাক মাথা তুলে লাফিয়ে উঠছে ঘাসের উপরে, তারপর ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে ছররার মত, তাদের আওয়াজেই কেবল আলগোছে ভেঙে যাচ্ছে স্তব্ধতা।

—'মেরে ঠাণ্ডা করে দিল।' ককিয়ে উঠল বুড়ো।

মারে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গ্যাটলো, গ্যাটলো। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে যাও জারসে। যদি কোন কিছু ঘটে, ফিরে আসবে এখানে, জড়িয়ে পড়ো না কোন কিছুর মধ্যে। শুধু তিনজনকে সঙ্গে নাও তোমার; যাতে কিছু দেখতে পাও তারই চেষ্টা কর।'

ফ্রীল্যাণ্ডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব গ্যাটলো। উত্তেজিতমুখে স্যালুট করে, লোক বেছে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়ে চলল সৈন্যদল। এবড়ো-খেবড়ো জমি, লম্বা ঘাস, আর বেঁটে বেঁটে কটন-উডের ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলল টহলদার দলটা। তাদের দেখবার জন্য চোখের উপর হাতের আড়াল দিলেন মারে। একটু পরেই মিলিয়ে গেল তারা, আর মনে হল যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একই সঙ্গে দলের সকলেই, শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল কাঠ হয়ে।

আলগা করে দিল তলোয়ারের বাঁধন, দস্তানা খুলে নিল, ভেজা হাতের তালু ঘষতে লাগলো ঊরুতে। জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে রোদের আড়াল করল চোখে, চাটতে লাগল ধুলোমাখা জিভ।

ভাঙাচোরা, মারখাওয়া ডজ শহরের রক্ষীবাহিনীর হতাবশিষ্টের সাক্ষাৎ পেল যখন, তাদের উত্তেজনার ভার কমল তখনই, তার আগে নয়।

মাস্টারসন বললেন মারেকে, 'শুনুন, ক্যাপ্টেন, আপনার বিচার-বিবেচনা আছে মনে হচ্ছে—'

—'ওসব চলবে না এখানে। এই মূর্খের মত আক্রমণের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী আপনি। কি ভেবেছিলেন? আপনার দলবল নিয়ে ধরে ফেলবেন একটা গোটা 'কুকুর-সেনা'র দলকে?'

—'কোন উপায়ই ছিল না থামাবার। ফৌজ থেকে যদি সিপাই পাঠাত তাহলে এমনধারা ঘটত না।'

এক র‍্যাঞ্চ-মালিকের গাল কেটে গেছে গুলি লেগে, রক্ত পড়ছে তখনো। সে বলল, 'মনে কিছু করবেন না, সিপাইজি। আমাদের ব্যাপারে আমরা কি করি না করি, সে মাথাব্যথা আমাদেরই।'

—'যেখানে আমার ফৌজ থাকবে, সেখানকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার মাথা-ব্যথাটা আমার।' গর্জন করে উঠলেন মারে।

—'তাহলে, সেই দক্ষিণেই আটকে রাখতে পারেননি কেন শয়তানগুলোকে, ওখানেই তো থাকার কথা ওদের।'

চাপাকণ্ঠে মারে বললেন, 'একটু এদিক-ওদিক হলেই গুষ্টিসুদ্ধ আপনাদের গ্রেপ্তার করব, বলে দিচ্ছি, মশাই।'

রক্ষীবাহিনীর অধিকাংশই এসে দাঁড়িয়েছিল মাস্টারসন আর অফিসারদের চারপাশে। তারা সবাই উত্তেজিত, উন্মত্ত; পরাজয়ের আকস্মিকতা, আর ধাঁধা লাগার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে তারা। সৈন্যদের প্রতি রাগে, আর ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ঘৃণায় তারা ফেটে পড়তে লাগল। তারা গালাগাল দিতে লাগল মারেকে, সমস্ত রাগ ঝাড়তে লাগল তাঁর উপর। ঘোড়া থেকে নেমে একটা ধারে ঘাসের উপর বসে পড়ল সৈন্যরা, ঘষতে লাগল টানধরা মাংসপেশী, শুয়ে পড়ল মাথার নিচে হাত রেখে। তর্কাতর্কির দিকে বিশেষ কোন নজর দিল না তারা।

মাস্টারসন বললেন, 'একটু দাঁড়ান, ক্যাপ্টেন। অনেক আজেবাজে কথাই হল এখানে। কিন্তু একপাল ছেলেছোকরার মত কাজ করলে ফয়দা হবে না কিছুই। কানসাসে এখন সামরিক আইন জারি নেই। কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না আপনি। আর এদিকে, মাথাগরমের দলও কাজে আসবে না কোন। আপনার কাজ হচ্ছে শী-এনদের খুঁজে বার করা। আমরাও যেতে চাই আপনার সঙ্গে।'

—'আমি আপনাদের চাই না।' মারে বলে উঠলেন, 'বে-সামরিক কাউকে চাই নে আমি। এই আমার সাফ কথা।'

—'নিজেদের জন্তেই লড়াই করতে হবে আমাদের।' জোর দিয়ে বললেন মাস্টারসন।

—'আপনারা কি করতে পারেন, তা তো দেখলামই।'

—'তবু, আমরা যাব।'

—'চুলোয় যান আপনারা!'

শান্তচোখে মাস্টারসন তাকালেন মারের দিকে। প্রায় আধাআধি সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেল রক্ষীদল। অর্ধেক সায় দিল মাস্টারসনের দিকে; অন্তেরা কিছুটা লজ্জিতভাবে, শুয়ে বসে আরাম-করা সৈন্যদের কৌতূহলীদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চুপচাপ সরে গেল ধীরে ধীরে, ছোটখাট ভিড় করে দাঁড়াল মৃত-আহতদের আশে-পাশে। আঘাতলাগা হাতটা অপর হাতে চেপে ধরে বসে রইল টেলিগ্রাফ অপারেটর; এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগল ইংরেজ ছেলেটি; তার ভাই শুয়ে আছে, মুখের উপর টেনে দেওয়া হয়েছে সার্টটা, বুকে তখনো সেই ভাঙা তীরটা বেঁধা।

—'চলুক ওরা সঙ্গে।' উইণ্ট বললেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

মারে তখনো তাকিয়ে ছিলেন মাস্টারসনের দিকে। ঘাড় নাড়লেন মাঝখানেই। তারপর ঘোড়ার কাছে গিয়ে চেপে বসলেন পিঠের উপর। উঠে দাঁড়াল ঘোড়সোয়াররা। বুড়ো স্কাউট ঘোড়া থেকে নামার ধার ধারেনি, ঘোড়ার পিঠে বসে সে তামাকপাতা চিবুচ্ছিল, আর থুথু ছুঁড়ছিল শূন্যে। মাস্টারসন এগিয়ে গেলেন তাঁর ঘোড়ার কাছে, রক্ষীবাহিনীর প্রায় অর্ধেক তাঁর সঙ্গে চলল ঘোড়ায় চড়ে। একবারও পিছনে না তাকিয়ে মারে নিয়ে চললেন সবাইকে শী-এনদের পথের রেখা ধরে।

লড়াইয়ের ময়দানে রক্ষীবাহিনীর যারা পড়ে রইল, তারা তাকিয়ে দেখল সৈন্য আর নাগরিকদের চলে যেতে। তার পর, শূন্যমনে মৃত আর আহতদের নিয়ে ডজ শহরে ফিরে যাবার আয়োজন করতে লাগল। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে রইল টেলিগ্রাফ অপারেটের এক মিনিট কি দু মিনিট, তারপর বেদনায় মুখ বিকৃত করে ছুটে গেল তার ঘোড়ার দিকে, পিঠে চেপে ছুটল ওদের পিছন পিছন। কে যেন ডাকছে শুনতে পেয়ে জিনের উপরেই বসে ঘাড় ফেরাল সে। দেখতে পেল, পিছন পিছন আসছে সেই ইংরেজ ছেলেটি। একটু দাঁড়াল তার জন্য, সে এসে পড়তেই নিঃশব্দে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল দুজনে।

মারের মনে হল, আর কোন দরকার নেই তাড়াহুড়ো করার। যা অবশ্যম্ভাবী তাই আসছে সামনে। শী-এনরা হয়ত এগিয়ে যেতে পেরেছে আরও এক ঘণ্টার রাস্তা, সবসুদ্ধ দু ঘণ্টা, হয়ত তিন ঘণ্টাও হতে পারে; এতে আসে যায় না কিছুই। এক সময়ে ঘুমুতেই হবে ওদের, থামতে হবে এক সময়। লড়াইয়ের জায়গা থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে পড়ে আছে একটা মরা ঘোড়া, ছেঁকে ধরেছে মাছিতে। ঘোড়ার

ঘাটতি পূরণ করার উপায় নেই তাদের, কাউকে নিশ্চয়ই চলতে হবে আরেকজনের সঙ্গে একই ঘোড়ায়। তারা কোথা থেকে যে খাবার পায় তা জানেন শুধু ভগবানই। গরুর মাংস খায় হয়ত; কিন্তু তিনশোজনের জন্য তো প্রচুর মাংসের দরকার। দিনে আট, নয় কি দশ ঘণ্টা ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলবার মত মেয়েছেলে কোন জাতেরই নেই। কোন জাতের শিশুরাও তৈরি নয় তেমনভাবে। তাদের বেদনার কথা ভাবতে চান না তিনি; তাদের বেদনায় তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই; তাদের পাকড়াও করাটাই তাঁর মাথাব্যথা।

—'আজকেই?' জিজ্ঞাসা করলেন উইণ্ট।

—'কিছুই আসে যায় না তাতে,' মারে বললেন, 'আজই হোক, আর কালই হোক।'

আরকানসাস নদীর কাদাগোলা স্রোত পেরিয়ে তাঁরা চললেন উত্তর-পশ্চিমে, রেলরাস্তার দিকে। আনন্দে কলরব করতে করতে বুড়ো স্কাউটটা জলের মধ্যে খুঁজে বার করল ইণ্ডিয়ানদের পথের রেখা, খুঁজে বার করল জল পেরিয়েও। তারপর পাওয়া গেল আরও একটা মরা ঘোড়া, রাক্ষসের মত মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে দুটো নেকড়ে। মড়া আগলে চিৎকার জুড়ে দিল তারা, শুরু করল দাঁত খিঁচুতে। সৈন্যরা প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়তেই দাঁড়াল একটু পিছিয়ে। হন্যে হয়ে উঠেছে তারা মাংসের জন্যে, বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে তাতেই।

বেলা প্রায় দুটোর সময় তাদের চোখে পড়ল ত্রিপলে ঢাকা চারটে গাড়ি, সঙ্গে জনকয়েক ঘোড়সোয়ার, আসছে পশ্চিম থেকে। উইণ্ট গেলেন মোলাকাতের জন্য, দেখলেন গাড়ি-বোঝাই ফৌজ। জনৈক অফিসার উইণ্টের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন, ডজ কেল্লার ক্যাপ্টেন ট্রাস্ক তিনি।

—'বড্ড খুশি হলাম আমরা।' মাথা নাড়লেন উইণ্ট। 'আমার নাম উইণ্ট। পরিচালনা করছেন ক্যাপ্টেন মারে। আমরা 'চার নম্বর'-এর দুটো দল, আসছি রেনো কেল্লা থেকে।'

মাথা নাড়লেন ট্রাস্ক, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। আপনারা হয়ত সেডবার্গের দেখা পাননি।'

—'যিনিই হোন না কেন তিনি, দেখা হয়নি আমাদের সঙ্গে।'

ততক্ষণে এসে পড়ল সৈন্যরা, সেই সঙ্গে মাস্টারসন, আর তাঁর রক্ষীবাহিনীও। ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন মারে। গাড়িগুলো থামলো, পায়ে ফিঁক-ধরা সৈন্যরা নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। একপাশে জড়ো হয়ে দাঁড়াল রক্ষীবাহিনীর লোকেরা। সৈন্যদের প্রায় আয়েস করে চলাফেরা করতে দেখেই আবার মনে জেগে উঠল উর্দিধারীদের সম্পর্কে রক্ষীবাহিনীর সেই পুরনো অবজ্ঞা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল তারা, মিলেমিশে গেল ঘোড়সোয়ার আর পদাতিকেরা, চেঁচামেচি জুড়ে দিল সিগারেট-কাগজ তামাক আর মিষ্টির টুকরো নিয়ে। দল ভারি হওয়ায় উৎসাহিত

য় উইঙ্গ রেনো কেল্লার লোকেরা। কৃতিত্বের গর্ব তাদের মনে, বলে চলল পিছু পিছু ছোটার গল্প, বলে বলে মন তৃপ্ত হল

মাস্টারসন গিয়ে যোগ দিলেন অফিসারদের সঙ্গে, ট্রাস্কের কাছ থেকে একটা সিগারেট পেয়ে টানতে লাগলেন চুপচাপ। আর সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে আসার পরেকার ঘটনাগুলো অতিদ্রুত সংক্ষেপে বলে চললেন মারে।

—'আপনার সঙ্গে মিলবার জন্যে সেডবার্গকে পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণে।' ট্রাস্ক বললেন তাঁকে। 'তাঁর সঙ্গে ছিল একটা খচ্চরে-চাপা কোম্পানি। তিনি ঠিক দক্ষিণেই গিয়েছিলেন মনে হয়। আপনি যে 'লালচুলো'কে পাঠিয়েছিলেন, সেও ছিল তার সঙ্গে।'

—'আমরা তাঁর দেখা পাইনি।'

—'সম্ভবত তিনিও দেখা পাননি শী-এনদের। রেল-রাস্তা, আর এই জায়গাটার মধ্যে ওদের আটকে দেবার হুকুম পেয়ে আমি আজ ভোরে বেরিয়েছি ডজ কেল্লা থেকে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করিনি।'

—'তোমাদের ইণ্ডিয়ানদের তো পেয়ে গেছ, বাছা।' মুখ টিপে হাসল পপ ফিলওয়ে। 'একটু আগেই আছে ওরা। চলে এস লোকজনকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে।'

—'একটু আগেই আছে ওরা, তা ঠিক।' মাথা নাড়লেন মারে। 'এই মাস্টারসন আর ডজ শহরের রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়েছিল ওদের নদীর ওপারে। রক্ষীবাহিনীর অর্ধেক রয়ে গেছে সেখানে।'

—'মরে গেছে?' অবিশ্বাসভরে প্রশ্ন করলেন ট্রাস্ক।

—'মরেছে তিনজন। বাকি সব ফিরে গেছে।'

—'যাই হোক, এবার পেয়েছি ওদের।' ট্রাস্ক বললেন। 'রেল-রাস্তায় আছে দুটো কোম্পানি, লার্নেড থেকে আসছে তৃতীয় কোম্পানি। এখানে আছে তিনশো, ওদের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি। 'খেল্'টা তো আপনার ক্যাপ্টেন, আমি থাকব আপনার সঙ্গে।'

—'ধন্যবাদ।' মারে বললেন। করমর্দন করলেন তাঁরা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার চলল সৈন্যদল পথের রেখা ধরে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় পর্যন্ত পশ্চিম কানসাস বিস্তীর্ণ প্রান্তর-ভূমি, একটানা প্রান্তরে সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেও চোখে পড়ে না একটা রাঞ্চ, কি গোলাবাড়ি। দেশ জুড়ে বিশাল ঢেউ-খেলানো প্রান্তর, উঁচু উঁচু ঘাস—এত উঁচু যে, জায়গায় জায়গায় ঘোড়ার পিঠে বসে মাথা নীচু করলে একেবারে মিলিয়ে যায় তার ভিতরে। অসংখ্য অপরিসর নদী সারা দেশটাতে, শুকিয়ে থাকে গোটা বছরের বেশির ভাগ সময়, উত্তাল হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, অধিকাংশ-সময়েই পড়ে থাকে নিস্তরঙ্গ; কর্দমাক্ত হয়ে।

আরকানসাস নদীর বাঁকে কানসাসের এ-অঞ্চলটা এমনি জনবিরল। এখান থেকেই শুরু হয়েছে পনি ফর্কের ত্রিভুজাকৃতি উত্তরাংশ, তারই সঙ্গে মূল নদীটা ঘুরে গেছে দক্ষিণ প্রান্তে। দক্ষিণ-পশ্চিমের ডজ শহর থেকে উত্তর-পুবের ফোর্ট লার্নেড পর্যন্ত এলাকাটা এমনই যে, সেখানে হারিয়ে যেতে পারে যে-কোন মানুষই, হারিয়ে যেতে পারে হাজারটা গরু-ছাগল। কিন্তু বেশিদিন রইল না সেরকম। ইতিমধ্যেই সাণ্টা-ফে রেলপথের ইস্পাতের শেকল বেঁধে ফেলেছে পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আরকানসাস নদীর বাঁকের ফাঁকটুকু। আর ইতিমধ্যেই প্রায় বন্দুকের মুখেই উদ্বাস্তুরা এগুতে শুরু করে দিয়েছে দিগন্তহীন গরু-ছাগল-কারবারীর দেশে। কিন্তু ১৮৭৮ সালে এ-অঞ্চলটা তখনো বেশির ভাগই জনহীন প্রান্তর।

এ অঞ্চলটাতে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে যদি কোন ঈগল উড়ে যেত অনেক উঁচুতে, তাহলে সে হয়ত দেখতে পেত শী-এনদের পলায়নের দৃশ্যটা, তারা চলেছে নদীর সরু বাঁক পেরিয়ে উত্তরে, চলেছে উত্তর-পশ্চিমে সূর্যাস্তের দিকে, তারপর আবার উত্তরে, আরও উত্তরে বহুদূর দৃষ্টি প্রসারিত করে সে হয়ত আরও দেখতে পেত ঘোড়-সোয়ারদের একটা দল এগিয়ে আসছে দক্ষিণ-পশ্চিমের লার্নেড কেল্লা থেকে। হয়ত দেখতে পেত, দুটো ঘোড়সোয়ার, আর-একটা পদাতিক কোম্পানি ছুটে আসছে; উত্তরে পথের রেখা ধরে। ছোঁ মেরে নিচে নেমে এসে সে যদি এগিয়ে যেত দক্ষিণ-পশ্চিমে, তাহলে দেখতে পেত, খচ্চরের পিঠে আর-একটা কোম্পানি ক্রিমারনের পার-ঘাটায় পার হচ্ছে আরকানসাস নদী, তারা চলেছে উত্তর-পুবে। দেখতে পেত, পুবের ডজ কেল্লা থেকে আসছে খোলা রেল-গাড়ি, তাতে বোঝাই এক কোম্পানি পদাতিক, আর দুটো কামান কুৎসিত শুঁড় উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে। আরও উত্তরে এগিয়ে যেত যদি, তাহলে দেখতে পেত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আর-একটা কোম্পানি, আসছে ওয়ালেস কেল্লা থেকে, দক্ষিণ-পুবের স্মোকি হিল নদীর উজানপথে।

এ-সব তো ধরা পড়ত ঈগলের চোখে; কিন্তু অন্যান্য সকলেও অনুভব করতে পারল সমতলের অস্থির চাঞ্চল্য। জন-বিরল এলাকার র‍্যাঞ্চ-বাড়ির মানুষদের কানে গেল ইণ্ডিয়ান শব্দটা; তারা বন্ধ করে দিল জানালা-দরজা; ঘষতে বসল বন্দুকগুলো। দূর থেকে রাখালেরা দেখতে পেল মানুষের কালো কালো দঙ্গল, বুঝতে পারল কে ওরা। টেলিগ্রাফ অপারেটাররা বুঝতে পারল, কাছে এগিয়ে আসছে ঘেরাও করা বেড়াজাল, আর সবুজ রঙের চোখ-ঢাকার নিচে তাদের মুখ হয়ে উঠল উত্তেজনায় কঠিন। জীবনে যারা কোনদিন ঘোড়দৌড়ের বাজি ধরেনি, বেশ কিছু লেনদেন জুটে গেল তাদেরও। মাইলের পর মাইল টেলিগ্রাফের তার মুখরিত হয়ে উঠল সংকেতবার্তায়; সেই সংকেত অর্থময় হয়ে উঠল হাজার আঙুলের টরেটক্কায়, চলে গেল হাজার মাইল দূরে, একজন থেকে আর-একজনের কাছে। সমতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পারাপারের সময় রেল-কণ্ডাকটাররা খবর পৌঁছে দিতে লাগল যাত্রীদের কাছে, আর উদ্গ্রীব ফ্যাকাশে মুখের ভিড় জমল জানালার সার্সীতে-সার্সীতে, তৃণপ্রান্তরের শতাধিক শহরে রাত্রিটা হয়ে

উঠল উদ্বেগে-শঙ্কায় আকুল। প্রশ্ন উঠতে লাগল হাজার বার: 'কোথায় আছে শী-এনরা ?'

পদাতিক বাহিনীর আগে আগে যেতে পারলেই খুশি হবেন মারে। সংঘর্ষই তিনি চান; তিনি চান সব শেষ করে দিতে। পালিয়ে গেলেও থামানো যাবে না তাঁর মনের আতঙ্ক। তিনি চান শী-এনদের আঘাত করতে—অতি দ্রুত নির্মম আঘাত। সৈন্যদের দীর্ঘ সারিটা তাঁর কাছে মনে হল এক্টা নীল রঙের ইস্পাত-মোড়া চাবুক। ইস্পাতের স্প্রিঙের মত নিজেকে শক্ত করে চেপে ধীরগতিতে চললেন তিনি আগে আগে। আশ্বাস দিতে লাগলেন মনকে, 'আজ—নয়ত কালই।'

—'সব চুকেবুকে গেলে খুশি হব আমি।' উইন্ট বললেন।

—'আজ, নয়ত কালই।' মারে ভাবলেন মনে মনে।

উইন্ট বললেন, 'গাড়ি রয়েছে আমাদের; পদাতিক সৈন্যরা হেঁটে ফিরে যেতে পারবে ডজে, গাড়িতে পুরে নেওয়া যাবে ইণ্ডিয়ানদের। সেইটেই ভাল হবে। আমি ট্রাস্ককে বলব, তার কাছ থেকে গাড়িগুলো আমাদের জন্য চেয়ে রাখব।'

বেশ এগিয়ে চলল তারা, খুব তাড়াতাড়ি না হলেও ঘণ্টায় পাঁচ-ছ মাইল, এই ফাঁকা মাঠে ছ'টা খচ্চরে-টানা গাড়ির পক্ষে যথেষ্ট। আগে আগে ঘোড়সোয়ারদের কোম্পানি দুটো, পিছনে গাড়িগুলো, একেবারে পিছনে চুপচাপ চলেছে রক্ষীবাহিনী। আগের দিনের রাত্রি থেকে উত্তেজনার দৌড়টা বড় বেশিরকম হয়ে গেছে ডজের নাগরিকদের পক্ষে; প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তার। গুম হয়ে উঠল তারা, গরগর করতে লাগল ঘৃণা আর হতাশায়।

মনে মনে মারে ভাবলেন, 'পালাবে ওরা—নয়ত পাগল হয়ে খুনোখুনি শুরু করবে। চেষ্টা করতে হবে মেয়েছেলেদের কাছ থেকে ওদের দূরে রাখতে।'

উইন্টকে কথাটা বলতেই সায় দিয়ে উইন্ট বললেন, 'গোটা ব্যাপারটাই মনে হয় যেন সত্যি নয়—যেন স্বপ্ন দেখছি। চুকেবুকে গেলে সত্যিই খুশি হব।'

বুড়ো পপ ফিলওয়ে চলছিল গাড়ির পাশে পাশে। উদ্‌গ্রীব হয়ে খুঁজে নিচ্ছিল বিচ্ছিন্ন পথের রেখা। নিজের উপরেই খুশি সে। অদ্ভুত তার সহ্য করবার ক্ষমতা; এই সব কিছুর জন্য তার উগ্র আনন্দ এসে পৌঁছল প্রায় অশ্লীলতার সীমায়। ভোর থেকেই সে আছে ঘোড়ার পিঠে, ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার তখন, তবু অল্প সময়ের জন্য একটু-আধটু ঝিমুনি ছাড়া ক্লান্তির আর-কোন লক্ষণই দেখা যায়নি তার। জন্তুর মত সদাসতর্ক সে, কখনো বাতাস শুঁকছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে দিগন্ত-সীমা; ঝুঁকে পড়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কখনো পথের দিকে। লেফটেন্যাণ্ট গ্যাটলো এসে দাঁড়াল তার পাশে, জিজ্ঞাসা করল, 'কাছে এসে পড়েছি, না পপ ?'

—'বাতাসে ওদের গন্ধ পাচ্ছি, বাছা।'

—'ঠিক বলছ ? আমি শুনেছি গন্ধ পাওয়া যায় ইণ্ডিয়ানদের।'

—'আলবত, আমি তো পাচ্ছি।' উত্তর দিল বুড়ো।

—'অনেকদিন সমতলে ঘুরছ, তাই না?'

—'অনেক দিন?' থুথু ফেলল বুড়ো। 'বুড়ো জিম ব্রিজারের নাম শুনেছ, বাছা? বাহাত্তর তার বয়েস; তারও চার বছরের বড় আমি। অক্টোবরের ন' তারিখে হবে ছিয়াত্তর। প্রায় চল্লিশ বছর আছি সমতলে। কোনদিন কোন ইণ্ডিয়ানকে মারিনি, বাছা,—মারতেও হয়নি কখনো। কত যে খুনোখুনি দেখেছি, কিন্তু নিজের হাতে দাগ ফেলিনি আমি। ভগবানের ডাক যখন আসবে, তখন হাজির হব পরিষ্কার হাতে।'

—'লড়বে না তুমি?' জিজ্ঞাসা করল গ্যাটলো।

—'না, বাছা। শাস্তরেই বলে, পাপের পথে আমাকে টেন না। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে আমি নিজেই পারব।'

—'যাতে পার সেই কামনাই করি, পপ।'

—'ভাববার দরকার নেই, বাছা। ভগবান নিজেই ব্যবস্থা করে দেন।'

পরে বিশ্রামের সময় ডজ কেল্লা থেকে ট্রাস্কের আনা প্রচুর খাবার নিয়ে সবাই যখন খেতে বসল, মারে স্কাউটকে পাঠিয়ে দিলেন আগে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ে দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে ফিলওয়ে ফিরে আসতেই আবার চলতে শুরু করল সৈন্যরা।

—'ওই তো ওখানে ওরা।' ঘাড় নাড়ল সে।

—'কোথায়?'

—'একটু আগে—ওসেজ রান নামে ছোট্ট ঝরনার ধারে। ওখানেই আছে ওরা, রাত কাটানোর আয়োজন করছে।'

—'কতদূর?'

—'তিন মাইল।' দাঁত বার করে হাসল বুড়ো। 'মেয়েছেলে, বালবাচ্চা—একটা গোটা ইস্রায়েলি দল পেয়ে গেছ বাছা। 'কুকুর-সেনা' ওরা! কুস্তির লড়াই শুরু হবে, বাছা।'

গ্যাটলো বলল, 'ও একটা পাগল, ক্যাপ্টেন। বাহাত্তুরে ধরেছে ওকে। বলছে ওর বয়স ছিয়াত্তর।'

—'আলবত, ঠিক বলেছি।' দিব্যি গালল ফিলওয়ে।

—'ঠিক আছে, পপ,' মারে বললেন। 'ওরা ওখানে আছে, ঠিক বলছ?'

—'চোখ দুটো আছে কি করতে?'

থেমে গেল ছোট্ট বাহিনীটা। ঘোড়সোয়াররা আলগোছে বসে রইল জিনের উপর, দুটো দুটো করে ঘোড়া দাঁড়াল, পাশাপাশি, পিছন দিকে টান টান হয়ে গেল লম্বা সারটা, ছায়া পড়ল আঁকাবাকা তেরচা গোছের। অনেক নিচে ঢলে পড়েছে সূর্য, তার প্রখরতা নেই আর। কমলা রঙের থালার মত সূর্যের দিকে ভাল করে তাকিয়ে

দেখতে পারল সবাই। সামনের দিকে ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে তৃণ-প্রান্তর, গোধূলির আলোয় জনহীন বিস্তৃত প্রান্তরের বুকে জেগে উঠেছে গভীর শোকাবহ গাম্ভীর্য।

মারে আর উইণ্টের সঙ্গে মিলবার জন্য এগিয়ে গেলেন ট্রাস্ক। গাদাগাদি করে দাঁড়াল নিম্নপদস্থ অফিসাররা, তাদের পিছনে রক্ষীবাহিনীর অধিকাংশ। ঘড়ির দিকে তাকালেন উইণ্ট। নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে গুনগুন করে উঠলেন মাস্টারসন।

—'মনে হয় না রাতের জন্যে তোড়জোড় করছে ওরা।' মারে বললেন, 'মনে হচ্ছে, বুঝতে পেরেছে।'

—'ওদের উপর আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখছি।' প্রায় ঔদ্ধত্যের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ট্রাস্ক। রেনো কেল্লা থেকে দীর্ঘ ক্লান্ত পথ তাঁকে পেরিয়ে আসতে হয়নি, মাত্র কয়েক মাইল এসেই তিনি পৌঁছে গেছেন সাফল্যের মুখোমুখি। তাঁর মনে হল, প্রতিবন্ধকতা করছেন মারে। বয়সে তিনি বড়, আর এখন তাঁর মনে হল, অতি সহজে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন সৈনাপত্যের অধিকার। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন মারেকে, লম্বা, কাঠখোট্টা, দাড়ি কামানো নেই, নোংরা অপরিচ্ছন্ন, চিন্তাগ্রস্ত মানুষটি; পরিস্থিতি সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা নেই বলেই পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন মনে হয়। উইণ্ট আরও কোমল ধরনের, বয়সও কম,—ঠিক যে ধরনের মানুষ থেকে দূরে দূরে থাকেন ট্রাস্ক আধা-অবজ্ঞায়, আধা-বিস্ময়ে। কোমলতার কোন স্থানই নেই সমতলে। প্রায় নারীজনোচিত উইণ্ট।

—'কি বললেন? শ্রদ্ধার ভাব?' থতমত খেয়ে গেলেন মারে।

—'জেনে রাখুন ওরা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান।' ট্রাস্ক বললেন, 'তাই যথেষ্ট।'

—'জানি আমি।' ঘাড় নাড়লেন মারে।

—'রাতেই খতম করে দেব আমি।'

—'আজ রাতেই, নয়ত কাল।' কাঁধ ঝাঁকালেন মারে। আড়চোখে তাঁর দিকে তাকালেন উইণ্ট। অবাক হয়ে ভাবলেন, কি করে ফুরিয়ে গেল মারের সমস্ত আগ্রহ।

—'শীগগিরই অন্ধকার হবে।' নিঃশব্দে হাসল ফিলওয়ে। 'লড়াই হবে জব্‌বর একখানা—অন্ধকারের আগেই ঠিক হয়ে নাও তোমরা।'

—'অন্য সময়ের চেয়ে আজ রাতই ভাল।' মাস্টারসন বললেন।

মারে ভাবছিলেন, 'অন্ধকারের মধ্যে কাজটা খুব সহজ হতে পারে—খুব কঠিনও হতে পারে। ভগবান, কেন যে লোকটা তার দঙ্গল নিয়ে ফিরে যায় না ডজে!' যুদ্ধের সময় বে-সামরিক নাগরিকের সম্পর্কে সামরিক লোকের যে অবিশ্বাস থাকে, তাঁরও ছিল তাই। অতিমাত্রায় শান্ত হয়ে গেছে মাস্টারসনের ঘোড়সোয়াররা। প্রয়োজন হলে বন্দুকের ভয় দেখিয়েও ওদের ডজে ফিরবার হুকুম দিতে কেন যে তিনি সাহস পাচ্ছেন না, অবাক হলেন তাই ভেবে।

—'দেরি হয়ে যাচ্ছে।' উইণ্ট বললেন। আবার তিনি তাকালেন ঘড়ির দিকে।

—'আমরা যেতে শুরু করব,' ট্রাস্ককে বললেন মারে, 'পিছনে সাহায্যের জন্যে নিয়ে আসুন পদাতিকদের। পালাবার কোন চেষ্টা দেখলেই আক্রমণ করব আমরা।'

দাঁত বার করে হাসলেন ট্রাস্ক।

—'আমরা সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে?' মাস্টারসন জিজ্ঞাসা করলেন।

ঝট করে বলে উঠলেন মারে, 'আপনারা থাকুন পদাতিকদের সঙ্গে। পরে যা খুশি তাই করবেন, শেরিফ। ততক্ষণ আমি হুকুম চালাব।'

—'খুব বেশি চালাবেন না।' মাস্টারসন বললেন।

—'তবু, হুকুম চালিয়ে যাব আমি, শেরিফ। আপনারা থাকুন পদাতিকদের সঙ্গে।'

দু'জনই তাকালেন দু'জনের দিকে; তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মাস্টারসন। একটু হাসলেন তিনি। মারে ভাবলেন, রসিকতার হাসি নয় সেটা। মারে চিৎকার করে নির্দেশ দিতেই সার বেঁধে চলল ঘোড়সোয়াররা, আগে আগে বুড়ো স্কাউট, ঘাড় ফিরিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে নৃত্যপর নীলচে চোখে দেখতে লাগল অফিসারদের। নিঃশব্দে চললেন উইণ্ট; একবার কিন্তু ঘাড় ফেরালেন মারের বাহু স্পর্শ করে। রাত্রি নেমে এল; লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে এঁকেবেঁকে, ছোট ছোট জলা পেরিয়ে এগিয়ে চলল নীল সারিটা। জন-বার লোককে স্কাউট হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে খোলা পাখার মত ছড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন মারে আগে আগে।

—'ওরা যে আক্রমণ করবে, সে জন্যে নয় কিন্তু।' মারে বোঝাতে চাইলেন উইণ্টকে।

ঘাড় নাড়লেন উইণ্ট। অন্ধকারের মধ্যে তিনি দৃষ্টি চালিয়ে দিলেন, তখনো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি অন্ধকার; তৃণ-প্রান্তরের অর্ধরাত্রি যেন এক সংগীতের মন্ত্র, বাতাসে বাজছে ঐকতান, নুয়ে পড়েছে উঁচু উঁচু ঘাসগুলো, আঁকাবাঁকা গাছের সার, বহুদূর দিগন্তের ছায়াচ্ছন্ন রেখার গায়ে অনাদি অনন্ত পাণ্ডুর আকাশ, সূর্যের আলো-হারানো, বৈচিত্র্য-বিহীন।

—'মনে হয়, ওদের আমি ভালভাবেই বুঝতে পারি,' উইণ্ট বললেন, 'যে চালই ওরা দিক না কেন।'

—'আমারও তাই মনে হয়।' সায় দিলেন মারে।

—'ইণ্ডিয়ানদের বোঝা লাগে না।' উইণ্ট বললেন, 'ওদের মানুষ মনে করার প্রয়োজন হয় না; যদি না এই ধরনের ব্যাপার ঘটে।'

—'অন্যায় করেছে ওরা।'

—'তাই মনে হয় আমারও। সব সময়েই ওরা একটা ঝরনা কি নদী খুঁজে বার করে, ব্যাপারটা সত্যিই মজার।'

—'দেশটাকে জানে ওরা।'

—'অবাক লাগে আমার। ম্যাপ নেই ওদের, ও ধরনের কোন কিছুই না। মনে আছে, ম্যাপ দেখিয়েছিলাম একবার এক স্থ সর্দারকে। বুঝতেই পারল না সে জিনিসটা, কিছুই ঢুকল না মাথায়।'

—'মনে করে রাখে ওরা।' মারে বললেন।

ফিরে এল টইলদাররা। মারেকে জানাল, ওখানেই আছে ওরা। ঘাঁটি গেড়েছে নদীর উপরে, উঁচু ভাঙা জমিতে। ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে।

নিজের গর্বে তারিফ করে হাসল বুড়ো স্কাউট, 'কেন, বলিনি আমি আগেই।'

বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। নিজের চোখেই দেখতে পেলেন মারে রেখায়িত সব অগ্নিকুণ্ড, অনেকগুলো অগ্নিকুণ্ডের ক্রমবর্ধমান আলো। লুকোবার চেষ্টা নেই ওদের; প্রতি রাত্রে ওরা জ্বালিয়ে রাখে আলোর নিশানা—চোখে পড়ুক সারা তুনিয়ার।

—'ট্রেঞ্চ খোঁড়া শিখল কোথা থেকে ওরা, ভেবে অবাক হই আমি।' মন্তব্য করলেন উইণ্ট।

মারে বললেন, 'এবার আর পালাতে পারবে না। আমরা আক্রমণ করব সকালে।'

—'ট্রাস্ক?'

—'চুলোয় যাক সে! ঘাঁটি গাড়তে হুকুম দাও সবাইকে।'

ট্রাস্ককে যে-সব কথা বলতে পারতেন তা বলাও প্রয়োজন বোধ করলেন না মারে। তিনি বলতে পারতেন যে, প্রায় ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে চার নম্বরের ঘোড়সোয়াররা, কেবল একটু-আধটু বিশ্রাম ছাড়া তারা ঘোড়ার পিঠেই আছে প্রায় ঘণ্টা কুড়ি; বলতে পারতেন যে, রাত্রে যে-কোন ধরনের আক্রমণই সামরিক জুয়াখেলায় পরিণত হবে। বলতে পারতেন যে, মাস্টারসনের লোকজনেরা যে ইণ্ডিয়ান মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবে না তা তিনি বিশ্বাস করেন না। হম্বি-তম্বি করে গেলেন ট্রাস্ক, আর তিনি বসে রইলেন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে। ট্রাস্ক থামতেই তিনি বললেন, 'এ-সব কথা যদি রিপোর্টে লিখতে চান, তাহলে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন, ক্যাপ্টেন।'

—'লিখবই তো আমি।'

—'সে যাই হোক, আমরা আক্রমণ করব সকালবেলায়ই।'

আর ট্রাস্কও বাধ্য হলেন এ প্রস্তাব মেনে নিতে, নয়ত রাতে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয় একা একা, এক কোম্পানি মাত্র পদাতিক নিয়ে। অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে হল তাঁর।

ইতিমধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে শুরু করেছে মারের লোকজন। আরও বারটা

গাড়ি এসে পড়ার ঘড় ঘড় শব্দেও ঘুমের ব্যাঘাত হল না তাদের। আটটা গাড়ি এল রসদ-বোঝাই হয়ে ডজ কেল্লা থেকে; অপর চারটে পাঠিয়েছেন মিজনার, ইণ্ডিয়ান এলাকা থেকে আসছে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। গাড়িগুলো ঘাঁটিতে পৌছুতেই ঘুম ভেঙে গেল মারের। তাঁর নিজের গাড়িতে ডাক্তারি সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে হুইস্কিও ছিল; কয়েক গেলাস খেয়ে নিলেন তিনি। কিন্তু ফিরে গিয়ে নিজের খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে এপাশ-ওপাশ করলেন শুধু। ঘুমোনোর আশা ছেড়ে দিলেন। নিজে নিজেই জিন চাপালেন ঘোড়ায়, তারপর সান্ত্রীদের পেরিয়ে চলে গেলেন ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটির দিকে। পুড়ে পুড়ে নিভে গেছে অগ্নিকুণ্ডগুলো কিন্তু জেগে আছে ইণ্ডিয়ানরা, আগুনের ম্লান আভার সামনে ঘোরাফেরা করছে ছায়ামূর্তি সব। নদীর এপারে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে গেলেন, খুব বেশি দূর নয় যে তারা দেখতে পাবে তাঁকে। তাঁর একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মাল যে তিনি পৌছে যেতে পারবেন ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটিতে, গুলি ছুঁড়বে না কেউ, সৌজন্যবশে সত্যি সত্যি স্বাগত জানাবে তাঁকে, স্বাগত জানাবে তাদের দুর্বোধ্য জলতরঙ্গের মত ভাষায়। প্রায় মিনিট পনের তিনি বসে রইলেন সেখানে, তারপর ফিরে এলেন ঘোড়া নিয়ে।

আকাশে অরুণোদয়ের প্রথম ছোপ লাগার আগেই তিনি ডেকে তুললেন ট্রাস্ককে।

মারে বললেন, 'কালকের রাতের জন্যে আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন।' প্রায় বিনীত দেখাল তাঁকে। তিনি বললেন, 'ওদের ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমি—পালাবে না ওরা। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।'

ঘুম ঘুম চোখে অন্যমনস্কের মত শুধু ঘাড় নাড়লেন ট্রাস্ক। মারের কথার একবর্ণও বুঝতে পারলেন না।

—'পায়ে হেঁটে যাব আমরা।' তাড়াতাড়ি বলে চললেন মারে, অপরজনের সমর্থনের জন্য তিনি ব্যগ্র। 'বন্দুক আছে ওদের অধিকাংশেরই, গুলিবারুদ কম, কিন্তু কি করে গুলি চালাতে হয়, তা জানা আছে ওদের। ওদের সর্দার হচ্ছে 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। যত ইণ্ডিয়ান আজ পর্যন্ত দেখেছি তাদের কারুর মতই নয় সে। ধীর শান্ত—'

—'আক্রমণ করবে ঘোড়সোয়াররা।' বলতে চেষ্টা করলেন ট্রাস্ক।

—'না, না—আগে তাও আমরা করে দেখেছি। তাতে লোক হারাতে হয়েছে আমাকে—একজন লেফটেন্যান্ট, একজন সার্জেন্ট। একমাত্র পথ হচ্ছে পায়ে হেঁটে যাওয়া, আর যদি ঘোড়াগুলো পৌছুতেও পারে, জায়গাটা যে মেয়েছেলে আর বাচ্চাকাচ্চায় বোঝাই। আয়ত্তে রাখতে চাই আমি ব্যাপারটা।'

—'ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আমার মোলাকাত এই প্রথম নয়।' অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন ট্রাস্ক।

—'তা আমি জানি, কিন্তু এরা হচ্ছে 'কুকুর-সেনা', সহজে মৃত্যুবরণ করে না। আর মৃত্যুই তো কামনা করছে ওরা। জিনিসটা বুঝতে হবে আপনাকে। লুটপাট করতে বেরোয়নি ওরা, ওরা চলেছে উত্তরে, নিজেদের দেশ-গাঁয়ে, ফিরে চলেছে পাউডার

নদীর দেশে। তা যে কতখানি অসম্ভব তাও জানে ওরা, আর সেইজন্যই যে-কোন কিছু সম্পর্কেই ভয় ভেঙে গেছে ওদের। ওরা তো মরে আছে আগে থেকেই। জিনিসটা বুঝতে হলে আপনাকে জানতে হবে শী-এনদের। আর ওরা মরে আছে বলেই আর কোন কিছুই ঘটবার নেই ওদের ভাগ্যে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ট্রাস্ক, 'আপনার কথা বুঝে উঠতে পারছি না, ক্যাপ্টেন।'

—'আমি দুঃখিত তার জন্যে।'

—'আমার লোকেরা এগিয়ে যাবে তাই চান, না, তারা পেছনে থাকবে সাহায্যের জন্যে?'

—'আমাকে সাহায্য করবে।' ধীরে ধীরে বললেন মারে, 'আমি চাই মাস্টারসন আর তাঁর দলবলকে সঙ্গে রাখবেন আপনি।'

ঘাড় নাড়লেন ট্রাস্ক; আর ভারিক্কি চালে পা ফেলে মারে ফিরে চললেন তাঁর লোকজনের কাছে। জাগাতে হবে উইন্টকে, জাগাতে হবে বিউগিলারকে, গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভেজা কনকনে ঘাসের মধ্যে। আর, আবার পুনরাবৃত্তি হবে সেই একই ঘটনার; তিনি তা ভালভাবেই জানেন।

গাড়িগুলোকে সার বেঁধে নদী পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা। যতদূর সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছে ষোলখানা মাল-টানা গাড়িকে ব্যারিকেডের মত কাজে লাগানোর পরিকল্পনাটা মারের নিজের। বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিলেন তিনি গাড়িগুলো, তারপর পিছিয়ে গেলেন নদীর দিকে তার পাশাপাশি।

নিজেদের খোঁড়া ট্রেঞ্চের মধ্যে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছে ইণ্ডিয়ানরা, নারী শিশু আর ঘোড়াগুলো রয়েছে পিছনে, আড়াল নিয়েছে একটু উঁচু জমির। মুখ দেখা গেল জনকয়েকের, কয়েকজন 'কুকুর-সেনা'র, আর-কিছুই না; রাইফেলের চোঙায় একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল প্রভাতসূর্যের আলো, আর কোন-কিছুই না তা ছাড়া, না কোন শব্দ, না কোন রণ-হুঙ্কার। কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেল সর্দার ক্ষুদে-নেকড়েকে, বসে রয়েছে ট্রেঞ্চের কিনারায়, মুখে একটা পাইপ। হাসছে নাকি? মারের মনে হল। এতটা দূর যে তা নিশ্চিত বোঝা গেল না।

যদি হাসেও সে, তা হলে বেশিক্ষণ আর হাসতে হবে না তাকে। তুলে-রাখা একতাল মাটির মত বসে আছে সে—লোলচর্ম, বলি-অঙ্কিত, অতি প্রাচীন, অতিবৃদ্ধ, তার পিছনে ওই তৃণ-প্রান্তরের হলদে ছোপ-দেওয়া পাহাড়গুলোর মত। আর হাসছে সে—।

রাইফেলের দূরপাল্লার মধ্যে গাড়িগুলোর পিছনে লোকজনকে গাদাগাদি করে দাঁড় করিয়ে দিলেন মারে। গাড়ির সামনে বাঁধা খচ্চর ছ'টার গায়ে গায়ে চেপে এল লোকগুলো। ঘাবড়ে গেল জানোয়ারগুলো, টান পড়তে লাগল কোচোয়ানদের দিকে। গালাগাল শুরু করে দিল তারা, বলতে লাগল, গুলিগোলা শুরু হলেই ছুট মারবে ওরা

যে কোনদিকে। ঘোড়সোয়াররা তাদের তলোয়ারগুলো ঘুরিয়ে নিল পিছন দিকে, দুই হাতে মুঠো করে ধরল বন্দুক।

চল্লিশ কি ষাট হাত পিছনে ট্রাস্ক তাঁর লোকজনকে সাজিয়ে দিলেন আক্রমণের ভঙ্গিতে। তাদের পিছনে রইল রক্ষীবাহিনীর বাদবাকি সব। গুমরে গুমরে উঠছে তাদের তিক্ত মন; শী-এনদের উপর তাদের যতখানি ঘৃণা, সৈন্যদের উপরেও ততখানি। তারা প্রস্তুত শুরু করে দেবার জন্য, তারা প্রস্তুত আতঙ্কে অথবা ক্রোধে উন্মত্তের মত চিৎকার করে ওঠার জন্য। আর, একপাশে আঁকাবাঁকা নদীর গায়ে নুয়ে দেখা দিল সূর্য, ঝলমল করে উঠল পাণ্ডুর নীল আকাশের সঙ্গে সমতা রেখে।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল উইন্টের মুখ; তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ঘাড় নাড়লেন মারে। এই বয়ঃকনিষ্ঠের জন্য তাঁর মনে জেগে উঠল হঠাৎ এক অদ্ভুত মমতা। বিউগিলারের গায়ে হাত ছোঁয়ালেন উইন্ট, বাজাতে শুরু করল সে; যাদুমন্ত্রের মত যেন উঁচু উঁচু ঘাসের ভিতর থেকে ডেকে আনল এক ঝাঁক পাখীকে। গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেল ঘোড়সোয়াররা, পাতলা হয়ে দাঁড়াল আক্রমণের ভঙ্গিতে। আগে আগে মারে, একপাশে আরও একটু সামনে উইন্ট। বারবার পিছনে তাকাতে লাগলেন মারে, আরও কাছে এসে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দাঁড়ানোর জন্য ইঙ্গিত করতে লাগলেন খোলা তলোয়ার দিয়ে, খিকখিক করে হাসতে লাগল কেউ কেউ, উদ্বেগে ঠোঁট কামড়াতে লাগল অন্যেরা, মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠল অনেকের মুখ, গুঁড়ি মেরে চলতে লাগল কেউ কেউ সতর্ক জন্তুর মত। মারের চোখে পড়ল, সকলের পিছনে চুপ করে বসে আছে বুড়ো স্কাউট রসদের গাড়ির উপর। মুখখানা হাঁ-করা, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, দেখছে সব-কিছু, যতদূর দেখা সম্ভব, যেন এক অস্বাভাবিক দৃশ্যবস্তু অভিনীত হচ্ছে একমাত্র তার জন্যেই।

ধীরমন্থর গতিতে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সবাই সুশৃঙ্খল ভঙ্গিতে নুয়ে-পড়া ঘাসের ডগাগুলো সরাতে সরাতে, সেই ঘাসে ঢাকা পড়ছে তাদের কোমর পর্যন্ত।

মনে মনে মারে বললেন, 'আর তাকিও না পিছনে। যা হবার তা এখুনি হবে—এখুনি।'

তাঁর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটা শুরু হল ভীষণভাবে, মনে হল যেন ফুলে ফুলে উঠতে লাগল বুকখানা, নাড়ী উত্তেজিত হয়ে সব কিছু যেন শুষে নিতে লাগল। গলা হয়ে উঠল শুকনো-বিস্বাদ, জল ভরে এল চোখে। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল তাঁর, ইচ্ছে হতে লাগল চিৎকার করে উঠতে; যে-কোন কাজ করতেই তিনি রাজি, শুধু পায়ে পায়ে এই এমনভাবে নিঃশব্দে ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটিতে পৌছোনোর কাজটি ছাড়া। প্রতি পদক্ষেপে তিনি দমন করে চললেন এ-সব ইচ্ছা। উইন্ট এগিয়ে গেছেন একটু সামনে, পিছন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসলেন তিনি। মনটা তাঁর প্রফুল্লই মনে হল, বে-পরোয়াভাবে তলোয়ারখানা দিয়ে আঘাত করছেন ঘাসের গায়ে। সামনের দিকে তাকালেন মারে, পাইপ টানছে 'ক্ষুদে নেকড়ে', এত কাছে যে চোখে পড়ল বুড়ো

সর্দারের গালের ওঠানামা। ট্রেঞ্চের উপরে ভেসে উঠল শী-এনদের মাথা, স্পষ্ট দেখা গেল বাঁকা হয়ে পড়া সকালের সূর্যালোকে।

—'চালাও গুলি।' কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মারে।

বিউগিল বাজাতে নিশ্চয়ই সংকেত দিয়েছিলেন উইণ্ট, কিন্তু রাইফেলের কড়্ কড়্ শব্দে ডুবে গেল তার আওয়াজ। নিচু হয়ে ছুটতে শুরু করল সবাই। আর তখনই গুলি ছুঁড়ল শী-এনরা, সবাই একই সঙ্গে। একটুও নড়ল না কিন্তু বুড়ো সর্দার।

একা দাঁড়িয়ে রইলেন মারে, তাঁর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন উইণ্ট। সে চিৎকারে যদি কোন কথা থেকেও থাকে তা তিনি বুঝতে পারলেন না; দাঁড়িয়ে রইলেন শী-এনদের ট্রেঞ্চের প্রায় চল্লিশ হাতের মধ্যে, সঙ্গীহীন একা। ঘাসের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে তাঁর লোকজন। মুখ থেকে পাইপটা খুলে নিয়েছে বুড়ো সর্দার। নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল মারের বিস্ময়। গাছে-ঢাকা সড়ক বেয়ে যেমন করে হাঁটে মানুষ, তিনিও ফিরে চললেন তেমনিভাবে।

—'শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, বোকা-রাম!' চিৎকার করতে লাগলেন উইণ্ট।

ওষুধ দিয়ে ঘুম-পাড়িয়ে-রাখা মানুষের মত ঘুম ভেঙে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন মারে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘাসের ভিতর। গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকলেন একটা সৈন্যের গায়ে, লোকটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে জোর করে যেন হাসছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। সৈন্যটার গায়ে হাত দিলেন মারে, মরে গেছে সে। ঘাসের ভিতর গুলি মারতে মারতে মারে পেরিয়ে গেলেন আর একজনকে, গুলি চালাচ্ছে সে, এসে পৌছুলেন উইণ্টের কাছে। জড়সড় হয়ে রুমাল দিয়ে ঘা-লাগা হাতখানা বাঁধতে চেষ্টা করছিলেন উইণ্ট। মারে বললেন, 'আমি বেঁধে দিচ্ছি।' রুমালটাকে পাকাতে লাগলেন মারে, আর শিস দিতে লাগলেন উইণ্ট। ঘাসের ভিতর কোন জায়গা থেকে যেন গুলির শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল ক্যামরুনের গলা।

—'ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন!'

—'ব্যাপার কি?'

—'এগুতে চেষ্টা করব আমরা?'

—'গুলি চালিয়ে যাও।'

—'এগুব?'

—'না।'

সতর্কভাবে মাথা তুললেন মারে। বারুদের ধোঁয়া জমেছে ট্রেঞ্চের উপরে। সরে গেছে বুড়ো সর্দার। চেঁচিয়ে ডাকল গ্যাটলো, 'ক্যাপ্টেন মারে?'

—'বল।'

—'লোক পাঠিয়েছেন ক্যাপ্টেন ট্রাস্ক। রক্ষীবাহিনী সরে পড়েছে, খবর পাঠিয়েছেন।'

—'তাই তো স্বাভাবিক।'

একটু উঁচু হয়েছিলেন উইন্ট, বলে উঠলেন, 'দেখেছ, দেখেছ, হাঁদারামের দল!'

হাঁটুতে ভর দিয়ে ঘাসের উপর মাথাটা একটু তুলে মারে দেখতে পেলেন রক্ষী-বাহিনীকে, প্রায় আধ-মাইল পুবে পার হয়ে গেল নদীটা। সূর্যের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল ছায়ামূর্তিগুলো। দেখতে পেলেন, হাতে-পায়ে ভর দিয়ে তারা উঠে গেল উঁচু পাড় বেয়ে, একটুক্ষণ দাঁড়াল এক জায়গায় ভিড় করে; তারপরেই ছড়িয়ে পড়ল শী-এনদের ঘাঁটির পাশে। অন্যেরা তাদের দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই, কারণ, যেখানে ঘাঁটি গেড়ে আছে, সেই উঁচু জমিটার ঢালুতে দেখা গেল একজন 'কুকুর-সেনা'কে। অর্ধবৃত্তাকারে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল 'কুকুর-সেনা'রা। তাদের দিকে সোজা এগিয়ে গেল রক্ষীবাহিনী।

লড়াইটা বেধে গেল ঘুরপাক খাওয়ার মুখে প্রচণ্ড উন্মত্ততায়, ঘোড়ার পিঠে চেপে, এমন ধরনের আক্রমণ একমাত্র ইণ্ডিয়ানদের পক্ষেই সম্ভব। পিছিয়ে গেল রক্ষীবাহিনী। ঘুরপাক-খাওয়া তীক্ষ্ণধার ছুরির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল শী-এনরা।

—'পিছিয়ে এসে ঘোড়ার আড়াল নিতে বল ওদের।' গর্জন করে উঠলেন মারে।

নদীর মধ্যে দেখা হল ট্রাস্কের পদাতিকদের সঙ্গে।

—'আটকে রাখবেন ওদের।' মারে বলে দিলেন তাঁকে, 'আমি যাচ্ছি রক্ষী-দলকে সাহায্য করতে। ওদের যদি আরও বেশি করে বাইরে না নিয়ে আসতে পারি তাহলেই খতম হয়ে যাবে সব।'

মারে তাঁর লোকজন নিয়ে গাড়িগুলোর আড়াল নিতেই ট্রাস্ক ছুটে এগিয়ে গেলেন ট্রেঞ্চ আক্রমণ করতে। শী-এনদের ট্রেঞ্চ থেকে এল গুলির ঝাপ্‌টা, তাতে লুটিয়ে পড়ল ট্রাস্কের লোকজন; তাই দেখে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন মারে, অসহায় বোধ হতে লাগল তাঁর।

গাড়ি নিয়ে খচ্চরগুলো ছুট লাগাতেই ঘোড়ায় চাপল মারের সৈন্যরা। ট্রাস্কের দলের যারা বেঁচেছিল তারা ছুটল গাড়ির পিছন পিছন, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল রক্ষীবাহিনী, পালাতে শুরু করল মৃত আর আহতদের ফেলে। পিছনে ফেলে গেল এমন এক স্মৃতি বহু বছর ধরে যা বেঁচে থাকবে ডজ শহরের মনে।

মারে তাঁর দলবল নিয়ে সোজাসুজি আক্রমণ করলেন শী-এনদের ট্রেঞ্চ। এবার কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা উঠে পড়ল ঘোড়ার পিঠে, সামনে ঘুরপাক খেয়ে, পিছন ফিরে চিৎকার করে, বীভৎস হুঙ্কার ছেড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে লাফিয়ে চড়তে লাগল তাদের ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ায়। উঁচু জায়গাটায় উঠলেন মারে, দেখতে পেলেন, ইতিমধ্যেই পালাতে শুরু করেছে ইণ্ডিয়ানরা। তাঁকে আটকে রাখার জন্য রেখে গেল এক সার ঘোড়সোয়ারকে।

অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই একখানা গাড়ি উল্টে পড়েছিল নদীর আধ মাইলটাক ভাঁটিতে। 'কুকুর-সেনা'দের যে ছোট দলটা রক্ষীবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল তারা ছুটে গেল গাড়িখানার দিকে, বোঝাই করে নিল কার্তুজগুলো, তারপর সরে গেল বিদ্যুৎবেগে।

তাঁর লোকজনকে আবার জড়ো করতে চেষ্টা করলেন ট্রাস্ক। মাস্টারমন আর রক্ষী-বাহিনীর যারা বেঁচে ছিল, তারা ফিরে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ফিরে এল ট্রাস্কের গালাগাল হজম করতে। গাড়িগুলো পাকড়াও করে ফিরিয়ে আনা হল একে একে।

ট্রেঞ্চ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন ট্রাস্ক। দুজন মৃত ইণ্ডিয়ান পড়ে আছে সেখানে, তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন গম্ভীর হয়ে।

ছোটো অবস্থাতেই কিন্তু ঘোড়সোয়ারদের লড়াই চলল দুপুর পর্যন্ত। ঘোড়ার পিঠে চাপলে শী-এনরা হয়ে দাঁড়ায় দানবের মত ; যেন মানুষ নয় মোটেই। তারা চলল এঁকেবেঁকে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে। উড়ন্ত পাখীকে গুলি করার মতই কঠিন তাদের গুলি করা। সমগ্র দলটা বিপন্ন হলে লড়তে লাগল বুনো নেকড়ের মত, অন্য সময় চলতে লাগল বড় বড় পাঁশুটে রঙের ঘোড়াগুলোকে এড়িয়ে এড়িয়ে অনায়াস গতিতে।

দুপুর বেলায় লোকজনকে দাঁড় করালেন মারে। শী-এনরা ঘাঁটি গাড়ল একটা নুড়ি-ছড়ানো ঢিবির উপর। ঘর্মাক্ত, ধূলিমলিন, ক্লান্ত ঘোড়সোয়াররা নামল ঘোড়া থেকে। উইন্টের হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলে গেছে, সারা গায়ে লেগেছে রক্ত। টুপি উড়ে গেছে গ্যাটলোর, বল্লমের খোঁচায় পাছা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে তার ব্রীচেস্। ওহিও থেকে এসেছিল বেইলি, তার ফুসফুসে বিঁধেছে একটা তীর ; একটু একটু করে মরছে সে, তবু কেমন করে রয়ে গিয়েছে তাদের সঙ্গে। ঘাসের উপর তাকে শুইয়ে দিল সবাই। পরে সেখানেই লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতরে কবর দেওয়া হল তাকে। কোন নাম রইল না সে কবরের।

আবার শী-এনদের ঘাঁটি আক্রমণ করল তারা, আবার হটিয়ে দিল তাদের। অনেকটা দূরে দূরে বৃত্তাকারে তারা ইণ্ডিয়ানদের পিছনে পিছনে চলল পশ্চিম দিকে।

দম ফুরিয়ে এল পাঁশুটে রঙের ঘোড়াগুলোর, রোগা রোগা টাট্টুগুলোর মত তাকত নেই তাদের। শী-এনদের পিছনে পিছনেই রইল তারা, কখনো মাইলখানেক, কখনো কিছু বেশি, কখনো বা কিছু কম দূরে দূরে ; কিন্তু কোন সময়েই ছাড়িয়ে যেতে পারল না ইণ্ডিয়ানদের। সূর্যাস্ত পর্যন্ত পিছনে পিছনেই চলল তারা গুম হয়ে তিক্ত মনে—ঠিক যেমন করে শিকার হারিয়ে চলে বুড়ো ডালকুত্তা। কখনো কখনো ঘোড়া থামাতে লাগল তারা, গুলি ছুঁড়তে লাগল ব্যর্থ আক্রোশে। গালাগাল দিতে দিতে, অনুনয়-বিনয় করতে করতে রেকাবের গুঁতো মারতে লাগল ঘর্মাক্ত ঘোড়ার পেটে।

সূর্য ডুবে গেল, আবার ঘাঁটি গাড়ল শী-এনরা। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সওয়াররা, মাটিতে বসে পড়ে ডলতে লাগল অসাড় পাগুলো। পাঁশুটে রঙের ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় নিশ্বাস নিতে লাগল শব্দ করে।

মারে বললেন উইন্টকে, 'ওরা মানুষ নয়—মানুষের বাইরে।'

—'আবার আপনি যাবেন নাকি?'

—'তাই তো ইচ্ছে—সকালের দিকে।'

—'সকালে ওখানে থাকবে না ওরা।' উইণ্ট বললেন এক অদ্ভুত প্রত্যয়ে।

আর ঘাড় নাড়ালেন মারেও।

অর্ধেক রাত কাটতেই সরে পড়ল শী-এন দলটা। বিউগিলের শব্দে জেগে উঠল সৈন্যরা, অন্ধকারে হোঁচট খেতে লাগল ঘুমের চোখে, জিন চাপিয়ে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু এবারে তারা চলল আস্তে আস্তে, কোন নিশ্চয়তা নেই আর। মারে আবার যখন ইঙ্গিত করলেন থামতে, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল টেনে টেনে ফেলা ঘোড়ার নিশ্বাসের শব্দ আর দূরাগত কোন এক সঙ্গীহীন নেকড়ের চিৎকার— এ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে এল না তাদের।

সপ্তম পর্ব

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৮৭৮

ন্যায়বিধানের ভাষ্য

ডজ কেল্লায় পায়ে হেঁটে এসেছিল ছ'জন লোক, গল্পটা তারাই বলল। তারা বলে গেল আস্তে আস্তে, থেমে থেমে; বেঁচে আছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য যেন মেপে মেপে বলে গেল কথাগুলো। ছ'জনই বাইসন-শিকারী, মাংস শিকারী থেকে তারা পৃথক জাতের—তারা চামড়া-শিকারী। আর বুঝে নিতে হবে এই পার্থক্যটুকু। সে পার্থক্য এই যে, মাংস-শিকারী বাইসন মারত মানুষের খাবার জন্যই, আর তাদের কারো কারো হত্যাকাণ্ডের বিপুল প্রচেষ্টা পরিণত হয়েছে উপকথায়। এমন একজন হচ্ছে বাফেলো বিল কোডি, রেল-শ্রমিকদের জন্য তার ছিল কসাইখানার বিশেষজ্ঞের কাজ। যে-সব জিনিসপত্র সে ব্যবহার করত সেগুলো ছাড়া, অন্য যে-কোন ব্যবসায়ী-কসাই থেকে মোটেই পৃথক ছিল না তার কাজকর্ম—প্রশংসারও কিছু নেই তাতে, বীরত্ব নেই, নিন্দারও কিছু নেই। দুনিয়া ঘুরেছে সে পশ্চিম আমেরিকার দুর্ধর্ষ জীবনের সার্কাস দেখিয়ে, পিস্তলে গুলি রাখত বোঝাই করে, আর খ্যাতি অর্জন করেছিল এক বিরাট বীর, বিরাট শিকারী আর বিরাট মিথ্যাবাদী হিসেবে—যে-কোন পেশাদার কসাই থেকে তার পার্থক্য ছিল এটুকুই।

সে যাই হোক, সমতল অঞ্চলে যে লক্ষ লক্ষ বাইসন ঘুরে বেড়াত, বিল কোডি আর অন্যান্য মাংস-শিকারীদের জন্য বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি তাদের। বাইসনেরা ধ্বংস হয়েছে চামড়া-শিকারীদের হাতে, অবিশ্বাস্যভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই। চামড়া-শিকারীদের চাই শুধু চামড়া, চুলোয় যাক মাংস আর হাড়। মাটি থেকে তারা সোনা কুড়িয়ে নিতে এসেছিল। তারা নিংড়ে নিত মাটির ঐশ্বর্য, আর তাদের চলার পথে পথে রেখে যেত হত্যা আর ধ্বংসের লীলাচিহ্ন। ভারি চাকাওয়ালা বিরাট বিরাট গাড়ি নিয়ে তারা চলত বাইসনের পালের পিছনে পিছনে, আর বাইসন-মারা বন্দুক দিয়ে মেরে চলত তো চলতই একটানা একভাবে। চারজন আর দু'জন করে কাজ করত তারা, দু'জনে মেরে যেত, চামড়া ছাড়াত চারজনে। চামড়া ছাড়ানোটা যেন একটা বিজ্ঞান, পেটটা ছাড়িয়ে নাও, পা ছাড়িয়ে দাও, মাংস থেকে চামড়া খুলে নাও তারপর। সাত মিনিটে চামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারত যে-কোন পাকা লোক; চামড়াগুলো কাঁচা কাঁচাই গাদা দিয়ে রাখত বিরাট বিরাট গাড়িতে।

ষাট সালের পরেকার সমৃদ্ধির যুগে চমৎকার ব্যবসা ছিল চামড়া-শিকার। তৈরি হয়েছিল অনেকগুলো কোম্পানি, বাইসন মারার জন্য ছিল পাকাপোক্ত লোকজন, চামড়া ছাড়ানোর জন্য ছিল আরও পাকাপোক্ত লোক। চল্লিশ, ষাট অথবা একশোটা

গাড়ি নিয়ে তারা চলত বাইসনের পালের পিছনে পিছনে, আর সকাল দুপুর, রাত-ভর গর্জন করে চলত তাদের বন্দুকগুলো। পচা মাংসের কটুগন্ধ ভেসে বেড়াত মাইলের পর মাইল জুড়ে সমতলের বুকে ; গণ্ডেপিণ্ডে গিলে এমন কি নেকড়েগুলোও এক সময় ছুঁতে চাইত না মাংস। এমন হত্যাকাণ্ড আগে কোনদিন দেখেনি আমেরিকা; মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত লক্ষ লক্ষ মণ মাংস প্রখর রৌদ্রতাপে পচে নষ্ট হয়ে গেছে-মানুষের ইতিহাসেও এমনটি আগে কোনদিন ঘটেছে কিনা সন্দেহ। সংখ্যায় অবিশ্বাস্য রকমের অপর্যাপ্ত হলেও বাইসনেরা কিন্তু টিকে থাকতে পারল না এ ধরনের হত্যা-কাণ্ডের সামনে। মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত যখন প্রথম বাঁধা পড়ল রেললাইনে, সে সময় কখনো কখনো বাইসনের পালের রাস্তা পেরুনোর সময় একটা গোটা দিনই দাঁড় করিয়ে রাখতে হত রেলগাড়িকে। পাঁচ বছর পরেই সেই বাইসন হয়ে উঠল দুর্লভ ; দশ বছর পরে প্রায় লোপ পেয়ে গেল তাদের অস্তিত্ব, স্মৃতিটুকু শুধু বেঁচে রইল শাদা ধবধবে লক্ষ লক্ষ কঙ্কালাস্থিতে।

শাদা মানুষের অনেক অনেক অপরাধের মধ্যে এই অপরাধটিই ইণ্ডিয়ানদের কাছে ছিল সবচেয়ে দুর্বোধ্য ; সবচেয়ে কঠোর আর মর্মান্তিকভাবে লেগেছিল এরই আঘাত। স্মরণাতীত কাল থেকে সমতলের বুকে বাইসনই ছিল তাদের জীবন ; মাংস থেকে পেত খাবার, চামড়া থেকে হত কাপড়, পোশাক-আশাক, 'টিপি' আর বর্ম ; হাড় দিয়ে তৈরি হত অস্ত্রশস্ত্র, সুঁচ ; দাঁতে হত গহনা, আঁত দিয়ে দড়িদাড়া, নাড়িভুঁড়ি দিয়ে পাত্র ও আবরণ, খুর দিয়ে আঠা ; এমনকি ফেলা যেত যা, সেই গোবরটুকুও ছিল মূল্যবান জ্বালানি ; সেই গোবরের ঘুঁটের আগুন জ্বলত উষ্ণ স্তিমিত শিখায়। ফেলা যেত না কিছুই, এই যাযাবর দলের কাছে কাজে লাগত বাইসনের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও। যতটুকু কাজে লাগত সেই মতই মারত তারা, আর বাইসনকে মনে করত তাদের জীবন-ধারণের চিরন্তন উপকরণ।

চামড়া-শিকারের পর্ব যতই চূড়ান্ত অবস্থায় উঠতে লাগল, যতই ইণ্ডিয়ানরা দেখতে লাগল শেষ হয়ে আসছে বাইসনের পাল, সমতল অঞ্চল আকীর্ণ হয়ে উঠেছে ফেলে-দেওয়া মাংসের স্তূপে, ততই শিকারীদের বিরুদ্ধে তাদের মনে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল প্রায় এক উন্মত্ত ঘৃণা। তারা বুঝতেই পারত না, কি কারণে এই মানুষেরা ধ্বংস করছে তাদের, ধ্বংস করছে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি। মাংস শিকারের অর্থ বুঝতে পারত তারা, কিন্তু নিঃশেষে ধ্বংস করা, নিঃশেষে অপচয় করা—সে তো জঘন্যতম অপরাধ। কারণ, সমতলের ইণ্ডিয়ানদের যা কিছু ছিল, সবই তো চলে গেল বাইসনের সঙ্গে সঙ্গে।

ডজ কেল্লার লোকজনের কাছে যে গল্পটা বলল চামড়া-শিকারীরা তার পটভূমিকা এই। সংখ্যায় তারা ছ'জন, মুখে দাড়ি, নোংরা পোশাক, যে ব্যবসা করে তারই বোটকা-গন্ধ গায়ে, দৃষ্টিশোভন নয় মোটেই। তামাক চেয়ে নিয়ে চিবুতে লাগল তারা, থুথু ফেলে বলে চলল গল্পটা।

দুটো গাড়ি নিয়ে তারা ঘুরছিল আরকানসাস নদী থেকে উত্তর দিকে। আগের দিনের মত নেই আর আজকাল; ফুরিয়ে গেছে সব শিকার। একটা বাইসনের পাল খুঁজে পেতে হলে আঁতিপাঁতি করতে হবে গোটা অঞ্চলটা যদি পাওয়া যায়, তাহলেও ত্রিশ, চল্লিশ কি পঞ্চাশটি মাদী মাত্র। বাইসন শিকার করে কি কেউ কখনো বড়লোক হয়েছে। বড় বড় কোম্পানিগুলো তো ছেড়েই দিয়েছে ওসব; এতে দামটা ওঠে শুধু গুলিবারুদের, হয়ত বা ডজ শহরে একটা রাত কাটানোর খরচ।

এবারে কিন্তু ভাগ্যটা ভাল ছিল তাদের। পনি ফর্কের দক্ষিণে পেয়ে গেল একটা দল। ম্যাকক্যাবে আর ওয়ার্ড, এই দু'জন চলছিল বৃত্তাকারে, খুঁজে বেড়াচ্ছিল জন্তুগুলোকে, তারাই দেখতে পেল দলটাকে; তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল পিছনে ক্যাম্পের দিকে, পাগলের মত গুলি ছুঁড়তে লাগল তারা, চিৎকার করতে লাগল গলা ফাটিয়ে। তাতেই অন্য চারজন গাড়ি জুতে নিয়ে সময় পেয়ে গেল দলটাকে আটকাবার। একটাও পালাতে পারল না দল থেকে; সবসুদ্ধ সতেরটা মাদী আর একটা ষাঁড়, সব কটাকেই মারতে পারল তারা। শিকারটা হল বড় রকমের; তখনকার দিনের পক্ষে সত্যিই ভাল রকমের শিকার, ভাগ্যটা প্রসন্নই। আর গুলিও ছোঁড়া হয়েছে ভালভাবে তাক করে করে, সব কটা জানোয়ারই পড়ে গেল আধমাইলের কম ব্যাসার্ধের মধ্যে বৃত্তাকারে।

এক কোয়ার্ট হুইস্কি গিলে ফেলল তারা এরই ফলে, তারপর বন্দুকগুলোয় গুলি না ভরেই তারা ছাড়িয়ে ফেলল চামড়াগুলো। তাদের সঙ্গে ছিল প্রচুর পরিমাণে ময়দা আর শুয়োরের মাংস; প্রায় সমস্ত চামড়া-শিকারীদের মতই তাদেরও বাইসনের মাংসের উপর বিতৃষ্ণা, তাই শুধুমাত্র দুটো জিভ কেটে নিল তারা, মড়াগুলোকে সরানো পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করল না।

ইণ্ডিয়ানদের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তারা; তারা যতদূর জানত, কোন ইণ্ডিয়ানই নেই শখানেক মাইলের মধ্যে। তারা ঘুঁটে দিয়ে আগুন জ্বেলে জিভ দুটো ঝলসাতে দিল মৃদু আঁচে, ময়দা মেখে টকটক স্বাদ করার জন্য রেখে দিল রোদের তাপে। তখন বিকেল প্রায় তিনটে গড়িয়ে গেছে। আগুনের ধারে শুয়ে তামাক টানতে টানতে আরও এক বোতল হুইস্কি উড়িয়ে দিল তারা। গল্পগুজব চলতে লাগল এটা ওটা নিয়ে, বেশিটুকুই তাদের সুপ্রসন্ন ভাগ্য সম্পর্কে; ইণ্ডিয়ানদের প্রসঙ্গ কিন্তু একেবারেই ছিল না তার মধ্যে। তখন পর্যন্ত ভাবেইনি তারা ইণ্ডিয়ানদের কথা—এমনকি যখন ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এল তখনও পর্যন্ত নয়। খুরের আওয়াজ শুনে যদি কিছু ভেবেও থাকে, তাহলে ভেবেছে, হয়ত মাঠ থেকে ফিরছে কোন গোলাবাড়ির রাখাল।

তারপর, ইণ্ডিয়ানরা যখন এসে হাজির হল ঢিবিটার ওপার থেকে, হলদে ঘাসের ভিতর দিয়ে ভেঙে পড়ল বিচূর্ণ ফেনার মত—তিনশোজনের একটা গোষ্ঠী পুরুষ-

মেয়ে-শিশুর দল—শিকারীরা তখন হাত বাড়াল বন্দুক আঁকড়ে ধরার জন্য, গুলি পুরে নিয়ে যা হোক একটা কিছু করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল তারা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত। তাদের উপর দিয়ে, তাদের চারপাশ দিয়ে যেন আছড়ে পড়ল বন্যার জল। হাত থেকে যখন বন্দুক ছিনিয়ে নিল তখন দাঁড়িয়ে রইল অসহায়ের মত, তোলপাড় করতে লাগল যেন জল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামতে লাগল যোদ্ধারা, ছুটোছুটি করতে লাগল শিশুরা, আঁকড়ে ধরে রইল পুরুষদের ছু'পায়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে, একটু দেখবার জন্য চাপাচাপি করে এগিয়ে আসতে লাগল মেয়েরা, ঘাবড়ে গিয়ে মাটিতে পা আছড়াতে লাগল ঘোড়াগুলো, ডাকতে শুরু করে দিল কুকুরের পাল।

ধাক্কাধাক্কি-করা মারমুখো জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল ছ'জন শিকারী। বিরাট বপু, জড় গোছের, বোকাসোকা মানুষ এণ্ডারসন, শী-এন ভাষা কিছুটা বোঝে সে; কিছুটা বোঝে ম্যাকক্যাবেও, একসময় তার একটা দোকান ছিল, ব্যবসা করত আরাপাহোদের সঙ্গে। জীবনে অন্য যে কোনও সময়ের চেয়ে সেই কয়েকটি উৎকণ্ঠিত মুহূর্তেই তারা যে মৃত্যুর সবচেয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, এতে সন্দেহ ছিল না তাদের ছু'জনেরই। চামড়া ছাড়ানো আঠারটা মরা বাইসন চারধারে ছড়িয়ে, নীরব সাক্ষী তারাই, তার সঙ্গে রয়েছে চামড়া-বোঝাই গাড়িখানা। ইণ্ডিয়ানরা জীর্ণশীর্ণ, অনাহারক্লিষ্ট, কঙ্কালসার; বাঁধ ভাঙলে যেমন করে জল আসে তোড়ে, তেমনি করে ভেঙে পড়ল তাদের ক্রোধ। সার্ট ছিঁড়ে ফেলল এণ্ডারসনের, চামড়া খিমচে দিল মেয়েরা, অন্যদেরও হাল হল একই ধরনের। গালাগাল দিতে দিতে পা কামড়ে দিল ছেলেপুলেরা। অবশেষে পুরুষেরা যখন তাদের চারপাশে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াল, জোর করে হটিয়ে দিল নারী আর শিশুদের, শিকারীরা তখন ভাবল, সাময়িক দয়া দেখানো হচ্ছে তাদের, এ হয়ত কোন ভয়াবহ ধরনের অত্যাচারের ভূমিকা মাত্র।

একটু নেশা হয়েছিল ওয়ার্ডের, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি গুলিয়ে গেল তার। কাঁদতে শুরু করল শিশুর মত। এণ্ডারসন তাকে বলল, 'মর্ হতভাগা, চুপ কর্।'

পরে ম্যাকক্যাবে বলেছিল, এতে ব্যাপারটা খারাপই করে ফেলেছিল ওয়ার্ড, হাসছিল ইণ্ডিয়ানরা, হয় অবজ্ঞায়, নয়ত মজা দেখে। তারা ইংরেজি বুঝছিল কিনা তা বোঝা যায়নি। কাকুতি মিনতি করতে শুরু করেছিল ওয়ার্ড, কিন্তু সে যা বলছিল তার কিছুই যে ওরা বুঝছিল তা মনে হয়নি, অথবা তারা বুঝতেও চায়নি হয়ত।

পুরুষেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের ঘিরে, এবারে তারা চাপ দিল পিছনে, ফাঁকা হয়ে গেল সামনের গোল জায়গাটা, শুধু মাঝখানে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল শিকারী ছ'জন। মেয়েরা যখন বুঝতে পারল এবারে পুরুষেরা তাদের নিজেদের মত কাজ করবে, তখনই তারা সরে গিয়ে শুরু করল মাংস কাটতে।

—'খুবই খিদে পেয়েছিল ওদের বোধহয়,' ম্যাকক্যাবে বলল। 'বোধহয় উপোস করে ছিল অনেক দিন।'

মাংসের দিকে ছুটে যাবার ধরন দেখে তো তাই মনে হল। গাড়িটা ভেঙে জ্বালানি করে নিল তারা, মাংস ঝলসাতে দিল পাতলা পাতলা টুকরো করে, যাতে কাজ সারা হয় তাড়াতাড়ি। প্রথমে এল শিশুরা, চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার সময় অব্যক্ত এক আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল তাদের গলা থেকে। অনেক উপোস করলেই তবে খাওয়াটা এমন যন্ত্রণাকাতর হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে ব্যাপারটা আয়ত্তে এনে ফেলল সর্দাররা। ডজ কেল্লায় বসে গল্প বলবার সময় ক্ষুদে নেকড়ের বর্ণনা দিতে লাগল ম্যাকক্যাবে। 'লোকটা লম্বা নয় খুব।' শী-এন সর্দারের লম্বা চেহারাটা যে ছাপ ফেলেছিল তাই মনে করবার চেষ্টা করে বলল সে, 'লম্বা নয় খুব। কিন্তু কমই দেখা যায় ও ধরনের—খুবই কম। তখন আমার মনে হল না যে কোনরকম যন্ত্রণা দেবে ওরা আমায়। মরতে হবে এটাই মনে হল, যন্ত্রণার কথা মনে হল না।'

সামনে এগিয়ে এল 'ক্ষুদে-নেকড়ে', তার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই, যেন তাকিয়ে আছে তাদের বাপের দিকে। কিন্তু আরও একজন বুড়ো ছিল সেখানে, 'বুড়ো থুথ্‌ড়ে, শুকনো আপেলের মত,' ম্যাকক্যাবে বলল। 'ক্ষুদে-নেকড়ে ঠিক তার পাশেই দাঁড় করিয়ে রাখল তাকে, যেন বুড়োটা 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র বাপ।

—'বুড়োটা হয়ত 'ভোঁতা-ছুরি'।' সায় দিয়ে বলল ম্যাকক্যাবে। ও যে বড় গোছের সর্দার, তাতে ভুল নেই। সবাই যেভাবে 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র নাম ধরে কথা বলছিল, সেভাবে তার নাম করে কিন্তু বলল না কেউ। মনে হয় ওই বুড়োই 'ভোঁতা-ছুরি'।'

খুব দ্রুত আর উত্তেজিত হয়ে না বললেও তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না ম্যাকক্যাবে। ওদের কথায় পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর তিক্ততা। এণ্ডারসনও সে কথাই সমর্থন করল—বাকি কেউ বোঝে না শী-এন ভাষা। যারা বোঝে না তারা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল বসে বসে। কিন্তু টুকরো-টাকরা যে দু-একটা কথা কানে যেতে লাগল তাতেই ম্যাকক্যাবে আর এণ্ডারসনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল পরিণতির চেহারাটা।

ধীরস্থির ঘৃণা জোয়ানদের মধ্যে, ইণ্ডিয়ানদের কাছে যে ধরনের আশা করা যায়, সে রকমের উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল ঘৃণা নয়—সংযত সংকল্পকঠিন এ ঘৃণা। শিকারীরা শুধু জানে যে, ঢিবিটার ওপার থেকে এসেছে এই ইণ্ডিয়ানরা, একটা দল, একটা গোটা গ্রাম চলেছে এখান থেকে ওখানে 'টিপি'গুলো সঙ্গে নিয়ে। এর বেশি কিছুই জানে না তারা। কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে, ছ'জনের কেউ-ই কিন্তু কিছুই জানে না তার।

তাদের ধরে রাখল সর্দাররা, কেন যে রাখল তাও জানে না এণ্ডারসন, জানে না ম্যাকক্যাবেও। কিন্তু জ্যান্তই ফিরে এল তারা, তাই বলতে পারল ডজ কেল্লায় এসে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। 'ক্ষুদে-নেকড়ে' যার নাম, সেই বুড়ো সর্দারটা বার করল

তার পাইপ, কড়া তামাক ঠেসে নিয়ে এগিয়ে গেল আগুনের কাছে কয়লার টুকরোর জন্য, ফিরে এল পাইপ টানতে টানতে। এমনি পাইপ টানতে টানতে চক্রের ভিতরে যতক্ষণ ঘুরে বেড়াবে বুড়ো সর্দার 'কুকুর-সেনা' আর তাদের শিকারের মধ্যে তার অদ্ভুত উপস্থিতির প্রাচীর তুলে, ততক্ষণ যে বেঁচে থাকতে পারবে, এটা বুঝতে পারল ছ'জনই, এমনকি বুঝতে পারল ওয়ার্ডও।

পাইপটা অদ্ভুত। 'ভুট্টার ডাঁটার তৈরি,' ম্যাকক্যাবে বলল, 'বুনোরা যে বিশ্রী ধরনের জিনিস ব্যবহার করে এ তা নয় কিন্তু, দশ-সেণ্ট দামের হবে।'

উদ্‌গ্রীব চিন্তিতমুখে তামাক টানতে লাগল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'। উৎকণ্ঠার ছাপ পড়তে লাগল, খাঁজ ফুটে ফুটে উঠতে লাগল তার বড়সড় মুখখানায়। উত্তেজিত সাঙ্গোপাঙ্গদের প্রতিহিংসা-চিৎকারে বিচলিত না হয়ে তামাক টানতে টানতে সে পায়চারি করে চলল তার ছেঁড়া কাঁথার ভাঁজে ভাঁজে ছ'জনের প্রাণটাকে বেঁধে নিয়ে। সবার দাবি মৃত্যু। চক্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে খিদের চোটে আধ-পোড়া মাংস চিবুতে লাগল সবাই, মৃত্যু দাবি করতে লাগল মাংস কামড়ে ছিঁড়ে নেবার ফাঁকে ফাঁকে। লক্ষ লক্ষ, লক্ষ লক্ষেরও বেশি বাইসন কেমন করে লোপাট হয়ে গেছে সমতলের প্রান্তর থেকে বারবার বলতে লাগল সেই কথা—

এদের মত লোকের জন্যই, এসব চামড়া-শিকারীদের জন্যই।

কোন্ ধরনের প্রতিপত্তি ছিল বুড়ো সর্দারের তা বুঝে উঠতে পারেনি ম্যাকক্যাবে। সে বলল, 'ওর মত লোক কমই দেখা যায়।'

তার কারণ, মৃত্যু আর ছ'জন শিকারীর মধ্যে প্রাচীর তুলে রেখেছিল সে—তার কারণ, নিষ্ক্রিয় হলেও ইস্পাতকঠিন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের ক্ষমতা ছিল তার—কেউ তাকে অতিক্রম করে যাবে তা সহ্য করে না সে মানুষ। এ সম্পর্কে সকলেই একমত, জোয়ানরা ভয় পেল সর্দারকে অমান্য করতে, সাধারণ কোন ভয়ে নয় কিন্তু, অন্য এক ধরনের সেটা।

—'কমই দেখা যায় ও ধরনের।' বারবার বলতে লাগল ম্যাকক্যাবে, যেন ওই একটি কথাতেই বলা হয়ে যায় সব-কিছু। ডজ কেল্লায় বসে শুনতে শুনতে অফিসাররা বলল, 'কড়া দাওয়াই ওই ক্ষুদে নেকড়েটা—বড় কড়া।'

দাবি, গালাগাল আর কঠিন-কঠোর ক্রোধের ঝড় বয়ে গেল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র উপর দিয়ে, কিন্তু যতক্ষণ না তার তামাক ফুরিয়ে গেল, যতক্ষণ না ভাবা শেষ হল তার, ততক্ষণ উপেক্ষা করে গেল সব-কিছুই। তারপর পাইপটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কালো ছোপ-ধরা পাইপের ডাঁটিটা উঁচিয়ে ধরল শিকারীদের দিকে, কথা বলতে শুরু করল সে। চারধার নিস্তব্ধ হয়ে গেল তখন, এমন কি নারী আর শিশুরা দাঁড়িয়ে গেল কাছ ঘেঁষে, সসম্ভ্রমে শুনতে লাগল 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র কথা। সেই কথার তোড়ের অর্থ বোঝা যে কোন শাদা মানুষের পক্ষেই কঠিন। শী-এন ভাষায় একটি শব্দ একটি শব্দই, কিন্তু একটি গোটা বাক্যও একটি শব্দ; আর দশটি বাক্য বেরিয়ে আসতে পারে জলের

স্রোতের মত, সব শব্দ একসঙ্গে মিলে। সে ভাষা অদ্ভুত, তরঙ্গময়, গানের সুরে বাঁধা, আদিম ভাষার স্পষ্টতা, অস্পষ্টতা, বৈচিত্র্য আর জটিলতা, সমস্ত কিছুই আছে তাতে। তাই 'ক্ষুদে-নেকড়ে' যা বলল তার অতি সামান্যই বুঝতে পারল ম্যাকক্যাবে, এণ্ডারসন বুঝল আরও কম। অন্য সবাই অপেক্ষা করতে লাগল মৃত্যুর জন্য।

'ভীষণ মদের তেষ্টা পেলে যেমন হয়, তেমনিভাবেই শুনছিলাম আমি।' কেল্লায় যারা বসে বসে শুনছিল তাদের বলল ম্যাকক্যাবে। 'একটু মদ খাওয়াতে পার কেউ?' মদ দেওয়া হল তাকে; মুখটা মুছে নিয়ে সে বলল, 'সর্দারের বক্তব্য ছিল ন্যায় বিচার সম্পর্কে।'

—'ওর কথাই যদি না বুঝে থাক, তাহলে কি করে বুঝলে তা?' ওরা জিজ্ঞাসা করল তাকে।

—'কথা আমি বুঝতে পারিনি,' স্বীকার করল ম্যাকক্যাবে। 'কুকুর-সেনা'র কথা বুঝতে হলে দো-আঁশলা হওয়া চাই। কিন্তু কথার ঢংটা ধরতে পেরেছিলাম আমি—'

কিন্তু ম্যাকক্যাবে বুঝতে পারেনি, সেই মৃত্যুর চক্রের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল যে ছ'জন শিকারী—কেউই বুঝতে পারেনি তাদের; কোথা থেকে এল এই ইণ্ডিয়ানরা, কি করেই বা এল, চলেছেই বা কোথায়। কিছুটা অনুমান করে নিল তারা, কিন্তু অনুমান করল শুধুই বস্তুনিরপেক্ষ ন্যায়ের অথবা অন্যায়ের বোধটুকু—এক জন-গোষ্ঠি, একটা জাতি, মানুষের আকারে যারা ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীতে তাদেরই এক ভগ্নাংশ, প্রতিকূল শক্তির হাতে বিধ্বস্ত, বেষ্টিত, বন্যজন্তুর মত তাড়িত এক জন-গোষ্ঠি যাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারবোধই তাদের মৃত্যু, তাদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ।

আর এখানে সেই মানুষদের মধ্যে ক্রোধে উত্তেজিত, লোলুপ দেহের বূ্যহের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছ'জন অসহায়, অপরিচ্ছন্ন চামড়া-শিকারী।

একে একে চলে যেতে শুরু করল কুকুর-সেনারা। মুখে তাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের স্থির প্রতিচ্ছবি। বলা শেষ করল 'ক্ষুদে-নেকড়ে', দাঁড়িয়ে রইল সে মাটির দিকে তাকিয়ে, প্রস্তর-কঠিন শক্তির অনেকখানি যেন ব্যয় হয়ে গেল তার। শিকারীদের আস্তে আস্তে বলল সে শী-এন ভাষায়, 'চলে যাও এখান থেকে—'

ফাঁক হয়ে গেল চক্রটা; না বুঝেই ছুটল ছ'জন শিকারী, ভাবল এটা হয়ত ইণ্ডিয়ান-ধরনের, কুকুর-সেনাদের নিজস্ব ধরনের কোন অত্যাচারের সূচনা মাত্র। পাগলের মত ছুটল তারা, হাতুড়ি পিটতে লাগল হৃৎপিণ্ডে, দম আটকে এল; ফুরিয়ে গেল ছোটার শক্তি, হাঁটল খানিক দূর, তারপর ছুটল আবার। কিন্তু মুক্ত তারা, তারা স্বাধীন।

ডজ কেল্লায় বসে তারা যে গল্পটা বলে গেল, তা এই।

আর-এক গল্প বললেন শেরম্যান সাংবাদিকদের কাছে; ওয়াশিংটনের বাড়ির

মাটির তলার অফিসঘরে জড় হয়েছিল সাংবাদিকরা। শেরম্যানের বয়স আটান্ন, প্রাণপূর্ণ কার্যক্ষম এক জীবন্ত উপকথা তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তেজিত হয়ে উঠলে প্রায়ই চেয়ার ছেড়ে উঠে দুমদাম করে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করেন তিনি স্থবির সিংহের মত। সাংবাদিকেরা বলে, 'কুচকাওয়াজ করছেন তিনি জর্জিয়ার ভিতর দিয়ে,' হেসেই বলে সে কথা, কোনরকম অশ্রদ্ধা থাকে না তাতে। হাসার কোন কারণ নেই দেশের প্রতি শেরম্যানের টান দেখে, এই দেশের জন্যই লড়াই করেছেন তিনি, কেটে দু টুকরো করেছেন যাতে টিকে থাকতে পারে এ দেশ, এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছেন যে সম্ভবত সে ক্ষত কাঁচাই থেকে যেত চিরকাল ; তবু শুকিয়েও গেল সে ক্ষত। শেরম্যান লোকটা খাঁটি ; কল্পনাশক্তি আর প্রতিভা তাঁর কম ; কিন্তু লোক তিনি খাঁটি।

তাই সাংবাদিকরা যখন জড় হয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, উত্তর চাইতে লাগলেন, 'এ যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার মতামত কি, জেনারেল ?' তিনি উত্তর দিলেন, সরল অকপট উত্তর, বললেন : 'এ ধরনের কথাবার্তা বলে ভালর চেয়ে মন্দই করেন আপনারা।'

—'কিন্তু, জেনারেল যুদ্ধ তো শুরু হয়েছে কানসাসে ?'

—'যুদ্ধ ? কখনোই না !'

—'কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা আক্রমণ করছে, এ তো ঠিকই। প্রতি ঘণ্টায় খবর আসছে, খবর আসছে ডজ থেকে, আসছে কোল্ডওয়াটার, গ্রীনস্‌বার্গ, মেডিসিন লজ আর প্রাট থেকে। আমাদের হিসাবে খুন হয়েছে আশিজন বে-সামরিক লোক, ধ্বংস হয়েছে বারটা রাঞ্চ-বাড়ি, রাজ্যের সর্বত্র লড়াই করছে সৈন্যরা, যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইণ্ডিয়ানরা।'

তখন উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল, পায়চারি করে বেড়ালেন ক্রুদ্ধ হয়ে, সাংবাদিকদের বললেন, 'জেনে রাখুন আপনারা, যুদ্ধ এটা নয়, বিদ্রোহের সম্মান পেতে পারে এমন ব্যাপারও কিছু নয়। একে যুদ্ধ বলবেন না আপনারা। খুন জখম করে বেড়াচ্ছে এই বুনো বর্বরেরা, কথা দিচ্ছি আপনাদের, প্রতিশোধ নেওয়া হবে প্রতিটি খুনের। ইণ্ডিয়ানদের এই হচ্ছে শেষ আক্রমণ, আর সহ্য করতে হবে না দেশকে—'

তারপর সাংবাদিকরা চলে গেলে নির্দেশনামা লিখতে বসলেন শেরম্যান, সমতলের সমস্ত ফৌজের ভার দিলেন তিনি জেনারেল জর্জ ক্রুকের হাতে, নির্দেশ রইল খতম করতে হবে শী-এনদের, যেমন করে খতম করে লোকে ক্ষ্যাপা হন্যে নেকড়েকে।

জেনারেল পোপের উপরওয়ালার পদ পেলেন ক্রুক ; ইণ্ডিয়ান-লড়িয়ে তিনি, কিভাবে এগুতে হবে এ সম্পর্কে কোন ভুল ধারণার অবকাশই ছিল না তাঁর। আগেও তিনি লড়েছেন শী-এনদের সঙ্গে, লড়েছেন শী-এনদের দেশে উইওমিঙে, পাউডার নদীর ধারে, ব্ল্যাক হিলে, লড়েছেন সমতল অঞ্চলে। সমতলের ইণ্ডিয়ানদের চেনেন তিনি, শখানেক পদাতিক অথবা দুই কি তিন কোম্পানি ঘোড়সোয়ার নিয়ে একশো শী-এন

'কুকুর-সেনা'র বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে সামরিক কৌশলের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত তা মনে করবার মত ভুল তিনি করলেন না। এমন ধরনের ব্যাপারে যেখানে গৌরব সামান্যই, সেখানে গৌরব চান না, তিনি চান কাজের ফল, চান লভ্য শিকার, তাঁর পরিশ্রমের পুরস্কার। যাতে প্রধান সেনাপতিকে তিনি লিখতে পারেন মামুলি ধরনে: 'যেমন নির্দেশ ছিল তেমন-ভাবেই আমি পাকড়াও করেছি 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র দলবলকে; হাতকড়া দিয়ে পাহারা-সমেত দক্ষিণে পাঠাচ্ছি তাদের।'

তাই মানচিত্রের উপর এক বৃত্ত আঁকলেন ক্রুক। কানসাস আর নেবরাস্কার ভিতর দিয়ে চলে গেল সেই বৃত্তরেখা, কোলোরোডোর কিছুটা অংশও পড়ে গেল তার ভিতরে; সেই বৃত্তের ভিতরে ধূ-ধূ বিস্তৃত প্রান্তরে, নদী, পাহাড়, খাল-খন্দ, ঘাস আর বালির কোন এক জায়গায় রয়েছে শী-এনরা, সম্ভবত আছে বৃত্তের মাঝখানেই, খুব বেশি দূরে নিশ্চয়ই নয়। বৃত্তের বাইরে চলে যেতে বেশ কয়েকদিন, বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে তাদের। তাই এক্ষেত্রে কোন দরকার নেই তাড়াহুড়ো করার, দরকার শুধু আঁটঘাট বেঁধে গুছিয়ে কাজ করার।

আঁটঘাট বেঁধে কাজ করা শুরু হল তাঁর সৈন্য সামন্তের হিসাব নেওয়া থেকে। বিরাট বৃত্তের মধ্যে, নয়ত ঠিক ধারেই তাঁর অধীনে আছে সর্বসমেত বার হাজার সৈন্য। বৃত্তের কেন্দ্র লক্ষ্য করে সতর্কভাবে কয়েকটা তীর আঁকলেন জেনারেল ক্রুক, তারপর টুকরো টুকরো কাগজে তীরগুলোর অর্থ পরিষ্কারভাবে তর্জমা করে দিলেন শব্দ দিয়ে গেঁথে গেঁথে। সবুজ রঙের চোখ-ঢাকাওয়ালা লোকদের আঙুলের টরেটক্কায় সেই শব্দগুলো হয়ে উঠল বৈদ্যুতিক স্পন্দন, আর সেই স্পন্দন হয়ে দাঁড়াল সজীব সক্রিয়তা।

সেই সক্রিয়তার আলোড়ন জাগল উত্তরে রবিনসন কেল্লায়, সেখান থেকে তৃতীয় অশ্বারোহীর পাঁচটি দল ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে সার বেঁধে বেরিয়ে এল কাঠের গেট পেরিয়ে।

সেই সক্রিয়তার আলোড়ন জাগল ডাকোটা অঞ্চলের গভীর প্রান্তে, আলোড়ন জাগল মীডকেল্লায়, যেখানে বসে আছে সাত নম্বর অশ্বারোহীদল। এই সাত নম্বর অশ্বারোহীই কাস্টারের পুরনো রেজিমেন্ট, দু বছর আগে লিটল বিগহর্নে শোচনীয়ভাবে পরজিত হয়েছিল এই রেজিমেন্টই। দুশোজন নিখোঁজ, পঁয়ষট্টিজন নিহত আর বাহান্নজন আহত—এ স্মৃতি মুছবার নয় দু বছরে। সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের উপরে স্বয়ং কাস্টারের নির্মম ব্যবহারের প্রতিশোধেই ঘটেছিল কাস্টার-হত্যাকাণ্ড, সু আর শী-এনরা জ্যান্ত ছেড়ে দিয়েছিল কাস্টারকে, যাতে তারা শোধবোধ করে দিতে পারে পুরনো দিনের হিসাবনিকাশ, অবশেষে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল কাস্টারকে। সাত নম্বর রেজিমেণ্টের কাছে এই স্মৃতি সতর্কভাবে লালিত প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। তাই যখন মীড দুর্গ থেকে তাদের দশটা কোম্পানি ছুটল দক্ষিণে, তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাতে লাগল তিনশো শী-এনের খোঁজে। শোধবোধ করে দেবে তারা, বন্দী করবে না কাউকেও।

নেবরাস্কার সিডনি শহরে মেজর থর্নবার্গ খোলা গাড়িতে চড়ালেন তাঁর লোক-জনকে। একটা কামানও তুলে নিলেন গাড়িতে।

কর্নেল লুইস তাঁর লোকজন নিয়ে চললেন দক্ষিণ-পুবে, ওয়ালেস দুর্গ আর ডজ শহরের মধ্যেকার সোজা পথে। ক্রুকের পরিকল্পনা সোজাসুজি ইণ্ডিয়ানদের উপর আক্রমণ নয়, শক্তি সমাবেশ করে চক্রাকারে তাদের চেপে ধরা। এক্ষেত্রে উনিশ নম্বর পদাতিক বাহিনী হবে অনেকগুলো বেড়ের পশ্চিম প্রান্তের ভাঁজ, বাধার চেয়ে তারা বেষ্টনীর কাজ করিবে বেশি। লুইস, এমন কি ক্রুকও সন্দেহ করেছিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশ মাইল পুবে আছে শী-এনরা এবং আছে নিশ্চিন্তভাবে একেবারে দক্ষিণ কোণে। তা সত্ত্বেও, লুইস সঙ্গে নিলেন ছজন পনি স্কাউটকে, দলের আগে আগে তাদের পাঠিয়ে দিলেন টহলদার হিসেবে।

পদাতিকের সঙ্গে চলল ছোট একটা অশ্বারোহী দল, তাদের আর অফিসারদের মত পনি ক জনও ঘোড়ার পিঠে। সর্পিল রেখায় তৃণপ্রান্তরে ঢেউ তুলে তুলে চারজন চারজন করে কুচকাওয়াজ করে চলল সবাই। সঙ্গে আরও আটটা রসদের গাড়ি জুড়ে দেওয়ায় সামান্য একটু সহজ হয়ে উঠল তাদের গতি। সৈন্যদের শুধু বন্দুকটাই বইতে হবে। অবস্থা যদি ভাল থাকে, তাহলে দিনে দিনেই তারা চলে যেতে পারবে তিরিশ মাইল। সব-কিছু মিলিয়ে ভাল একটা ছোটখাট ফৌজ, আর তারা যদি ইণ্ডিয়ানদের আটকাতে পারে, তাহলে ব্যাপারটা কি রকম হবে তার জন্য দুশ্চিন্তা ছিল না কর্নেল লুইসের।

কিন্তু অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তা অনেক বেশি; তাঁর বলিরেখাঙ্কিত ভ্রূ দুটোতে আড়াল পড়ে যায় ছোটখাট দুশ্চিন্তাগুলো। সেই ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠে অস্বস্তির সৃষ্টি করতে লাগল বার বার, চিঠি লেখা হয়নি তাঁর বোনকে। এ ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার তিনি, তাঁর চিঠি যায় নিয়মিত, চুলচেরা হিসেব করে। আজ ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে ভুলে-যাওয়া চিঠিখানার খসড়া করতে লাগলেন তিনি মনে মনে, বোঝাতে লাগলেন তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতা, মেজর ক্লেয়ারের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, সমতলের ফৌজিদলের ছোটখাট ঈর্ষাবিদ্বেষ, নিরাপত্তার অভাব, এখানকার ভয়ঙ্কর একঘেয়েমি—

কী একটা যেন হয়েছে তাঁর পিঠে, বর্শা বেঁধানোর মত একটা তীব্র বেদনা দেখা দিচ্ছে মেরুদণ্ডের নিচের দিকে। মনে মনে খসড়া-করা চিঠিতে এক বক্তৃতা জুড়ে দিলেন তিনি যকৃৎ ও কিডনির উপর; যে বেদনাদায়ক ভয় দেখা দিয়েছে তাঁর মনে সেটা বুঝতে পারবে তার বোন—ঘোড়ার পিঠেই বসে আছেন দুটো দিন, এরই মধ্যে ঘায়েল হয়ে পড়েছেন বেদনায়, ক্লান্ত হয়েছেন, বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন তিনি। বর্বরজনোচিত উন্মাদনা আর উত্তেজনা নিয়ে পড়ি কি মরি করে ফিরে আসছিল টহলদার পনি তিন-জন, তাদের দিকে তাকালেন তিনি অপ্রসন্ন মনে। ইণ্ডিয়ানদের পছন্দ করেন না তিনি, মানুষ তিনি খুঁতখুঁতে, মুখটা বিকৃত করে ফেললেন পনি স্কাউটদের একজনের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে।

ছেলেমানুষের মত একগাল হেসে তাঁর পাশে এসে তাঁরা ঘোড়ার রাশ টানতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

—'যিশুর দিব্যি, শালা 'কুকুর-সেনা'।'

মনে মনে ভাবলেন লুইস; সবচেয়ে আগে দিব্যি গালতে শেখে কেন এরা? বর্বরের মুখে ভগবানের নামে অর্থহীন দিব্যিগালার মধ্যে যেন একটা স্পষ্ট অশ্লীলতার গন্ধ পান তিনি।

সহজভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক বলেছ—ঠিক দেখেছ তোমরা?'

একগাল হেসে ঘাড় নাড়ল তারা; ভাঙা ইংরেজিতে যা বলল, তার অর্থ এই যে, কয়েক মাইল আগে ফ্যামিশ্‌ড্ উয়োম্যানস ফর্কের ধারে ট্রেঞ্চ কেটে ঘাঁটি গেড়েছে ইণ্ডিয়ানরা; ফ্যামিশ্‌ড উয়োম্যানস ফর্ক একটা ছোট ঝরনা, নামটা আগে কখনো শোনেননি লুইস। চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল পদাতিক দলের জনকয়েক কমাণ্ডার আর তাদের সঙ্গে অশ্বারোহী দলের ক্যাপ্টেন ফিটজিরাল্ড। অবাক হয়ে গেল তারা, বিশ্বাস করল না কেউ। পনি স্কাউটরা বর্ণনা দিল ট্রেঞ্চের। ফিটজিরাল্ড বলল, ইণ্ডিয়ানরা ট্রেঞ্চ কাটে, এমন কথা তারা আগে কখনো শোনেনি। অন্য সকলেও সায় দিল তার কথায়।

—'অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় ব্যাপারটা,' লুইস বললেন। 'তোমাদের লোকজন নিয়ে একবার দেখ, ভাল হবে সেটাই।' সত্যি বলতে কি, ট্রেঞ্চের কথা নয় শুধু, ওরা যে ইণ্ডিয়ান সে কথাই বিশ্বাস করলেন না লুইস, তাঁর অবিশ্বাস পনি স্কাউটদের উপর; তাঁর চোখে ওরা সেই ধরনের শিশুর মত যারা মনে মনে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বানাতে ওস্তাদ। ফিটজিরাল্ড আর তাঁর অশ্বারোহী-দল চলে যাবার পর আবার তিনি ফিরে গেলেন তাঁর নিজের চিন্তায়।

ফিটজিরাল্ড ফিরে এসে যখন খবর দিল তখন চমকে উঠলেন লুইস, বিমূঢ় হয়ে পড়লেন তিনি। ফিটজিরাল্ড বলল, সামনে সত্যিই একদল ইণ্ডিয়ান আছে; পনিদের কথাই ঠিক, ওরা ট্রেঞ্চ কেটেছে, বিশেষ কিছু তৎপরতা দেখা গেল না ওদের, কেউ বিশ্রাম করছে, রান্না করছে কেউ কেউ, কেউ বা বসে আছে ট্রেঞ্চের মুখে; একটা কি দুটো ঘোড়াসোয়ার পাহারা দিচ্ছে বাইরে।

—'উদ্বিগ্ন বলেও মনে হল না ওদের।' ফিটজিরাল্ড বলল। 'আমাদের দেখতে পেয়েও না। আমলই দিল না আমাদের—দাঁড়িয়ে রইল সব মাতব্বরের মত।'

—'কুকুর-সেনা ওরা?' অবিশ্বাসমাখা গলায় প্রশ্ন করলেন কর্নেল; মনের ভাবখানা হল জোচ্চোর লটারি খেলোয়াড়ের মত, যে নিজেই পেয়ে গেছে প্রাইজের টিকিটখানা।

—'তাইত বলছে পনিরা।'

—'বুঝে উঠতে পারছি না কিছুই, ডানা আছে নাকি ওদের। শেষ যে খবর শুনেছি, তাতে ওরা আছে ডজের পূর্বে। ট্রেঞ্চই বা খুঁড়তে যাবে কেন ওরা?' ক্লান্তকণ্ঠে

তিনি বললেন। 'আমরা গিয়ে পাকড়াও করব ওদের—গাড়ি বোঝাই করে পাঠিয়ে দেব ডজে সঙ্গে সঙ্গে।'

কোম্পানি কমাণ্ডাররা নির্দেশ দিতেই দীর্ঘ সারিটা ঘুরল ফ্যামিশ্‌ড্‌ উয়োম্যানস্‌ ফর্কের দিকে। ঘুমন্ত ভালুকের মধু-মাখানো মুখে যেমন করে ছড়িয়ে থাকে মৌমাছির দল, তেমনিভাবেই ছড়িয়ে পড়ল ঘোড়সোয়াররা। সুদূর পূর্বাঞ্চলের—সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, সুসভ্য পূর্বাঞ্চলের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একদল উচ্ছৃঙ্খল খুনে ইণ্ডিয়ানের কথা ভাবতে চেষ্টা করলেন লুইস। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে তাঁর যে মনোভাব জাগল, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিরক্তি, যেখানে আসা অনুচিত সেখানে কেন এল ওরা, কেন ওরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ল, তাঁর চিন্তায় বাধা দিয়ে কেন ওরা উচ্ছৃঙ্খলতার ঔদ্ধত্য দেখাল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর কাদামাখা হল্লাবাজ মাতাল সামনে পড়লে যেমন বিরক্তি হয় পুলিসের, তেমনি বিরক্তি জেগে উঠল তাঁর মনে।

পদাতিকদের তাড়াতাড়ি চলবার নির্দেশ দিলেন তিনি। জলাটার কাছে আসতেই লুইসের চোখে পড়ল একসারি অশ্বারোহী শী-এন, দাঁড়িয়ে আছে ফাঁক ফাঁক হয়ে, সবসুদ্ধ সম্ভবত জন-কুড়ি হবে, ঘোড়ার পিঠে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে, পাহারা দিচ্ছে ওরা। অস্তগামী আলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুখোস-পরা অভিনেতার দল। তাদের লক্ষ্য করে হাঁকডাক শুরু করে দিল পনি স্কাউটরা, উঁচাতে লাগল বন্দুকগুলো, একটুও নড়ল না কিন্তু শী-এনরা।

—'বলে দাও ওদের হাত মাথার উপরে তুলে চলে আসতে।' ফিটজিরাল্ডকে বললেন লুইস; আর তার মধ্যেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করলেন কোথায় ওদের ট্রেঞ্চ। ফিটজিরাল্ডের গলা শুনতে পেলেন তিনি, ফিটজিরাল্ড বলছে ভেবে ভেবে, একই শব্দ বারবার—ভাষার ব্যবধান দূর করবার চেষ্টায় একই কথা বলছে বারবার। হাঁকডাক করে তাদের দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল পনিরা। আক্রমণের জন্য ডবল-লাইনে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াল পদাতিকেরা। দীর্ঘ দেহ, ভাবাবেগহীন কালো কালো মুখ—শী-এনরা তখনো বসে রইল স্তব্ধ হয়ে, আর ধোঁয়া উঠতে লাগল তাদের পিছনের তাঁবু থেকে; সূর্যাস্তের প্রশান্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যের ছোপ লাগল সেই ধোঁয়ার গায়ে।

ফিরে এল ফিটজিরাল্ড। গোটা পরিস্থিতিটাই কেমন যেন বিশ্রী বর্বরোচিত হয়ে দাঁড়াল, বুঝতে পারলেন লুইস।

—'ইংরেজি চলবে না।' ফিটজিরাল্ড বলল।

—'পনিরা?'

—'না, ওরা শী-এন ভাষা বোঝে না। খুবই উত্তেজিত ওরা—ওদের যদি এগিয়ে গিয়ে ইশারা করতে বলি, তাহলে তুলকালাম হয়ে যাবে, অনেক খেসারত দিতে হবে।'

—'তোমার ঘোড়সোয়ারদের নিয়ে ঘেরাও কর ওদের।'

একদল অল্পবয়স্ক অপরাধীকে ধরে আনার জন্য কোন অফিসারকে পাঠাতে গিয়ে

পুলিস সার্জেণ্ট যেভাবে বলে তেমনি সাদাসিধে সাধারণভাবেই বললেন লুইস। ফিটজিরাল্ড ঘাড় নাড়ল, সামনের দিকে এগুতে লাগল আঠারজনকে নিয়ে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঘোড়াগুলোকে ঘুরিয়ে নিল পনিরা, তারপর চিৎকার করতে করতে সোজা ছুটল শী-এনদের দিকে। স্কাউটদের আগে যাবার জন্য ঘোড়া ছোটাল ফিটজিরাল্ড, অন্য সবার মত তলোয়ারখানা সে খুলে নিয়েছিল আগেই।

জিনের উপরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল শী-এনরা, তাক করল হুঁশিয়ার হয়ে, মনে হল যেন আলসেমিতে ধরেছে ওদের, তারপর গুলি ছুঁড়ল। কাত হয়ে পড়ল তিনজন পনি; মেটে রঙের কম্বলের মত গড়াতে গড়াতে পড়ে গেল জিনের উপর থেকে। পিছু হটে পদাতিক দলের গায়ের উপর এসে পড়ল ঘোড়সোয়াররা। পনিদের একজন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সামনে, এক শী-এন-এর বর্শায় গেঁথে গেল সে; অন্যেরা প্রাণপণে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল একপাশে।

শী-এনরা ফিরে গেল তাদের তাঁবুতে। সৈন্যদের চোখের সামনেই ঘোড়া থেকে নামল তারা। মেয়েরা সরিয়ে নিয়ে গেল ঘোড়াগুলো, দীর্ঘ ট্রেঞ্চের মধ্যে আর সবার সঙ্গে গিয়ে মিলল তারা—তেমনি ভাবাবেগহীন, তেমনি অপেক্ষারত।

ঘোড়া থেকে নেমে ফিটজিরাল্ডের দলবল এবার যোগ দিল পদাতিকদের সঙ্গে। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে ফিটজিরাল্ড, ফ্যাকাশে হয়ে আছে তখনো তার মুখ। ক্রোধে আক্ষেপে কুঞ্চিত হয়ে উঠল লুইসের মুখ। কিন্তু নিজেকে সংযত করলেন লুইস, তাঁর মনে ঘৃণার চেয়ে ক্রোধই জেগে উঠল বেশি। ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছিলেন তিনি, হাঁটতে শুরু করলেন এবার পদাতিক দলের সামনে দিয়ে, প্রতিটি পদক্ষেপ বেদনাদায়ক হয়ে উঠল তাঁর কাছে, যন্ত্রণা করে উঠতে লাগল তাঁর পিঠের ভিতরে। সতর্ক শঙ্কিত সৈন্যরা এগুতে লাগল গুঁড়ি মেরে মেরে।

সঙ্কল্পকঠিন শাস্তিদাতার মত আগে আগে চললেন কর্নেল লুইস তলোয়ার হাতে নিয়ে। শিক্ষা দেবেন তিনি, শাস্তি দেবেন; ট্রেঞ্চের সামনেকার মাটির স্তূপের উপর বসে ভুট্টার ডাঁটার তৈরি পুরনো নোংরা পাইপ টানছে বুড়ো ইণ্ডিয়ান সর্দার; নিরস্ত্র সে, হাসছে মৃদু-মৃদু—ফুর্তির চেয়ে অনুকম্পাই বেশি সে হাসিতে। তার সম্পর্কে লুইসের মনে কোন বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। পাকা ঝানু একদল সৈন্যের পুরোভাগে লুইস চললেন আক্রমণ করতে। ইণ্ডিয়ানদের তিনি ভয়ও করেন না, শ্রদ্ধাও করেন না। এইভাবে গোঁ-এর মাথায় তিনি তাঁর সৈন্যদের এনে ফেললেন প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণের মুখে।

গুলি ছুঁড়ল শী-এনরা। ট্রেঞ্চের মুখে বসে আছে যে বুড়ো সর্দার তারই হাতের সংকেতে, সবাই একসঙ্গে, একই তালে। দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করল সৈন্যেরা এর মুখে, চেষ্টা করল এগিয়ে যেতে, কিন্তু লোহার চাবুকের মত ঘা খেয়ে পিছু হটল তারা। বুড়ো সর্দারকে গুলি করবার চেষ্টা করল ওরা, সে কিন্তু বসে রইল, পাইপ টানতে লাগল বসে বসে, চাঞ্চল্য ঘটল বলে মনে হল না কোন-কিছুতেই।

তিক্ত মনে, রক্তাক্ত দেহে নিহতদের পিছনে ফেলে চলে এল সৈন্যরা, চলে এল কর্নেলকে পিছনে ফেলে। হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটি থেকে উঠতে চেষ্টা করলেন তিনি, একটা গুলি লেগেছে তাঁর পেটে, ঝাপসা-হয়ে-আসা স্মৃতিতে তাঁর পুব দেশের স্বপ্ন আর ক্রোধ। ঘৃণা জাগেনি তাঁর, জেগেছে বিরক্তি, তার সঙ্গে বিস্ময়ও। উপুড় হয়ে গেলেন তিনি, অবসান হয়ে গেল সব যন্ত্রণার।

ফিটজিরাল্ড একেবারে হেঁটে চলে এল কর্নেলের কাছে; কাজটা তার পক্ষে খুবই সাহসের, লুকোবার একটুও চেষ্টা করল না সে, ছুটোছুটি-করা সৈন্যদের ভিতর থেকে বেরিয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এল। এত কাছে এসে পড়ল যে, বুড়ো সর্দারের মুখের রেখাগুলো পর্যন্ত চোখে পড়ল তার। তাকে লক্ষ্য করতে লাগল শী-এনরা, কিন্তু বন্ধ রইল গুলি-ছোঁড়া। আর সেই হাসি নেই বুড়ো সর্দারের মুখে। দুই হাতে কর্নেলের দেহটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ফিটজিরাল্ডের মনে হল, সে যেন দেখতে পেল করুণা আর গভীর দুঃখের মত কিছু একটা ওই তামাটে বিশাল মুখখানায় মাখানো। তারপরই ইণ্ডিয়ানদের দিকে পিছন ফিরে চলে এল নিজের দলে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে অর্ধচক্রাকারে সাজানো গাড়িগুলোর আড়ালে দাঁড়াল উনিশ নম্বর পদাতিক দল। লক্ষ্যহীন, নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল নিম্নপদস্থ অফিসাররা। যে গাড়িতে লুইসের দেহ রয়েছে সেই দিকে বার বার তাকাতে লাগল অস্বস্তিভরে। ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণের ভয়ে পাহারা দাঁড় করিয়ে রাখল তারা, কিন্তু কোন আক্রমণই হল না।

তারপর, অনেক রাতে ঘোড়ার শব্দ জানিয়ে দিয়ে গেল, ইণ্ডিয়ানরা চলে যাচ্ছে ওখান থেকে, তারা চলেছে উত্তর দিকে, চলেছে অতল অন্ধকারে।

উত্তরমুখো চলতে গিয়ে এমন আঁকাবাঁকা পথে তারা চলল যে, ভাবতেও পারা যায় না তা। বার হাজার সৈন্য—যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর প্রায় একটা ডিভিশন, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই-করা রেজিমেণ্টের ঝানু সৈন্যরা ধরতে চেষ্টা করল তিনশো জনকে। আর সেই তিনশোজনের মধ্যে মাত্র আশিজনের মত পুরুষ, তাদের মধ্যেও অর্ধেক প্রায় তরুণ-যোদ্ধা।

নীল-উর্দি পরা সৈন্যরা তচনচ করে বেড়াতে লাগল কানসাস। নীল রঙের দীর্ঘ সারি, অশ্বারোহী, পদাতিক, ভোঁতা-নাক কামানসমেত ট্রেন-বোঝাই গোলন্দাজ—ঘুরে মরতে লাগল সবাই সামনে পিছনে। মাঝে মাঝে লড়াই বাধল, আহত আর নিহত মানুষগুলো পড়ে রইল হলুদ ঘাসের প্রান্তরে।

কোণঠাসা হলে কখনো কখনো ইণ্ডিয়ানরা ভাগ হয়ে গেল দুটো তিনটে দলে। দুশো বারটা ঘোড়ার একটা দল লুট করে নিল ওরা; ফেলে গেল ছুটে ছুটে ক্লান্ত আর মরমর নিজেদের টাটুগুলোকে। গরু ছিনিয়ে নিল পাল থেকে, পেট ভরাল তাই দিয়ে; ছুটল আবার তারপর।

'ঈগল বার ডি' র‍্যাঞ্চের রাখালদের বারজনের একটা দল মাঠ থেকে ফিরছিল ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গে তাদের খাবারের গাড়ি। একটা উঁচু জায়গায় উঠতেই তারা দেখতে পেল দু'জন ইণ্ডিয়ান চামড়া ছাড়াচ্ছে একটা মাদী বাইসনের। রাখালরা ছুটে এল সামনে, ইণ্ডিয়ান দু'জনই মুখ তুলে দেখতে পেল তাদের, ঘোড়ার দিকে ছুটল তারা। লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়ে গিয়ে একজন উঠল ঘোড়ার পিঠে। অন্যজন পড়ে গেল পায়ে গুলি লেগে। আহত ইণ্ডিয়ানকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই, প্রাণপণে আঁকুপাঁকু করতে লাগল সে বন্দুক হাতে তুলে নেবার জন্য। দলের পাণ্ডা মার্ক রেডি লাথি মেরে সরিয়ে দিল বন্দুকটা। এক্সেল গ্রীন তার লোহার নাল-লাগানো বুটের লাথি কষিয়ে দিল আহতের মুখে।

পাঁচ-ছশো হাত দূরে গিয়ে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে থামল অপর ইণ্ডিয়ানটি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তাদের। যে-কোন পিস্তলের পক্ষেই দূরত্বটা বড় বেশি, আর দলের সঙ্গে আছে মাত্র দুটো রাইফেল। ক্লিং আর স্যাণ্ডারসন—রাইফেলের টিপ দু'জনেরই পাকা—চেষ্টা করল বারকয়েক, কিন্তু ফল হল না কিছু। ওর দিকে ছুটে যেতে চাইল গ্রীন, কিন্তু রেডি বলল: 'না, না, একটাকে তো পেয়েছি—মরুক গে আর-একটা।'

সায় দিল স্যাণ্ডারসন। ভাঙা পা আর রক্তাক্ত মুখে পড়ে আছে ইণ্ডিয়ানটা, তার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সে বলল, 'এটা 'কুকুর-সেনা', হয়ত গোটা দলটাই আছে ধারে-কাছে।'

পালাতে পারল যে ইণ্ডিয়ানটি সে চলে গেল ধীরে ধীরে। অন্যজন পড়ে রইল কনুইয়ে ভর দিয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে; একবার তাকাল না পর্যন্ত কারো মুখের দিকে; গুনগুন করতে লাগল এক অদ্ভুত নিচু পর্দার সুর।

—'এ আবার কি?'

—'মরবার আগে গান গায় ওরা।' উত্তর দিল স্যাণ্ডারসন। মার্সির ঠাকুর্দা মরেছিল ইণ্ডিয়ানদের হাতে; সে মনে করত অন্য সবাই যারা ইণ্ডিয়ানদের ঘৃণা করে তাদের চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করাটাই তার কর্তব্য। দাঁত বার করে হেসে উঠল সে সশব্দে।

—'করবে কি একে নিয়ে?' গ্রীন বলল।

—'ব্যাটা লালমুখো বেজন্মা।' মার্সি বলল হাসিমুখে।

দলের বাবুর্চি ফার্গুসন, সে বলল, 'থাক গে, ছেড়ে দাও ওকে। দরকার কি আমাদের।'

একপাশে কাত হয়ে, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ইণ্ডিয়ানটি। বয়সে তরুণ, ত্রিশের নিচে হবে, সুস্পষ্ট দেহসৌষ্ঠব—দীর্ঘ শক্তিমান দেহ, পিপের মত মাংসল বুক আর কাঁধ। তার ক্ষতবিক্ষত মুখ আর ভাঙা পায়ে যন্ত্রণা যদি হয়ে থাকে সে কিন্তু তার কোন চিহ্নই প্রকাশ করল না। পুরনো নোংরা রক্তমাখা চামড়ার জামা গায়েই সে পড়ে রইল স্থির হয়ে।

—'একটা গাছ খুঁজে বার করতে হবে।' ভেবে চিন্তে রেডি বলল, 'খৃস্টানি সৎকার করে দিচ্ছি ওকে।'

—'না, না!'

—'শোন, রেডি,' বাবুর্চি ফার্গুসন বলল, 'ওকে মারার কোন অধিকার নেই আমাদের। ও 'কুকুর-সেনা' হতেও পারে, না-ও হতে পারে। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানে এমনও কেউ নেই এখানে। ওকে মারার কি এক্তিয়ার আছে আমাদের?'

—'নিশ্চয়ই ও ব্যাটা—তাকিয়ে দেখ—ওর জুতোর দিকে!'

গোড়ালি ক্ষয়ে গেছে জুতোর, ছিঁড়ে ঝুলি ঝুলি হয়েছে, কিন্তু তখনো তাতে চিহ্ন আছে নতুনকালের সৌন্দর্যের, জুতো জোড়ায় বুটি তোলা হয়েছিল এক সময় মন দিয়ে, অসীম ধৈর্যে।

—'এই জুতো পরে 'কুকুর-সেনা'রা।' সায় দিল স্যাণ্ডারসন।

সবার মুখের দিকেই তাকাল ফার্গুসন। দলের অর্ধেকই তরুণ, বয়স হবে কুড়ির নিচে; তামাটে মুখ, স্বাস্থ্যবান যুবক সব।

—'মের না ওকে।' ফার্গুসন বলল। 'যিশুর দোহাই, ওর মৃত্যুই যদি চাও, তাহলে একলাই ওকে ফেলে রেখে যাও।'

—'চুপ কর্ বেটা বাবুর্চি', বলে উঠল মার্সি।

অন্য কেউ আর-কিছু বলল না। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই তাকিয়ে রইল পড়ে-থাকা মানুষটার দিকে। ফার্গুসনের দিকে কেউই তাকাল না কিন্তু। খাবারের গাড়ির কাছে গিয়ে ফার্গুসন নিয়ে এল একপাত্র জল, বাড়িয়ে দিল ইণ্ডিয়ানটির দিকে।

—'জল খাবে—তেষ্টা পেয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল ফার্গুসন।

মুখ তুলল ইণ্ডিয়ানটি, এক মুহূর্তের জন্য তাকাল ফার্গুসনের দিকে, হাত থেকে নিয়ে খেয়ে ফেলল জলটুকু। নিজের ভাষায় কি যেন একটা বলল সে।

—'ব্যাটাকে বেঁধে তোল ওর ঘোড়ার পিঠে।' হঠাৎ বলে উঠল রেডি। আসল কথা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে রেডি, আর সবাই জানে যে সিদ্ধান্ত করার যা তা সে-ই করে, তারা শুধু কাজ করে যায় তার সিদ্ধান্তমত।

অসহায়ের মত মাথা নেড়ে ফার্গুসন পিছন ফিরল, উঠে গিয়ে বসল গাড়ির মধ্যে। সবাই মিলে বেঁধে ইণ্ডিয়ানটিকে তুলল তার নিজের ঘোড়ার পিঠে, তারপর প্রায় দু মাইল এগিয়ে গিয়ে খুঁজে পেল ফাঁসি দেওয়ার মত বড়সড় একটা গাছ। বেশ বড় এবড়ো-খেবড়ো কটনউড গাছ, ঝুঁকে পড়েছে একটা জলার পাড়েই। দড়ির ফাঁস তৈরি করে ঝুলিয়ে দিল ওরা একটা ডাল থেকে, ইণ্ডিয়ানটির গলায় পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল তাকে, দড়ির অপর প্রান্তটা বেঁধে দিল তার টাটুর জিনের দাঁড়ার সঙ্গে।

কোন রকমে ইণ্ডিয়ানটি ভাল পা-খানায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খাড়া হয়ে।

একটি জিনিসই সে বজায় রাখতে চেষ্টা করল শুধু—তার মর্যাদা। ভাবলেশহীন তার মুখ, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়; চোখ দুটো বোজা।

—'ব্যাটা যদি একটা কথাও বলত,' বিড়বিড় করে উঠল স্যাণ্ডারসন। 'মরার সময়ও কিচ্ছু বলে না, এমন লোক আমার দু-চক্ষের বিষ।'

তারপর ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে দিল রেডি; শূন্যে ঝুলতে লাগল ইণ্ডিয়ানটি।

ঝুঁকে পড়ে ঘোড়া ছেড়ে দিতে দিতে ফার্গুসন বলল, 'রাতের জন্য একটা জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। গাড়ি ছেড়ে দিলাম আমি।'

মারে, উইণ্ট আর তাঁদের রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা কোম্পানি দুটোর দাড়ি-না-কামানো সৈন্যরা ঘোড়া পাণ্টাল ওয়ালেস কেল্লায়। পথের রেখা ধরে পিছনে পিছনে চলতে গিয়ে পুব-পশ্চিমে কানসাসের প্রায় অর্ধেক, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পুরোটাই ঘুরে পাঁচশো মাইলের বেশি ঘোড়ার পিঠে ছুটতে হয়েছে তাঁদের। হাড়-মাস আলাদা হয়ে গেছে ঘোড়াগুলোর। তাঁদের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

মারে আর উইণ্ট স্নান করলেন ওয়ালেসে, দাড়ি কামালেন। সঙ্গের লোকেরা ঘুমোল। মানচিত্রের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মারে। রিপোর্ট তৈরি করলেন, একটা মিজনারের জন্য, আর একটা জেনারেল ক্রুকের জন্য। খাবার ঘরে বসে এত মদ খেলেন যে, নেশা হয়ে গেল তাঁর। পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে গিয়েছেন কর্নেল লুইস। এখানকার কর্তা ক্যাপ্টেন গুড্যাল যেভাবে মারের দিকে তাকাতে লাগল তাতে তাচ্ছিল্যের ভাবটুকু মোটেই গোপন রইল না। মারে যখন বললেন যে, অমনভাবে চলে যাওয়ায় বোকামি করেছেন লুইস, তখন এ ধরনের অপমানকর উক্তির একটা ভালমত উত্তর দিতে যাচ্ছিল গুড্যাল, শুধু উইণ্টের চোখের ইসারায় থামল সে। উইণ্ট নিজেই শুইয়ে দিলেন মারেকে বিছানায়; কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক পরেই তিনি জেগে উঠলেন।

—'ঘোড়ায় জিন চাপাতে বল সবাইকে,' মারে বললেন উইণ্টকে।

কোন কথা বললেন না, কোন তর্ক করলেন না, তিনি জানেন কি চলছে মারের মনে, যতক্ষণ না শিকারকে পাকড়াও করা যাবে, ততক্ষণ থামবে না তাঁর মনের খচখচানি। তখনো নেশার ঘোর আছে মারের জড়িত স্বরে, তিনি বললেন: 'মানুষ যখন নিজেকে বেচে দেয়, তখন সবটাই বেচে দেয়।'

জিন চড়ানো হল নতুন ঘোড়াগুলোয়। একটা মাদী ঘোড়ার পিঠে উঠে ধপ করে বসে পড়লেন মারে। তাঁদের নিজেদের বিরাট বিরাট পাঁশুটে রঙের ঘোড়ার বদলে তাঁরা পেয়েছেন শাদা, কটাশে, বাদামি আর কালো রঙের ঘোড়া। দুর্গ থেকে আগে আগে বেরিয়ে এলেন তিনি। সারারাতই তিনি চললেন আগে আগে, শাপমন্যি করতে লাগল ক্রুদ্ধ আধ-ঘুমন্ত সৈন্যরা। তারা ঘুমোল সকাল বেলা, তারপর চলতে শুরু করল আবার।

সামনে পিছনে ঘোরাঘুরি করলেন তাঁরা। দেখা হয়ে গেল এক র‍্যাঞ্চ-মালিকের সঙ্গে। লোকটা জানাল বারটা গরু হারিয়েছে তার। তার গরু-চরাবার মাঠে একটা চক্কর দিতেই চিহ্ন পাওয়া গেল পথের রেখার। চুরি-করা গরুগুলোকে যেখানে বসে ইণ্ডিয়ানরা কেটেছে সেই জায়গাটাও দেখতে পেলেন তাঁরা। একটা জলার ধারে এসে দেখলেন, দড়ি ঝুলছে একটা কটনউড গাছ থেকে, পাশেই একটা নতুন খোঁড়া কবর।

—'খোঁড় কবরটা।' মারে বললেন গম্ভীর হয়ে। কিন্তু ফাঁসি দিয়ে মারা 'কুকুর-সেনা'র লাস টেনে তুলবে সৈন্যরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

—'এ কাজ কার, ভেবে অবাক হচ্ছি আমি।' প্রশ্ন করলেন উইণ্ট।

লাসটাকে কবর দেওয়া হল আবার। মারে ভাবলেন, 'কমল একটা—কতদিন আর টিকতে পারবে ওরা?'

—'নিশ্চয়ই ওদের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা।' উইণ্ট বললেন।

বিচিত্র-বর্ণ ঘোড়াগুলোকে গালাগাল দিতে দিতে এগিয়ে চললেন মারে।

তাঁর সেনাদলের পাঁশুটে রঙের ঘোড়াগুলোর মত তাকত নেই একটারও। মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে ঘোড়া ছোটালেন তিনি। পরদিন দুপুরের দিকে তাঁরা এসে পৌছুলেন একটা জায়গায়, শী-এনরা হালে তাঁবু ফেলেছিল সেখানে।

—'অনেকক্ষণ ছিল ওরা এখানে।' সার্জেন ক্যামক্রন বলল। 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা আগুন জ্বলিয়ে রেখেছিল।'

ফেলে-যাওয়া বাইসন-চামড়ার একটা ঢাল তুলে নিলেন উইণ্ট। ঢালটার কিনারায় একটা গুলির ফুটো। 'এরকম ঘটলে ঢালের উপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় ওদের।' মারেকে বুঝিয়ে বললেন উইণ্ট।

রাতের দিকে তাঁরা এসে পৌছুলেন ইণ্ডিয়ানদের কাছাকাছি। ঘোড়াগুলো ওদের ধরতে না পারায় ক্ষিপ্ত হয়ে গালাগাল দিতে লাগলেন মারে। উইণ্ট বললেন, 'একটু বিশ্রাম দরকার। এ ধকল মানুষের সহ্য হয়, কিন্তু মারা পড়বে যে জানোয়ারগুলো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক ঘণ্টার বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন মারে, আর এই এক ঘণ্টা অন্ধকারে পায়চারি করে বেড়ালেন আস্তে আস্তে। কাছে এসে দাঁড়ালেন উইণ্ট, অনিশ্চিতভাবে হাতখানা রাখলেন মারের হাতে; বললেন, 'দেখছ তো, মারে—এই কয়েক সপ্তাহে কত কিছুর মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে এলাম আমরা।'

—'তাই নাকি?' মারের কণ্ঠে সন্দেহ, মনে বিদ্বেষ।

'আমার কি মনে হয় বলব তা?'

'বলতে পার।' মারে উত্তর দিলেন।

—'এ হচ্ছে রোজকার কাজ—ফৌজে রয়েছ যে। কি করে শুরু হল, কেন গিয়েছিলে ওয়েস্ট পয়েণ্টে, কেন হলে অফিসার—কিছুই আসে যায় না তাতে। কথাটা

এই যে, তুমি এখানে আছ, আর এ হচ্ছে রোজকার কাজ। শেষ হয়ে গেলে ভুলে যাব এর কথা। আবার আসবে অন্য প্রাত্যহিক কাজের পালা তখন।'

—'তাই কি?'

—'ব্যাপারটা এখন বেশ পীড়াদায়ক। তোমাকে ভাবিয়ে তুলবার সুযোগ ওই হতভাগা 'কুকুর-সেনা'গুলোকে নিজেই তো দিয়েছ।'

—'ওরা আমাদের সকলকেই তো ভাবাচ্ছে।' অন্তরটা ফাঁকা হয়ে গেলে কেমন লাগে, যা-কিছুতে বিশ্বাস ছিল তাঁর, যে-আদর্শকে সেবা করেন, যে-উর্দি গায়ে দেন, সেই সমস্ত কিছুতেই আস্থা হারালে কেমন লাগে—সে কথা বলতে পারলেন না তিনি উইণ্টকে।

এক ঘণ্টা ফুরিয়ে যেতেই সবাইকে টেনে তুললেন তিনি, এগিয়ে চললেন রাতের অন্ধাকারে। আর সেই রাতেই এক সময় দেখা হয়ে গেল পলায়নপর ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে; পশ্চাদ্রক্ষী শী-এনদের সঙ্গে লড়াই করলেন খোলা তলোয়ার হাতে অন্ধকারেই।

এক অদ্ভুত উন্মত্ত লড়াই হল, কিন্তু ফল হল না কিছুই। আবার ইণ্ডিয়ানরা পালিয়ে গেল, আর অশ্বারোহীরা নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে, ঘুমিয়ে পড়ল ঘোড়ার পাশে আলো না জ্বালিয়েই।

'হেরাল্ডে'র সংবাদদাতা জ্যাকসনকে আসতে হল অনেকটা দূর। ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি, অস্বস্তি আর নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। ওকলাহোমার বিরুদ্ধে ঘৃণা অথবা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে যে, তার সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত। যখনই তিনি ভাবতে লাগলেন, যা-কিছুই তিনি ভালবাসেন—তাঁর নরম বিছানা, তাজা বীয়ার, বসে বসে ভাল ভাল গল্প করা (কোয়েকার*মিশনারির গল্প নয়), তাঁর শিক্ষয়িত্রী স্ত্রী, এজেন্সির চাকর-বাকর দূরে চলে এসেছেন তিনি সে-সব কিছু থেকেই, তিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মন। 'হেরাল্ডে'র অপর রিপোর্টার স্ট্যানলি, যিনি আফ্রিকাতে গেছেন ডাঃ লিভিংস্টোনকে খুঁজে বার করতে, তাঁর মত অত দূরে সরে না এলেও অনেকটা দূরই কিন্তু এসে পড়েছেন তিনি। আগেও তিনি একবার এসেছেন এ অঞ্চলে, আজ অবাক হলেন এই ভেবে যে, কি করে তিনি ভুলে গেলেন ঘোড়ার গাড়িতে ষাট মাইল আসার শারীরিক ও মানসিক ধকল। ডার্লিংটনের এজেণ্ট মাইলসের বারান্দায় বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন তিনি, কথা বলছিলেন লুসি, তিনি শুনে যাচ্ছিলেন।

—'কিন্তু, মি. জ্যাকসন, ঠিক গ্রীষ্মের গরম নয় এটা, ইণ্ডিয়ান অঞ্চলের গ্রীষ্ম এটা, সত্যিকারের গ্রীষ্মে গরম পড়ে অনেক বেশি।'

—'আরও গরম হয়?' জ্যাকসন বললেন।

—'ঝলসানো গরম, বুঝলেন,' তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিলেন এজেণ্ট মাইলস্। 'পুবের সমুদ্রের ধারের গরমের মত ততটা অস্বস্তিকর নয়।'

মাথা নাড়লেন জ্যাকসন; ঘাম মুছে ফেললেন ভুরু থেকে। এমন সরল মানুষ এরা, দু'হাজার মাইল দূর থেকে লম্বা বাঁকানো নখ বাড়িয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের এক সংবাদপত্র কি যেন একটা করে ফেলছে এই ভয়ে এত ব্যস্ত আত্মরক্ষায়, এত শঙ্কিত ত্রস্ত যে তাদের বেশি ঘাঁটাতে ইচ্ছে হল না জ্যাকসনের। বহুকাল আগেই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সত্যিকারের পাষণ্ড বলে কিছু নেই। কোন দিন সাক্ষাৎ পাননি কোন অসৎ লোকের—যে প্রকৃতিগত ভাবে অসৎ, সাক্ষাৎ পাননি কোন পাপ, মদমত্ততা আর প্রতিভার প্রতিমূর্তির। নির্বুদ্ধিতা, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, ভয়—এ সবই দেখেছেন তিনি প্রচুর, দেখেছেন সর্বত্র, অন্যত্র যেমন, তেমনি দেখেছেন মার্কিন কংগ্রেস ভবনের ভিতরেও। কিন্তু সত্যিকারের পাপ—

নিজেকেই প্রশ্ন করলেন তিনি: 'কি আশা করেছিলাম আমি? কোন সাইমন লেগ্রী?' পাকাচুল দুটি সরল মানুষ এরা, জীবন নির্বাহ হয় এই এজেন্সি থেকে। তাও যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে মারা পড়বে এরা, ঠিক তিনি যেমন মারা পড়বেন যদি জীবনে আর কখনো একটা লাইনও না লিখতে পারেন।

—'গ্রীষ্মের সময় এত অস্বস্তিকর গরমটা।' বিশ্বাসভরে বলে উঠলেন লুসি। 'সেই জন্যে এত অশান্তি সহ্য করতে হয় আমাদের গ্রীষ্মকালে।'

—'আমারও তাই মনে হয়।'

—'দোষ ধরার জন্যে মুখিয়েই থাকে পুবের লোকগুলো।' লুসি বললেন।

—'তা ঠিক, এখানে কি ঘটে, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু ধারণাই নেই তাদের।' সায় দিয়ে চললেন জ্যাকসন।

—'আরামের নয় কিছু। অনুযোগ করছি না আমরা, কিন্তু অনুযোগ করলে অনেক কিছু সম্পর্কেই করবার আছে।'

ঘাড় নাড়লেন তিনি। তাঁর মনে হল, তাদের পক্ষেও বলবার আছে অনেকখানি। 'কিন্তু ওরা কেন অমনভাবে চলে গেল, একমাত্র গরমই কি তার কারণ?'

—'বর্বরেরা কোন্ কাজ কেন করে তা বোঝা কঠিন।' এজেন্ট মাইলস্ বললেন। 'কখনো কখনো তারা কাজ করে বসে ছেলেমানুষের মত—'

—'আপনিও তাই বিশ্বাস করেন?' কৌতূহলী জ্যাকসন জিজ্ঞাসা করলেন।

—'নিশ্চয়ই করি।' উত্তর দিলেন লুসি। 'কেন, গত কালই তো আমি বলছিলাম জনকে জানালার কথাটা। ভেতর থেকে বাইরে দেখবার জন্যেই যে জানালা জিনিসটা, বাইরে থেকে ভেতর দেখবার জন্যে নয়, এটা বুঝতে পারে না ওরা। যখনই ওরা যাবে ঘরের পাশ দিয়ে, তখনই থেমে জানালার সঙ্গে মুখ লাগিয়ে দাঁড়াবে। জিনিসটা যে কতখানি অন্যায় তা বোঝাতে পারবেন না আপনি।'

—'বহু ব্যাপারেই ছেলেমানুষের মত।' এজেন্ট মাইলস্ বললেন।

—'কিন্তু গরমই তো সব নয়।' উগ্রভাবে জোর দিয়ে বললেন জ্যাকসন। 'অন্তত তারা তো জানত যে গরম চিরকাল থাকে না।'

—'বড্ড বেয়াড়া ওরা। যুক্তি দিয়ে কোন কোন ইণ্ডিয়ানকে বোঝানো যায়, কিন্তু শী-এনরা ঘাড়বাঁকা, বদমেজাজি, দেমাকি। তাদের বলুন এটা করতে, করে বসবে অন্যটা। বলুন ওদের দক্ষিণে থাকতে, সেখানে তাদের সুখ-সুবিধে দেখবে সরকার, তারা বলবে না, তারা থাকবে উত্তরে।'

—'উত্তরেই তো তারা চিরকাল থেকে এসেছে, সে তো সত্যি।'

—'সত্যি—কিন্তু এ অঞ্চলে যারা বসবাস শুরু করেছে তারাও তো থেকে এসেছে।'

জ্যাকসন বললেন, 'শুনুন, মি. মাইলস্, এ ব্যাপারের মূল জানতে চেষ্টা করছি আমি, অহেতুক অপবাদে আপনাকে জড়াব না, কিন্তু আমার পাঠকদের কাছে আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই, আমাদের এই যুক্তরাষ্ট্রে একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ দল শত শত বৎসর ধরে যেখানে বাস করে এসেছে, কেন তারা সেখানেই বাস করতে পাবে না। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, আপনার আমার অথবা এজেন্সির দায়িত্বের চাইতেও এই সমস্যার মূল অনেক গভীরে। শত শত সংখ্যালঘিষ্ঠ দল একত্র হয়ে একটা জাতি হিসেবে আমরা গড়ে উঠেছি এই সাধারণ নীতির ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষ সমান—যাতে এই কথাটি নিয়ে কোন রকম মারপ্যাঁচ না চলে। এই মুহূর্তে ইণ্ডিয়ানদের একটা দলকে ধ্বংস করবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে সমতল অঞ্চলের সমস্ত যুক্তরষ্ট্রীয় ফৌজ। তাদের একমাত্র অপরাধ তাদের নিজেদের দেশে তারা বাস করতে চায় শান্তিতে।

—'এ ব্যাপারটা নিয়ে ইণ্ডিয়ান-দপ্তরে খোঁজখবর করলে ভাল হত না কি?' অস্বস্তিভরে বললেন এজেন্ট মাইলস্। 'আমি এজেন্ট—এ অঞ্চলে ইণ্ডিয়ানদের আনা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, একথা বলা উচিত হবে না আমার।'

—'কিন্তু আমি জানতে চাই, ওরা ছেড়ে গেল কেন এ জায়গা, কেন ওরা উইওমিঙে ছুটে যাবার জন্যে পাগলের মত এই ঝুঁকি নিল। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, যদি আপনি ওদের খাইয়ে থাকেন, ওদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন—'

—'ওরা অসভ্য বর্বর।' এজেন্ট মাইলস্ বললেন উদাসীনের মত।

—'তাহলে আপনার হিসাবের খাতাপত্র দেখতে চাই আমি।' স্থির কণ্ঠে বললেন জ্যাকসন। ঠিক করলেন, যদি ধমকাতেও হয় মাইলস্‌কে তাতেও তিনি রাজি। 'আপনি যদি সরল প্রশ্নগুলোর জবাব না দেন—'

বুড়োবুড়ি দুজনেই বোকার মত তাকিয়ে রইলেন সাংবাদিকের মুখের দিকে। ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লেন মাইলস্। বিচলিত হয়ে হাত দুখানা মুঠো করতে লাগলেন আর বারবার খুলতে লাগলেন লুসি। তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না—'

—'বিশ্বাস যা করবার তাই আমি করেছি। আমি তো বলেছি, আমার কাগজ

আপনাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করবে। একেবারে ক্ষমতাহীনও নই আমরা, কংগ্রেস সদস্যরা, সিনেটররা, এমনকি প্রেসিডেণ্টও একথা জানেন।'

নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে উঠল কিছুক্ষণের জন্য, শুধু দেয়াল-ঘড়ির টিক টিক আওয়াজ আর বিচলিত লুসি-খুড়ির দুলুনি-চেয়ারের কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ। অবশেষে বৃদ্ধা বললেন, 'ওঁকে বলেই ফেল, জন।'

—'হ্যাঁ, জানাজানি তো হবেই একথা।'

কাঁদতে শুরু করলেন লুসি-খুড়ি, 'আমি জানতাম এটা অন্যায়। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝবে কি করে লোকে? আমি জনকে বলতাম, কিন্তু বুঝবে কি করে লোকে?'

—'মাপ করবেন।' সাংবাদিক বললেন। 'আমি দুঃখিত এজন্যে।'

—'তিনজন লোক পালিয়ে গিয়েছিল।' এজেণ্ট মাইলস্ বললেন।

—'শী-এন?'

—'হ্যাঁ, ওই একই দলের। এটা এজেন্সির আইনে বারণ, আমি ভাবলাম, ওদের যদি সাজা না দেওয়া হয়, তাহলে এ ব্যাপারের শেষ হবে না এখানেই। তাই আমি ওদের সর্দারের কাছে গেলাম, কেল্লার জেলখানায় প্রতিভূ হিসেবে পাঠাবার জন্যে চাইলাম দশজনকে।'

—'কিন্তু সে তিনজনকে ধরা যেত না বা ফিরিয়ে আনা যেত না?'

—'আমার তো মনে হয় না,' মাইলস্ বললেন।

—'ফলে, ওই দশজনকে 'ড্রাই টরটুগ্যাসে' পাঠান হত?'

ঘাড় নাড়লেন মাইলস্।

—'ওরা চলে যাবার পর এই ব্যাপার?' প্রশ্ন করলেন সাংবাদিক।

—'সৈন্যেরা একটা কামান সঙ্গে নিয়ে ওদের তাঁবুতে যায় দশজনকে ধরে আনতে।'

—'সমস্ত ব্যাপারটা এই?'

—'প্রায় এই,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মাইলস্, 'বাকিটুকু নিশ্চয়ই জানেন। উপযুক্ত খাবার নেই, ম্যালেরিয়া—কুইনিন নেই, ওষুধ নেই। আমাকে খাবার দিতে হত কাউকে-কাউকে, বাদবিচারও করতে হত। কে কে খেতে পাবে, আর কে কে উপোস করবে, এর বাদবিচার করাটা কি ন্যায়সঙ্গত?'

কোন কথা বললেন না জ্যাকসন। ইতিমধ্যে জুতোর গায়ে দাগ পড়ে গেছে লাল ধুলোর, সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। মাইলস্ উঠে দাঁড়ালেন, টেবিলের কাছে গিয়ে নিয়ে এলেন হিসাবের খাতাখানা।

—'কিছু কিছু ঘাটতির হিসাব আছে এতে,' বললেন তিনি, 'গোমাংস সাতশো পাউণ্ড, কফি পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড, চিনি সত্তর হাজার পাউণ্ড, ময়দা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড—'

—'ঘাটতির হিসাব ?'

—'শুধুই ঘাটতির,' অসহায়ভাবে মাইলস্ বললেন। 'আপনি যখন কাগজে ছাপবেন এসব, তখন আর আমি থাকব না এজেন্সিতে ; কিন্তু একই রকম থেকে যাবে খাদ্য-পরিস্থিতি।'

—'তবু উপোস করে থাকত মানুষ।' স্থির কঠিন গলায় বললেন জ্যাকসন।

—'কতক উপোস করে থাকত, অন্যেরা মরত ম্যালেরিয়ায়, আর সবাই যেত বাইসন শিকারে, কিন্তু বাইসনও নেই কোথায়ও। কিন্তু কি করতে পারতাম আমি ? আমাকে বলতে হত কে কে খেতে পাবে, কে কে পাবে না। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমি। আধা-সভ্য হলেও খ্রীস্টান ইণ্ডিয়ান যারা আছে, অন্যান্য অসভ্যদের চেয়ে তাদেরই দিক টানতে হত আমাকে, অন্যেরাও মারামারি আর গোলমাল করা ছাড়া অন্য কিছুই করত না।'

—'বুঝতে পেরেছি, তাই করতে হত আপনাকে।'

জ্যাকসন উঠতেই মাইলস্ বললেন, 'আমাদের সম্পর্কে কঠিন হবেন না কিন্তু।' ঘাড় নাড়লেন জ্যাকসন, বুড়োবুড়ির দিকে ফিরে তাকাতেও ইচ্ছে হল না তাঁর।

অক্টোবর-নভেম্বর, ১৮৭৮

বিজিত ও বিজেতা

মারে ফিট্‌জিরাল্ড, ট্রাস্ক অথবা মাস্টারসনের দৃষ্টির আড়ালে গেলেও জেনারেল ক্রুকের দৃষ্টির আড়ালে কখনই যেতে পারেনি ইণ্ডিয়ানরা। কারণ ক্রুক লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন মানচিত্রের উপর; একশো মাইল তো মানচিত্রের একটা ইঞ্চি; আর এমনকি দশটা ইঞ্চিও ধরে রাখা যেতে পারে তাঁর বার হাজার সৈন্যের মিলিত রেখাগুলোর মধ্যে। ক্রুক যেন বাড়ির উঠানে বসে দেখছেন, প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছে একটা পিঁপড়ে। পালাবার উপায় নেই পিঁপড়েটার; যদিও সে যে জগতে আছে, সেটা তারই নিজস্ব—মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন চেতনাই নেই তার।

সিডনি, উত্তর প্ল্যাটে আর কিয়েরনে থেকে দক্ষিণমুখো এগিয়ে-আসা সৈন্যরা ছুটে চলল সাঁড়াশির আকারে। দক্ষিণ দিকে বাড়ানো তিন-তিনটে লম্বা হাত দিয়ে তারা চেপে ধরল শী-এনদের ভালভাবে কায়দা করে। দুটো অশ্বারোহী দল নিয়ে দক্ষিণ থেকে মারে আসতে লাগলেন পাম্পের পিস্ট মত।

বার হবার একমাত্র পথ রইল উত্তরে, আর জেনারেল ক্রুকও এগিয়ে এলেন সেই পথ বন্ধ করে দিতে। বেরুবার পথটা দেড়শ মাইল চওড়া, প্ল্যাটে নদীর ধার দিয়ে উত্তর প্ল্যাটে থেকে সিডনির পথটা এমনভাবে বন্ধ করলেন যে, একটা ইঁদুর পর্যন্ত পালাবার উপায় রইল না সে-পথে। দুই শহরের মধ্যে দিয়ে নদীর ধার বরাবর চলে গেছে ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেল-লাইন, সৈন্য বোঝাই দুটো ট্রেন পাঠালেন ক্রুক, একটা এগুতে লাগল সিডনি থেকে পুবমুখো, অন্যটি উত্তর প্ল্যাটে থেকে পশ্চিমে, কামান দুটোর সঙ্গেই। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দিনরাত সামনে আর পেছনে এগুতে লাগল ট্রেন দুটো অস্থির ড্রাগনের মত।

ট্রেন দুটো ছাড়াও তিনি দু কোম্পানি অশ্বারোহী মোতায়েন করলেন ওগাল্লালাতে; ভৌগোলিক দিক থেকে বেরুবার পথের কেন্দ্রস্থল এটাই। সিডনি, উত্তর প্ল্যাটে আর প্রায় অন্তত গোটা ছয়েক ঘাঁটির সঙ্গে মুহুর্মুহু টেলিগ্রাফে খবরাখবর চলতে লাগল অশ্বারোহী দলের। যে-কোন জায়গায় শী-এনদের দেখা পেলেই ছুটে যেতে পারবে তারা।

রেল-লাইনের উত্তর দিকে, প্ল্যাটে নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে পুবমুখো, সেখানে ছড়িয়ে রইল পদাতিকেরা, আক্রমণের জন্য প্রায় সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে। দিনের বেলায়

তাদের 'একদলের টহলদারদের সঙ্গে অপর দলের টহলদারদের দেখা হতে লাগল প্রায় একশো মাইল দূরে গিয়ে, আর রাতের বেলায় পাহাড়, উপত্যকা, তৃণ-প্রান্তর, বালু টিবির উপর জ্বলতে লাগল তাদের অগ্নিকুণ্ডগুলো—প্রাচীন যুগের যুদ্ধকালীন অগ্নি-সংকেতের মত ওগাল্লালা আর সিডনির নাগরিকেরা অগ্নিকুণ্ডগুলো জ্বালিয়ে রাখতে সাহায্য করল। শেষ লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য শক্তিবৃদ্ধি করল টহলদারদের।

চকচকে তারের জালের মধ্য দিয়ে সংবাদ আসতে লাগল দক্ষিণ থেকে শী-এনরা আসছে। সবুজ রঙের চোখ-ঢাকাওয়ালা মানুষগুলো সংবাদ টুকে নিতে লাগল কোন এক ভবঘুরে রাখালের কাছ থেকে, কোন এক মেক্সিকান ভেড়াওয়ালা, সঙ্গীহীন কোন লোচ্চা ঘোড়সোয়ার, খড়খড়িবন্ধ জানালার ভিতর থেকে উঁকি-মারা কোন রাঞ্চ-মালিকের কাছ থেকে। আর সবুজ রঙের চোখ-ঢাকার নিচে, তেলের বাতির হলদে আলোয় বসে বসে তারা সংবাদ পাঠাতে লাগল কম্পিত আঙুলের টরে-টক্কায়—একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে স্মোকিহিলে, রিপাবলিকান নদীর দক্ষিণ বাঁকে দেখা গিয়েছে ইণ্ডিয়ানদের একটা তাঁবু, গরুর নাড়িভুঁড়ি ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে এক জায়গায়—মনে হয় সেখানেই তারা দল থেকে ধরে নিয়ে গরু কেটেছে খবার জন্য, বারটা ঘোড়া হারিয়েছে টেণ্ট সার্কল রাঞ্চ থেকে, এক নদীর নরম মাটিতে পাওয়া গেছে অনেকগুলো পায়ের ছাপ, ধোঁয়ার সংকেত দেখা গেছে দূরের আকাশে, তারা-ঝলমলে রাতে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেছে তৃণ-প্রান্তরে।

কানসাসের উত্তর-পশ্চিম, আর নেবরাস্কার দক্ষিণ-পশ্চিমের অনাবাদী অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে যে ইণ্ডিয়ান দলটা, তারা হারিয়ে গেলেও গোটা জাতির চোখ কিন্তু তাদের অনুসরণেই ব্যস্ত। ওয়াশিংটনের কর্তারা প্রস্তুত অবাঞ্ছিত একটা ঘটনার ইতি করে দেবার জন্য। সম্পাদকেরা প্রস্তুত ব্যাপারটাকে যে কোন দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য; মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত বিস্তৃত রেল-লাইনের ধার দিয়ে ছুটে যাবে শী-এনরা, তাই দেখবার জন্য প্রস্তুত রেলের যাত্রীরা; উত্তেজনাময় ঘটনার চূড়ান্ত পর্যায়, কাস্টারের প্রতিশোধ—এক সময় যারা একে নিজের দেশ বলে মনে করত, সেই লাল-মুখোদের স্মৃতিটুকু থেকেও জাতির মুক্তির জন্যে প্রস্তুত সংবাদপত্রের পাঠকেরা।

কানসানের উত্তর সীমান্ত যখন পার হল তারা, দুনিয়ার সবাই জানল সে সংবাদ। জানল, যখন পাশ থেকে এগিয়ে-আসা দু কোম্পানি ঘোড়সোয়ারের মুখেও তারা পেরিয়ে গেল দক্ষিণ নেবরাস্কার রিপাবলিকান নদী। তারপর, মারে আর তাঁর লোক-জন আবার তাদের হারিয়ে ফেললেও তারা কিন্তু চোখের আড়াল হতে পারল না অন্য সৈন্যদলের। সিডনি থেকে ক্রুককে তার করলেন মেজার থর্নবার্গ:

'মনে হচ্ছে আগামীকাল কোন সময়, কাছাকাছি কোথাও, প্ল্যাটে নদী পেরুবার চেষ্টা করবে শী-এনরা।'

সেই রাতেই পার হয়ে গেল তারা; যেখানে তাদের সবচেয়ে বেশি আশা করা হয়েছিল, যেখানে অনবরত যাতায়াত করছে সৈন্যবোঝাই ট্রেনগুলো, সেই সিডনির কাছ দিয়েও নয়, উত্তর প্ল্যাটের ধার দিয়েও নয়; ওগাল্লালার দুই মাইলের মধ্যে, বালির ঢিবিগুলোর মাথার উপরে যেখানে ঝলমলে রুদ্রাক্ষের মালার মত সব অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, সেইখানে পাতা ফাঁদের নিস্তব্ধ একটা ঘাঁটির পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল তারা।

জালের ভিতর দিয়ে যখন বেরিয়ে গেল শী-এনরা, ভেদ করে গেল ক্রুকের ইঁদুর-আটকানো ফাঁদ, তারপরে একটু একটু করে গড়ে উঠল তাদের পার হবার কাহিনীটা। রাতে ঘোড়াগুলোকে সামনে নিয়ে ওগাল্লালার প্রায় উল্টো দিকে প্ল্যাটে নদীর ধারে এসেছিল তারা। এত কাছে এসে পড়েছিল যে, নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিল শহরের আলো, দেখতে পেয়েছিল পাহরাদারদের ঘাঁটির অগ্নিকুণ্ডগুলো, সামনে দিয়ে ঘুরছে ফিরছে মানুষের ছায়ামূর্তি। লম্বা লাইন বেঁধে দু'জন কি তিনজন করে, ঘোড়াগুলোর শ্রান্তি দূর করিয়ে, কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে বলতে, তাদের শ্রান্ত করতে করতে তারা হাঁটতে শুরু করেছিল ঘোড়ার পাশে পাশে। ঘোড়াকে হয়ত বুঝতে পারে শাদা-মানুষ, কিন্তু শী-এনের কাছে ঘোড়া তার অস্তিত্বের অঙ্গ, হাতের একটু স্পর্শে, একটু আদরে, একটু ফিস্ ফিস্ কথায় সে সঞ্চারিত করতে পারে ঘোড়ার মনে তার নিজের মনের ভাবটুকু।

সেইভাবে, ছোট ছোট দলে ঘোড়াগুলোকে সামনে নিয়ে গুঁড়ো বালির ভিতর দিয়ে তারা চুপিসাড়ে এগিয়ে গিয়েছিল রেল-লাইন পর্যন্ত। ফৌজিগাড়িতে মহা স্ফূর্তিতে হেলান দিয়ে বসে গুন গুন করে গান গাইছিল, আর মহা আনন্দে অবিশ্রান্ত দুলুনি উপভোগ করছিল একটা ছোট ছেলে। গান থামিয়ে সে বলেছিল, যেন ঘোড়ার ডাকের মত একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল সে। মনে পড়ল সে কথাটা, কিন্তু চেষ্টা করেও আর-কিছুই শুনতে পায়নি তারা। পাহারাদরদের ঘাঁটির অগ্নিকুণ্ডের কাছে একটা কুকুর ডেকে উঠেছিল ভীষণভাবে, কিন্তু কুকুর তো নেকড়ে দেখলেও ডাকে। মনে পড়লো সে কথাও। আর, কাহিনীর কিছুটা জানা গেল পথের রেখা ধরে।

সার্কাস-খেলোয়াড় যেমন টান-করা তারের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যায় আলগোছে, তারা নিশ্চয়ই তেমনভাবেই ঘোড়াগুলোকে পার করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রেল-লাইন। দুই ঘাঁটির মধ্যে যে ধীর-মন্থর পায়ের ছাপ পড়েছিল, তাতে প্রমাণ করে, কত ধীরে ধীরে তারা পেরিয়েছিল পথটা। নেকড়েগুলো ডেকে উঠেছিল, সম্ভবত ওরা অমন ভাবেই একে অন্যকে ডাকে। এখানে ওখানে বালির ধস দেখে মনে হয় বসে বসে তারা অপেক্ষা করছিল অসীম ধৈর্যে। শুঁকতে শুঁকতে একটা কুকুর ছুটে এসেছিল তাদের দিকে, ঘাঁটির অগ্নিকুণ্ড থেকে চল্লিশ হাতও দূরে হবে না। গলা-টিপে-মারা কুকুরটাকে পাওয়া গেল পরের দিন। ওইখানে গুঁড়ি মেরে বসে, উষ্ণদেহ কুকুরটাকে জাপ্টে ধরে কোন 'কুকুর-সেনা' নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে ডাকাডাকি করছিল লোকজন; 'বিলি, বিলি, কোথায় গেলি রে হতভাগা, বিলি, গেলি

কোন্ চুলোয় ?' পরে বলেছিল অসহায় কণ্ঠে, 'সকালের আগে আর আসছে না বোবা কুত্তাটা—।' সকাল বেলায় দেখা গেল কুকুরটাকে, লম্বা রেশমের চুলগুলো একটুও এলোমেলো হয়নি তার, জিভ বার করে মাটিতে পড়ে জানাচ্ছে তার নিজের কাহিনী।

ধীরে ধীরে অসীম ধৈর্যে, নিঃশব্দে প্রায় মাইলখানেকের বেশি নিশ্চয়ই তারা গিয়েছিল ওই পথে। আর পরদিন রাঞ্চ-মালিকেরা, ওগাল্লালার দোকানদারেরা আর সৈন্যেরা মাথা ঝাঁকাতে লাগল বুনোদের চতুরতায়। কিন্তু এক মাইল পরেই ঘোড়ায় চেপেছিল তারা, ছুট দিয়েছিল আবার উত্তরে।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে মেজর থর্নবার্গকে ক্রুক জানিয়ে দিলেন মেজরের বুদ্ধিশুদ্ধি সম্পর্কে তিনি কি মনে করেন ; আর ধিক্কারে, ঘৃণায় জ্বলতে জ্বলতে থর্নবার্গ ছুটলেন শী-এনদের পিছন পিছন।

চিরকালের জন্যে পিঠে ক্রুশ বয়ে-মরা মানুষের মতই পথের রেখার সঙ্গে বাঁধা পড়ে রইলেন মারে। ভাগ-হয়ে-যাওয়া প্ল্যাটে নদীর উত্তরশাখা নর্থফর্ক পেরিয়ে গেলেন তিনি, ঝাঁপিয়ে পড়লেন জনবিরল বালি-পাহাড়ের প্রান্তরে, নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে শী-এনরা ওই প্রান্তরেই। নদী থেকে প্রায় মাইল বার গিয়ে দেখা পেলেন থর্নবার্গের মন-মরা ঘোড়সোয়ারদের। সেখান থেকে প্রায় সাতশোজনের একটা ছোটখাট বাহিনী একই সঙ্গে চলল পথের রেখা ধরে।

থর্নবার্গের ঘোড়সোয়াররা তেলচুকচুকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কেতাদুরস্ত। তারা অবাক হয়ে দেখতে লাগল মারের যুদ্ধবিধ্বস্ত ভাঙাচোরা দলের অবশিষ্ট সৈন্যদের—চোখ ঢুকে গেছে গর্তে, একমুখ দাড়ি, তাদের চালিয়ে নিয়ে চলেছে এক শীর্ণদেহ, তামাটে-মুখ প্রেতমূর্তি।

এমনকি, থর্নবার্গও যখন প্রস্তাব করলেন, 'আপনার কি মনে হয় না, ক্যাপ্টেন, আমরাই এগিয়ে যেতে পারব এখান থেকে ? আপনার লোকজনের বিশ্রাম দরকার, ঘাঁটি থেকেও অনেকটা দূর এসে পড়েছেন আপনারা।' তখন দেখতে পেলেন মারের চোখের দৃষ্টি। আর-কোন কথা বললেন না তিনি।

সন্ধ্যার দিকে এক জায়গায় এসে দেখতে পেলেন ভাগ হয়ে গেছে পথের রেখা, একটা অংশ গেছে উত্তরমুখো, অপর অংশ ভাগ হয়ে চলে গেছে পশ্চিম দিকে ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ জনবিরল বালি-পাহাড়ের প্রান্তরে। ভাগ হবার ঠিক আগে তাঁবু ফেলেছিল, চিহ্ন আছে তার।

মারের দিকে তাকালেন থর্নবার্গ ; মনঃস্থির করে নিলেন মারে, 'আমি যাব উত্তরমুখো—যদি কিছু মনে না করেন মেজর।'

কাঁধ ঝাঁকালেন থর্নবার্গ, পদমর্যাদায় যদিও তিনি মারের উপরে, কিন্তু উন্মাদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে চাইলেন না তিনি। ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন উইণ্ট, কোন

কথা বললেন না। সেই রাতে রেনো কেল্লার দুটি দল তাঁবু ফেলল বাকি সকলের থেকে আলাদা হয়ে। সকালে তাদের বিদায় দিতে দুঃখবোধ করলেন না থর্নবার্গ।

বালির পাহাড়গুলোর ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললেন থর্নবার্গ—পথের রেখা ধরে ধরে। পথ চলা দায়, এগুতে লাগলেন আস্তে আস্তে। গুঁড়ো বালির ভিতরে একেবারে ডুবে যেতে লাগল ঘোড়ার খুর; আর বাতাস উঠলে মিহি দানার ঝাপটা এসে ঢুকতে লাগল নাকে-মুখে। মুখে আড়াল দেবার চেষ্টা করে গম্ভীরভাবে এগুতে লাগল সবাই। দুপুর গড়িয়ে যাবার মুখে তারা যখন তাঁবু ফেলল, তখন এগুতে পেরেছে বড়জোর মাইল কুড়ি। তারা তাঁবু ফেলল একটা নিচু জায়গায়, সেখানকার বেঁটে বেঁটে ঢিবির একটানা চুড়োর আড়ালে বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচল কিছুটা।

তৃণবিরল ঢিবিগুলোকে যেন গ্রাস করল রক্তরাঙা সূর্য; সেই দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে স্তব্ধ আর শঙ্কাতুর হয়ে উঠল সবাই। চারধার নির্জন, নিস্তব্ধ; মরুভূমি নয় এটা, তৃণ-প্রান্তরও নয়—এমন জায়গা, যেখানে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই, এমনকি, পাখীও ওড়ে না, শোনা যায় না ঝিঁঝির আওয়াজও। যদি পরিচয় দিতে হয়, তাহলে বলতে হয়, এ যেন নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে এক পরিত্যক্ত বেলাভূমি—অনন্ত-প্রসারিত শুধু বালিয়াড়ি আর বালিয়াড়ি।

বালির ঝড় উঠল সেই রাতে, আর বালি ছুটতে লাগল নদীর স্রোতের মত। সকালবেলাতেও বালি উড়তে লাগল ছোট ছোট ঘূর্ণিপাকে। কাশতে কাশতে থুথু ফেলতে ফেলতে, জামা-কাপড় থেকে, বুট থেকে বালি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল সবাই। কিন্তু বালি সর্বত্রই, খাবারে বালি, শরীরের ক্ষুদ্রতম খাঁজে খাঁজে বালি। ঘাবড়ে গেল ঘোড়াগুলো; পেটে গুঁতো মেরে মেরে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হল প্রায় মুছে-যাওয়া পথের রেখা ধরে।

লেফটেন্যান্ট ব্রাডি বলল মেজরকে, 'কি মনে করেন স্যর, জলের জন্য কিছু চেষ্টা করা উচিত না? টান পড়েছে জলের।'

—'টান পড়েছে ওদেরও।' পথের দিকে ঘাড় নেড়ে মেজর বলে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

দুপুরের দিকে হারিয়ে গেল পথের রেখা, বালি-বৃষ্টিতে একেবারে মুছে গেছে তার চিহ্নটুকু।

ইণ্ডিয়ানরা যেদিকে গেছে, সেই দিকে লক্ষ্য করে তারা চলল দিনভর; তাঁবু ফেলল নিঃশব্দে, আর তখনই চারধার ঘুরে অফিসাররা জড় করল জলের সব পাত্রগুলো। সামান্যই অবশিষ্ট আছে মূল্যবান জলের। জল ভাগ করে দেওয়া হল জনপ্রতি এক কাপ করে। বাকি পাত্রগুলো রাখা হল গাদা করে, পাহারা দিতে লাগল সার্জেন্ট বেন আর মরিসে।

সকালবেলায় যখন বিউগিল বাজল, ম্লান আভায় ঢাকা সূর্য উঠছে তখন। নিচু হয়ে ভেসে এসেছে বালি আর কুয়াশায় মেশা পর্দা। গুম হয়ে যার যার জলের বরাদ্দ

দিয়ে সবাই দেখতে লাগল, মালটানা ঘোড়াগুলোর পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল পাত্রের বোঝা। ক্যাপ্টেন এলেক্সটনকে নিয়ে একপাশে সরে গেলেন মেজর থর্নবার্গ, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অন্য অফিসাররা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল—দুজনে ঝুঁকে পড়লেন মানচিত্রের উপর।

বালি-পাহাড়ের দেশ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান ছিল এলেক্সটনের। এক মাস আগেও উত্তরের রবিনসন কেল্লায় মোতায়েন ছিলেন তিনি। থর্নবার্গ তাই জিজ্ঞাসা করলেন তাকে, 'কোন্ জায়গায় আছি আমরা বলতে পারেন, ক্যাপ্টেন ?'

—'এই দিকে যাচ্ছি আমরা', ক্যাপ্টেন বললেন, 'নর্থফর্কে পৌঁছনো উচিত ছিল আমাদের।'

—'ম্যাপ দেখে তো তাই মনে হয়। সেটা আমাদের দক্ষিণে ?'

—'আমারও তাই মনে হয়—সেখান থেকে বাঁক নিয়েছে উত্তরে। দক্ষিণমুখো এগুলে নদী না পাওয়ার তো কথা নয়।'

—''কুকুর-সেনা'রা দক্ষিণে যাবে না—'

—'না।'

যেখানে তাঁরা আছেন, সেই জায়গা আর রবিনসন কেল্লার মধ্যেকার একশো পঞ্চাশ মাইল ব্যবধানের কথাই ভাবছিলেন থর্নবার্গ। দেড়শো মাইলেরও ছোট মরুভূমিতে মানুষ মারা যাওয়ার নজির আছে। তিনি বললেন, 'ধারে কাছে যদি ঝরনা থাকে, তাহলে সেদিকেই যাবে ওরা।'

—'আছে একটা ঝরনা—ক্রেজী রাইডারস্ ওয়েল—সেটা খুঁজে পাব কিনা বলতে পারছি নে।'

'চেষ্টা করে দেখুন,' মেজর থর্নবার্গ বললেন।

তাঁরা চললেন উত্তরে, তারপর পশ্চিমে; কুঁজো হয়ে বসে ঘোড়া চালাতে লাগলেন দাঁতে দাঁত চেপে, মনে জেগে রইল ক্রুকের ধমকের তিক্ত মূর্তি ; হাঁটার চাইতে একটু বেশি জোরে ছোটার জন্য ঘোড়ার পিঠে গুঁতো মারতে লাগল সৈন্যরা, বালির ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে পাক খেয়ে উঠতে লাগল কুয়াশা, ঢেকে ফেলল সূর্যকে। ঠোঁটে আর চাবুকে পুরু হয়ে জমতে লাগল মিহি বালির কণা। ঘোড়ার হড়কানো খুরের শব্দে কেঁপে উঠতে লাগল চারদিক, আর কিম্ভূত মূর্তি হয়ে দাঁড়াতে লাগল ঝিকমিক-করা বালিয়াড়িগুলো।

দুপুরের দিকে জুটল আধ কাপেরও কম জল, শুকনো কাঠ হয়ে-ওঠা গলার ময়লাও ধোয়া যায় না তাতে। গর্জাতে লাগল সবাই, ফিস্ ফিস্ করে গালাগাল দিতে লাগল কমিশন না-পাওয়া অফিসাররা। গলা চড়াল না কেউই।

রাত্রি এল। হয়ত কাছেই আছে জলের ঝরনা, হয়ত নেই-ই একেবারে। বালি উড়তে লাগল ঝড়ের মত। আগুন জ্বালাবার মত কিছুই নেই। সমতলের সর্বত্র ভগবানের আশীর্বাদের মত ছড়িয়ে থাকে যে বাইসনের শুকনো গোবর, তা-ও পর্যন্ত

না। ঠাণ্ডা খাবার, নুন-জারানো শুকনো মাংস খেতে হল সবাইকে, শুকনো বিস্কুট আটকে গেল গলায়, তীব্র হয়ে উঠল তৃষ্ণার যন্ত্রণা।

পরের দিন সকালে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে পড়ল ঘোড়াগুলো। তৃষ্ণাতেই এত বেশি কাহিল হয়ে পড়ল যে, বালিয়াড়ির শুকনো ঘাসগুলো খাবার চেষ্টাও করল না তারা। দুপুরের দিকে মরিয়া হয়ে থর্নবার্গ ঘোড়া থেকে নেমে পাশে পাশে হেঁটে যাবার হুকুম দিলেন সবাইকে।

সেইভাবে হোঁচট খেতে খেতে ঘোড়াগুলো চলল, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ঘোরে ঘুরে বেড়ানো মানুষের মত। ঘুরে মরল তারা অসীম নৈরাশ্যে; প্রতিটি বালিয়াড়ির পিছনে আবার বালিয়াড়ি, প্রতিটি পাহাড়ের পিছনে বালিকণার ধূ-ধূ বিস্তার।

যখন তারা শাদা রং তেতো জলের ছোট ডোবা খুঁজে পেল, তখন তার জল খেয়েই চলল ঢকঢক করে, তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর সেই রাতেই মারা গেল আটটা ঘোড়া।

তবু তখনো কোন চিহ্ন নেই ইণ্ডিয়ানদের।

পরদিন হাল ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণে ফিরলেন থর্নবার্গ। এবার বালির ঝাপটা মুখে লাগার চাইতে পিঠেই লাগল বেশি। কিন্তু বাতাস হয়ে গেল বরফের মত ঠাণ্ডা। রাতে আগুন ছাড়া সবার ভোগান্তি উঠল চরমে; অসুস্থ হয়ে পড়ল আরও অনেকে। মারা গেল আরও ঘোড়া; যারা রইল, তারা চলল আস্তে আস্তে হেঁটে, নাল-খসা পা টেনে টেনে।

তাদের চলার গতি অশুভ শব-শোভাযাত্রার গতির মত, যেন ফিরে আসছে কোন্ এক নিষিদ্ধ দেশ থেকে। মেজরকে বললেন অ্যালেক্সটন, 'ওরা যদি ফিরে যায় ওখানে, তাহলে ভগবান যেন দয়া করেন ওই ইণ্ডিয়ানদের।' অ্যালেক্সটনের এই কথার মধ্যেই যেন দলের সকলের মনের ভাব।

তাঁবু ফেলল তারা, চলতে শুরু করল আবার; আবার ফেলল তাঁবু, কম্পাস দেখে দেখে, ঘোড়াগুলোকে তাড়াতে তাড়াতে আর মরা ঘোড়াগুলোকে পিছনে রেখে টেনে হিঁচড়ে চলতে লাগল আবার। খাবার ফুরিয়ে গেল তাদের, শিশুর মত প্রলাপ বকতে লাগল জনকয়েক।

তিনজনকে পিছনে ফেলে রেখে এল ওরা নর্থফর্কে পৌছনোর আগে, সেখানে পেল নদীর জল, সবুজ ঘাস, এমনকি, দূর চক্রবাল রেখায় একটা বাড়ি, তার চিমনিতে নীল ধোঁয়ার রেখা।

একদিকে এগিয়ে চললেন মারে পথের রেখা ধরে ধরে, ক্রমশ ক্রমশ ডাকোটার বিশাল বাত্যাতাড়িত উষর অঞ্চলের গভীরতম প্রদেশে, সর্বদাই পেতে লাগলেন শী-এনদের সামনে এগিয়ে চলার সংবাদ। কিন্তু অন্য দিকে, দু ভাগে ভাগ হয়ে যাবার পর শী-এনদের অর্ধেক যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বালির পাহাড়গুলোর মধ্যে, তারা

এমন বেমালুম মিলিয়ে গেল, যেন তাদের অস্তিত্বই ছিল না কোনদিন। শী-এনরা যে দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে প্রচুর প্রমাণ মিলল তার। এক কানাডিয়-ফরাসি পশম সংগ্রাহক তার লাইনবাঁধা ফাঁদগুলো নিয়ে চলেছিল ব্ল্যাকহিলের দিকে, সে খবর দিল, শী-এনদের সে দেখেছে; দীর্ঘ পথ চলার ধকলে কাহিল হয়ে পড়েছে মেয়ে-পুরুষ-শিশুরা; কিন্তু তিনশো হবে না তারা, একশো কুড়ি কি তার চেয়ে বেশি নয়। মীড কেল্লার সঙ্গে যুক্ত দুজন—স্থ-স্কাউটও খবর দিল, ওই রকম সংখ্যারই শী-এনদের একটা দল দেখতে পেয়েছে তারা।

বালির পাহাড়গুলোর মধ্যে যারা ঢুকল, তাদের কোন চিহ্ন, কোন সংবাদ, কোন হদিশই পাওয়া গেল না তবু। বালিয়াড়ির বিস্তীর্ণ প্রান্তর ডেকে নিয়েছে তাদের, দিয়েছে তার ভয়াবহ আশ্রয়, গ্রাস করে ফেলেছে সম্পূর্ণভাবে।

এমনকি, ক্রুকের মত ইণ্ডিয়ান লড়িয়ে, যিনি সমতল প্রদেশ সাফ করেছেন ধুয়ে মুছে, তিনিও মাটি থেকে তুলতে পারলেন না হারিয়ে-যাওয়া ইণ্ডিয়ানদের। রবিনসন কেল্লা থেকে পশ্চিমে এগুতে লাগল তৃতীয় অশ্বারোহীর পাঁচটা দল, ধুলোয় ঢাকা ঘোড়াগুলোকে বালিয়াড়ির ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে, সূর্যের আলো আড়াল-করা দীর্ঘ নিঃসঙ্গ পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরতে লাগল তারা সামনে-পিছনে। সারাটা অঞ্চল চুঁড়ে ফিরে এল তারা রবিনসনে; আবার পাঠান হল তাদের। আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখল বালি-পাহাড়ের প্রান্তর। সিডনি থেকে দলের পর দল চলল প্ল্যাটে নদী ছাড়িয়ে উত্তর দিকে, স্বাদ জানল তারা ধু-ধু বিস্তৃত মরুভূমির।

—'কোথাও কোন চিহ্ন নেই শী-এনদের।' বারংবার টরে-টক্কার ঝঙ্কার উঠতে লাগল তারে তারে। 'কোথাও কোন চিহ্ন নেই ইণ্ডিয়ানদের—।' দেশের রক্ত-তৃষ্ণায় ভাঁটা পড়বার পক্ষে যথেষ্ট একঘেয়ে; আর ভুলতেও আরম্ভ করল গোটা দেশ। যতক্ষণ না ইণ্ডিয়ানরা শিকার হয় অথবা নিজেরাই শিকারী হয়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত তত গুরুত্ব নেই তাদের; তারা যে আছে, এই সত্যটুকুর কোনই গুরুত্ব রইল না আর। তারা যে রয়েছে নেবরাস্কার বালির পাহাড়গুলোর মধ্যে এই সত্যটুকু বালির পাহাড়গুলোর অস্তিত্বের চেয়েও আর বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আছে তো থাকুক না ওরা ওখানে।

হিসাব নেওয়া হল কানসাসের, দেখা গেল এমন কোন ব্যাপারই ঘটেনি—একক কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনাও না—যেক্ষেত্রে শী-এনদের হাতে নিহত হয়েছে কিংবা নিগ্রহ ভোগ করেছে কোন মার্কিন নাগরিক; ঘর-দোরে আগুন লাগানোর কোন ঘটনাও না; ঘোড়া তাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে দল থেকে, গরু-ছাগল জবাই হয়েছে খাবার জন্যে, খবর এই পর্যন্তই।

আশেপাশের ঘাঁটিগুলো কিন্তু ভুলল না শী-এনদের। খোঁজার পালা চলল ক্রুকের নিরন্তর তাগিদে; বালিয়াড়ি আর ঊষর সমতলের বুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলল দলের পর দল রবিনসন কেল্লা থেকে।

এমনি একটি দল তিন নম্বর অশ্বারোহীর একটা কোম্পানি ; ক্যাপ্টেন জে. হি জনসনের অধীনে দলটি অক্টোবরের শেষের দিকে রবিনসন দুর্গ ছেড়ে দক্ষিণে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে, হুঁশিয়ার হয়ে সামনে পিছনে দেখে শুনে ; প্রতিটি উপত্যকা, প্রতিটি পাথরের খাঁজ, দু-চারজন মানুষ যার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে এমন প্রতিটি গা পর্যন্ত দেখে দেখে দুদিন ধরে খুঁজতে খুঁজতে এগুতে লাগল দক্ষিণমুখো। দ্বিতীয় দিনে দুপুরের প্রথম দিকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল উত্তর থেকে ; সঙ্গে সঙ্গে এল অন্ধ মেঘের স্তূপ ; শীতের প্রথম তুষারপাতের হিমের সম্ভাবনা। লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে দাঁড় করালেন ক্যাপ্টেন জনসন, বাতাসের দিকে তাঁর গালটা ঘুরিয়ে নিয়ে কাঁ ঝাঁকালেন তিনি।

—'ফিরব নাকি, স্যর ?' জিজ্ঞাসা করল লেফটেন্যাণ্ট অ্যালেন।

—'ফেরাই যাক।' মন ঠিক করে ফেললেন তিনি।

—'আমার মনে হয়, ভূতের পিছনে ছুটছি আমরা।' অ্যালেন বলল, 'মনে হয় কোনকালেই ছিল না শী-এনরা।'

বাতাসের দিকে হাতটা আড়াল দিয়ে তাদের কাছে এগিয়ে এল সার্জেণ্ট ল্যাম্বি ল্যাম্বির মুখের রং গাঢ় লাল, একমুখ দাড়ি, ধোঁয়া উঠছে নিশ্বাসে, তার কম্পিত মাথাটা নড়ে—কথায় সায় দিয়ে দিয়ে; ভেবে চিন্তে সে বলে উঠল, 'বরফ পড়বে।'

—'ভূতের পিছনে ছুটছি আমরা।' আবার বলল লেফটেন্যাণ্ট অ্যালেন, কথার অর্থটা যেন পেয়ে বসেছে তাকে।

—'স্নানটা সেরে নিয়েছি আমি।' একবার বরফ পড়ে গেলে আর কখনো সে স্না করে না, এইটে সার্জেণ্ট ল্যাম্বির মহাগর্বের বিষয়।

কি যেন একটা দেখতে পেলেন জনসন, তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। ল্যাম্বি ঘোড়াটা ভীতু, চমকে ওঠে থেকে থেকে। তার সামনে সার বেঁধে ঘোড়সোয়ার কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে, বাতাসের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তুলে দিয়েছে কলারগুলো তাদের সম্পর্কে ঘৃণার অন্ত নেই ল্যাম্বির। 'ওহো!' উল্লাসভরে বলে উঠল সে 'ওহো! এখনো ঠাণ্ডা পড়েনি ; পড়বে পড়বে।' সৈন্যদের দুর্গতি তার কাছে হাসি ব্যাপার। রসিয়ে রসিয়ে সে বলল ক্যাপ্টেনকে, 'ওদের পাঠিয়ে দিন স্যর, বাড়ি বসবে গিয়ে উনুনের ধারে।'

কিছু একটা দেখতে পেয়েছেন জনসন; গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে এগু লাগলেন সামনে। হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন দলটাকে পিছন পিছন আসতে পশ্চিমের ঢলে-পড়া সূর্যকে আড়াল করতে চোখের উপর হাত রাখলেন তিনি।

—'জিনিসটা কি, স্যর ?'

উত্তর দিলেন না জনসন ; ধীরে ধীরে দলটা চলল রৌদ্রদীপ্ত পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণ আর পশ্চিমের আকাশের রং নীল ; উত্তর আর পুবের ধূসর রং গিয়ে মিশে

মাটির সঙ্গে চওড়া কালো রেখায়। আকাশটা ভাগ হয়ে গেছে হিমেল অবসন্নতায়; শীতের রঙ্গলীলা শুরু হয়ে গেছে ছুরির মত ধারালো বাতাসের ঝাপটায়।

এবারে দেখতে পেল সবাই, তবু কথা বলল না কেউই। এটা এমন একটা কিছু যার প্রমাণ চাই প্রথমে, এ সম্পর্কে সকলেই একমত। স্বপ্নের বিভীষিকা যেমন নিশি-পাওয়াকে টানে তেমনিভাবেই সেই জিনিসটা টেনে নিয়ে চলল তাদের। কিন্তু তাড়াহুড়া করল না কেউ। জিনিসটা যতই মূর্তিময়, কায়াময় হয়ে উঠতে লাগল, ততই তাদের গতি হয়ে উঠল শ্লথ; তারপর এক সময় থেমে গেল দলটা।

একজন প্রশ্ন করে উঠল, 'কি ওটা?'

সবার মনের কথাই এটা, এটা কোন প্রশ্ন নয়; সার্থীত্বের ভাল জিনিসটুকু জানা আছে যাদের, যাদের জানা আছে অগ্নিকুণ্ডের উষ্ণতা, জানা আছে সমতলের ফৌজি জীবনের ছোট-বড়র সহজ সম্পর্ক—এটা বরং সেই মানুষদের একটা মনোভাব, একটা প্রতিধ্বনি, অস্বস্তিভরে প্রকাশিত আতঙ্কের একটা অভিব্যক্তি। ওটা কি, বুঝতে পারল তারা; বুঝতে পারল প্রমাণ জড় করার আগেই। বুঝতে পারল, খোঁজার পালা শেষ হল তাদের।

তারা দেখতে লাগল, এগিয়ে আসছে সেটা পশ্চিম প্রান্ত থেকে, আসছে তাদের দিকেই, এত আস্তে আস্তে, ঠিক যেমন করে মুমূর্ষু জন্তু টলতে টলতে ফিরে আসে তার আস্তানায়। নারী, পুরুষ ও শিশুরা আছে সঙ্গে, প্রায় একশো কুড়িজন হবে সংখ্যায়। কিন্তু প্রথম দিকে কোন একটা জিনিস বলেই মনে হল তাদের। পুরুষ, নারী আর শিশু বলবে না কেউ ওদের।

প্রায় পঞ্চাশটা ঘোড়া আছে দলের সঙ্গে; কিন্তু ঘোড়া সেগুলো নয়, চারটে পায়ের উপর খাড়া শুধু; প্রতিদিন যারা দলাই-মলাই করে নিজেদের ঘোড়া সেই ঘোড়-সোয়ারদের কাছে ঘোড়াই নয় এগুলো। ঘোড়াগুলো আগে ছিল তাজা টগবগে, এখন তারই প্রহসনমাত্র—শুধু হাড়, আর হাড়ের উপর চামড়ার ঢাকনা। তাদের পিঠের উপর যারা বসে আছে, একসময় তারা ছিল শিশু, এখন শুধু ছেঁড়া কাপড়-জড়ানো পুঁটুলিমাত্র, ছেঁড়া নেকড়ার ফালি উড়ছে উত্তুরে হাওয়ার ধারালো ঝাপটায়।

বাদবাকি দলটা আসতে লাগল পায়ে হেঁটেই; ছেঁড়া কাপড়ের ফালি উড়তে লাগল বাতাসে, এক 'মরণ-নাচে'র ভয়াবহ সৌন্দর্য ফুটে উঠল তাতেই। নারী আছে, পুরুষ আছে দলে; গর্তে-বসা চোখ, তোবড়ানো গাল, কাক-তাড়ুয়ার মত কঙ্কালসার সব। গায়ে তাদের ইণ্ডিয়ান জামা-কাপড়। ঘোড়সোয়াররা দেখতে লাগল—এটা একসময় ছিল চামড়ার তৈরি শিকারীর জামা, ওটা ছিল চামড়ার পোশাক, আর এগুলো একসময়কার জুতো, ঝকমকে, বুটি-দেওয়া শী-এনদের জুতো—সমতলের অন্য কারুর পায়ের জুতোর মতই নয়। তারা আরও দেখতে পেল, কতকগুলো জরাজীর্ণ কম্বল—একসময় সেগুলোই ছিল লাল, হলদে, আর সবুজের প্রাচুর্যে সুন্দর। বালি-মাখা কম্বলগুলো কি ছিল তা বুঝতে পারল তারা।

কিন্তু মানুষগুলো কি ছিল তা বুঝতে পারল না কেউ। মরা চোখ গোপন করে রাখে রহস্য; আর হেঁটে-চলে বেড়ালেও ওই মানুষগুলোর চোখ মরে গেছে অনেক আগেই। তাদের কালো চুল উড়তে লাগল এলোমেলো হয়ে, চুলের কালো ফিতের মত উড়তে লাগল কাপড়ের ফালি। পা খালি অনেকেরই, অন্যদের পায়ে জুতোগুলো পুরনো চামড়ার কয়েকটা ফালি মাত্র। তারা হাঁটতে লাগল, কারণ, একমাত্র এই হাঁটার শক্তিটুকুই অবশিষ্ট আছে তাদের। তারা হাঁটতে লাগল, তার কারণ, ধূ-ধূ বালির হিমেল প্রান্তরে বিশ্রামের স্থান নেই কোথাও, সেখান থেকে পালাবার চেষ্টাও নিরর্থক। তাদের না-বলা কাহিনী—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণার কাহিনী। কিন্তু অহংকার নেই সে-কাহিনীতে, আর তাদের আশাহত, বিচূর্ণ সত্তার গর্বটুকু আপনা-আপনিই সঞ্চারিত হল সৈন্যদের মনে।

কাছে এসে পড়ল তারা; যত কাছে আসতে লাগল ততই চাঞ্চল্য—সব-কিছু উপেক্ষার এক মন্থর আবর্ত জেগে উঠল তাদের পিছন দিকে। ঘোড়ার পিঠে চাপানো শিশুদের চারধারে ঘিরে ছিল মেয়েরা, তারা এবার চলে যেতে লাগল পিছনে। সামনের দিকে চলে এল পুরুষেরা, অর্ধবৃত্তাকারে একটা রক্ষাব্যূহ তৈরি হয়ে গেল তাতে। তাদের হাতের মুঠোয় ধরা অস্ত্র—বন্দুক আর পিস্তল; শাদা-ঘোড়সোয়ারদের মুখোমুখি দাঁড়াল তারা সাহসভরে—যেমন করুণ, তেমনি উদ্ধত সে সাহস। প্রায় অলক্ষ্যেই গতি শ্লথ হয়ে আসছিল তাদের, এবার স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারেই।

আর, লেফটেন্যান্ট অ্যালেন বলল, 'এদেরই খুঁজে মরছি আমরা।' থর থর করে কেঁপে উঠল ল্যান্সি। দীর্ঘদেহ, স্বাস্থ্যবান মানুষ সে, এ ধরনের জিনিসের দিকে সে তাকাতে পারে না সহজভাবে। যে জিনিস সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়, তাকেই যেন আবার ঝালিয়ে নেবার জন্য ক্যাপ্টেন জনসন বললেন; 'এরাই তো 'কুকুর-সেনা'রা?'

কেউ উত্তর দিল না তাঁর কথার। বাতাস বইতে শুরু করল, শব্দ উঠতে লাগল সেই ক্লান্ত বাতাসের। এ ছাড়া কিন্তু সব চুপচাপ, এমনকি দুটো দুটো করে পাশাপাশি দাঁড়ানো ঘোড়াগুলোও নড়ল না একটুও। ইণ্ডিয়ান শিশুরা পর্যন্ত কোন শব্দ করল না। দলের পুরোভাগে, সার্জেন্ট ল্যান্সির ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে বারবার জামার হাতায় বিউগিলটা ঘষতে লাগল বিউগিল-বাজিয়ে। সোজা খাড়া হয়ে জিনের উপর বসে রইল সকলে, হিমের কোন চেতনা নেই তাদের, যে বাতাসে আগে এত কাঁপুনি ধরিয়েছিল তার সম্পর্কেও খেয়াল নেই।

কিছু-একটা করতে হবে জনসনকে; দলের অধিনায়ক তিনি। যথাকর্তব্য স্থির করে সেই অনুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব তাঁর। বার হাজার সৈন্যের সমতলের ফৌজিদল যা পারেনি, তিনি তাই পেরেছেন; শী-এনদের হাতে পেয়েছেন তিনি; এবার এরা তাঁর বন্দী—পালাতেও পারবে না, বাধা দিতেও পারবে না। সাফল্যের আনন্দ মনে মনে চেপে রেখে ঘোড়াটাকে এগিয়ে যেতে সংকেত করলেন তিনি; কিন্তু লাভ হল না কোন। সৈন্যদল আর শী-এনদের সারির মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালেন যখন, তাঁর মনে হল

তিনি যেন একা, যেন একা একাই দাঁড়িয়ে আছেন বালির সমুদ্রে। বাতাসের গতি ইণ্ডিয়ানদের দিকে, কিন্তু তবু কথা শুনতে পাবে তাঁর লোকজন। দুটো দলের মধ্যে ব্যবধান মাত্র হাত চল্লিশের।

কম্পিতকণ্ঠে তিনি বললেন, 'শুনছ, শুনতে পাচ্ছ তোমরা?' জিজ্ঞাসা করলেন, 'সর্দার কে তোমাদের—কে তোমাদের মোড়ল?' তাদের মুখের দিকে তাকালেন তিনি, তোবড়ানো গাল, বালিমাখা, শুকনো পার্চমেণ্টের গর্তে বসানো কালো কালো চোখ। একটুও নড়ল না তারা। হয়ত ঔদ্ধত্য, হয়ত ক্লান্তি, কিংবা মোহাচ্ছন্ন বিহ্বলতায়।

—'শুনছ,' তিনি বললেন, 'ইংরেজি বোঝ—শাদা-মানুষের কথা শুনতে পার?'

—'শাদা-মানুষের কথা।' আবার বললেন তিনি, 'কথা বল।'

অর্ধেক ঘুরিয়ে নিলেন তিনি ঘোড়াটাকে। তাঁকে লক্ষ্য করছিল সার্জেণ্ট ল্যাম্পি। বিউগিলটা তখনো ঘষছিল বিউগিল-বাজিয়ে। ঘাড় নাড়ল লেফটেন্যাণ্ট অ্যালেন।

—'আমি সাবধান হয়ে থাকব, ক্যাপ্টেন।' সার্জেণ্ট ল্যাম্পি বলল।

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ঘোড়সোয়ারদের সারিতে গিয়ে দাঁড়াল তাঁর ঘোড়াটা। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন জনসন।

—'সাবধান,' সতর্ক করে দিল ল্যাম্পি।

ঘোড়া থেকে নামল অ্যালেনও। জনসনকে সাহায্য করবার, আতঙ্ক আর ব্যর্থতার ভাগ নেবার আন্তরিক প্রেরণা অনুভব করল সে। ক্যাপ্টেনের কাছে এগিয়ে এল সে, দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ইণ্ডিয়ানদের। সূর্য হেলে পড়ল—হিমেল উত্তুরে হাওয়ায়-মোড়া ক্ষীণকায় সূর্য। আর মেঘের কালো রেখাটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আকাশের বুকে।

—'ইংরেজি জানে না ওরা।' হতাশভাবে বললেন জনসন।

—'জানে না—'

—'ভান করতেও পারে না ওরা; তবে ওরা যে ইংরেজি জানে এমন কথাও শুনিনি। বুনো ওরা।'

—'ওদের পাকড়াও করলে কেমন হয়।' অ্যালেন বলল।

—'গায়ের জোর লাগে না ট্রিগার টিপতে। এমন ব্যাপারে লোকক্ষয় করা পছন্দ হয় না আমার।'

—'বাধা দেওয়া যে বাতুলতা সে ওরা বুঝতে পারবে, ভেবে দেখেছেন তা?'

—'এখন ওদের কাছে কোন্‌টা যে বাতুলতা নয়, তা বুঝতে পারছি না।' জনসন বললেন, 'এতদূর যখন মানুষ গিয়ে পৌঁছয়।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, হেঁটে চলে এলেন সৈন্যদের কাছে। গোটা সারিটা তিনি জিজ্ঞাসা করে ফিরলেন, শী-এন ভাষা কেউ জানে কিনা। স্থ ভাষার দু-একটা কথা জানে কেউ কেউ, কিন্তু ওমাহার একজনমাত্র জানাল যে সে শী-এন ভাষা জানে। সে বলল, সে জানে একটু-আধটু।

আসলে সে কিছুই জানে না বললে হয়—জানে মাত্র ছিটেফোঁটা। ওমাহাতে একটা দো-আঁশলা ইণ্ডিয়ান ছিল, সে বলত সে পাঁচটা ইণ্ডিয়ান ভাষা জানে, এক গ্লাস মদের দাম পেলেই সে শিখিয়ে দিত যে-কোন লোককে। কিন্তু তাতে কথা চালাবার মত কিছুই শেখেনি সে। জনসনকে সে জানাল, একটু চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছে। দু'জনে তখন ফিরে গেলেন ইণ্ডিয়ানদের দিকে।

—'আত্মসমর্পণ কর।' জনসন বললেন।

অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল ছেলেটি। মনে মনে চিন্তা করে নিল সে, 'দাস হও' কিংবা 'বন্দী হও' কথাটা বলতে পারে সে, কিন্তু 'আত্মসমর্পণ কর' বলবে কেমন করে। ভাসা-ভাসা ভাবে, তার মনে আছে শী-এন ভাষায় শাদা-মানুষের আত্মসমর্পণ করার এক অর্থ, আর কোন ইণ্ডিয়ানের আত্মসমর্পণ করার আর-এক অর্থ। এমনিভাবে অসংখ্য জিনিসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পাল্টে যায় কথার অর্থ, ভারি মজার ভাষা। গোলাবাড়ির এক চীনে রাঁধুনিকে জানে সে, সে জাঁক করে বলে বেড়াত যে সু ভাষা সে ভালই জানে।

অধৈর্য হয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন জনসন, 'যাও না এগিয়ে, একটু চেষ্টা করে দেখ।'

অস্বস্তি বোধ করতে করতে একটু এগিয়ে গিয়ে ইণ্ডিয়ানদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কি একটা বলল ছেলেটি। প্রাণপণে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল সে, চেঁচিয়ে উঠল আবার; বাতাসের মুখে ভেসে গেল তার কথার শব্দ—আদিম-ধরনের অর্থহীন, হাস্যকর শোনাল যে শব্দ। তখন ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে একটু একটু করে পাশ কাটিয়ে সরে যেতে লাগল সে।

—'অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখ।' বাতলে দিলেন জনসন। ভাষার প্রাচীর ভেঙে দেবার প্রায় এক প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করলেন তিনি; প্রয়োজন বোধ করলেন তাড়াতাড়ি করার; যেন ওদের নিরাবরণ, খড়ি-ওঠা চামড়া থেকে কাঁপুনিটুকু সঞ্চারিত হতে পারে তাঁর নিজের, আর সৈন্যদের শরীরে। ঝড় ঘনিয়ে আসছে অতিদ্রুত।

আরও কয়েকটা কথা বলল ছেলেটি; এবারে আলোড়ন উঠল ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে, দেখা দিল এক চাঞ্চল্য। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল তারা—বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল তাদের কথা; কানে আসতে লাগল একটা গুঞ্জনমাত্র, নিছক শব্দটুকু। সেই শব্দটুকু একসময়ে থেমে গেল। দলটা ভাগ হয়ে গেল দু ভাগে আর এগিয়ে এল এক বৃদ্ধ, এক জরাগ্রস্ত অতি-বৃদ্ধ, জীর্ণ, শীর্ণ, লোলচর্ম,—এত বৃদ্ধ যে ওই শোচনীয় দলটার মধ্যে তার অস্তিত্বটাই অবিশ্বাস্য। ছেলেটার কাছ পর্যন্ত চলে এল সে, এত কাছে এসে দাঁড়াল যে পিছু হটে গেল ছেলেটি। কথা বলতে লাগল সে, নিচু গলায়, আস্তে আস্তে, অতি-যন্ত্রণায়—অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা তার কথা বলার প্রচেষ্টায়।

—'কি বলছে ও?' জিজ্ঞাসা করলেন জনসন।

—'বুঝতে পারছি না,' অস্বস্তিভরে চিন্তা করতে করতে উত্তর দিল ছেলেটি— 'মনে হচ্ছে ও যেন বলছে আমাদের চলে যেতে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।'

—'আত্মসমর্পণ করতে হবে, বুঝিয়ে বল ওকে।'

—'হ্যাঁ, কথাটা ও বুঝতে পেরেছে মনে হচ্ছে,' মাথা নাড়ল ছেলেটি। 'আমরা ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, তাই ও বলতে চায় মনে হচ্ছে।'

কথা বলে চলল বৃদ্ধ। কখনও আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল পিছনের লোক-জনদের দিকে, কখনো দেখাতে লাগল সৈন্যদের মাথার উপরের আকাশের দিকে, ঝড় ঘনিয়ে আসছে সেদিক থেকে, কখনও বা মাথা ঝাঁকাতে লাগল গভীর দুঃখে।

—'ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বলছে আমাদের।' মনে মনে ভেবে ছেলেটি বলল, সাফল্যলাভের অনিশ্চিত হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তার মেচেতা-ভরা মুখখানা, 'ওরা দেশে ফিরে যাবে, এই ধরনের কিছু বলছে, শুধু দেশে ফিরে যাবার কথা। বলছে, আমাদের চলে যেতে—'

—'ওকে বল—' আর তখনই জনসন বুঝতে পারলেন ওকে কিছু বলতে চেষ্টা করা ছেলেটার পক্ষে কত অর্থহীন। ব্যবধান রয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে ; আর এ ব্যবধান ভাষার ব্যবধানের চেয়ে বেশি, এ একটা যুগ, একটা ইতিহাস, অতীত ও বর্তমানের বেদনাদায়ক ব্যবধান।

কাঁধ ঝাঁকালেন জনসন, ছেলেটাকে বললেন পিছনে তার দলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে। তখনও বৃদ্ধটি দাঁড়িয়ে রইল একা কৌতূহলী, প্রাচীন, ক্লান্ত, হিমজর্জর। দাঁড়িয়ে রইল সে উদ্দেশ্যহীনের মত, বৃদ্ধ বয়সের সমস্ত বেদনা আর দুঃখ নিয়ে—অনেক কিছু দেখেছে সে, জেনেছে অনেক কিছু, অনেক সয়েছে যন্ত্রণা—তারই প্রতিমূর্তি।

'এখন কি করবেন আপনি ?' লোকজনদের দিকে, ম্লানায়মান সূর্য, আসন্ন ঝড়ের দিকে তাকিয়ে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন করল অ্যালেন, উত্তরের জন্য ক্যাপ্টেনের চেয়েও বেশি যন্ত্রণা তার—'কি করব ?'

খেঁকিয়ে উঠল ল্যাম্সি, 'এই বাজনদার, হতভাগা শিঙেটা ঘষা বন্ধ কর্‌তো !'

মৃদুকণ্ঠে জনসন বললেন, 'সার্জেন্ট ল্যাম্সি, তুমি ফিরে যাও, কর্নেল কার্লটনকে বুঝিয়ে বল অবস্থাটা, ঠিক যা তাই বলবে তাঁকে। বলবে যে, আমি চাই দুটো কোম্পানিকে যেন পাঠানো হয়, আর তার সঙ্গে ওই হতভাগাগুলোকে নেবার মত অনেকগুলো গাড়ি। তুমি না আসা পর্যন্ত আমরা ওদের সঙ্গেই থাকব। হয়ত ওরা নিজের ইচ্ছাতেই আসতে পারে।'

—'কামান আনতে বলব, স্যর ?' সার্জেন্ট মনে করিয়ে দিল।

—'কি বললে ?'

—'বললাম, স্যর, একটা কামান আনবে নাকি ?'

—'আমি যা বললাম, তাই বল তাঁকে।'

—'উনি কামানই চেয়ে বসবেন। স্যর আপনি তো জানেন ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপার হলেই কামান সম্পর্কে কেমন তৎপর তিনি। আমি কি বলব যে, কামান চান না আপনি?'

—'যা বলতে বললাম, তাই বল তাঁকে।' বিড়বিড় করে বললেন জনসন, 'কর্নেল নিজে যদি কামান পাঠাতে চান তো সেটা তাঁর ব্যাপার, তোমার নয়, সার্জেণ্ট।'

—'আচ্ছা, স্যর।'

—'তুমি বরং এগোও।' মাথা নাড়লেন জনসন।

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সার্জেণ্ট। দস্তানা খুলে ফেলে নিশ্বাস দিয়ে হাত দুখানা গরম করে নিচ্ছিল অ্যালেন। বলে উঠল, 'বড় ঠাণ্ডা।'

—'কি বললে?'

—'ঠাণ্ডা বাড়ছে—মনে হচ্ছে বরফ পড়বে।'

লক্ষ্যহীন ভাবে জনসন বললেন, 'পিছনের পূব অঞ্চলে বরফ পড়ার আগে গরম হয়।'

চলতে শুরু করল ইণ্ডিয়ানরা। সৈন্যদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার কোন চেষ্টাই তারা করল না। উপরন্তু, তাদের সামনে দিয়েই চলল সার বেঁধে। পুরুষদের হাতে তখনো উঁচিয়ে-ধরা বন্দুক, কঙ্কালসার দলটার পাশে পাশে ঘের দিয়ে চলল তারা। সৈন্যদের পেরিয়েই পিছিয়ে পড়ল তারী দলের পিছন দিক রক্ষা করার জন্য। তাদের এগিয়ে যাওয়াটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন জনসন; বুড়ো সর্দার যেভাবে নিয়ে চলেছে তারই তালে তালে পা মিলিয়ে চলেছে সবাই। তারপর লেফটেন্যাণ্ট অ্যালেনের দিকে ঘাড় নাড়তেই সে তাদের চারপাশে ঘোড়সোয়ারদের ঘুরিয়ে নিয়ে চলল পিছু পিছু।

ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি জোরে চলার প্রয়োজন হল না তাদের, আর, এভাবে চলতে গিয়েও সবাইকে বারবার থামবার নির্দেশ দিতে হল জনসনকে। তীব্র তীক্ষ্ণ উত্তুরে হাওয়ার মুখে পথ চলতে গিয়ে যে সামান্য শক্তিটুকু ছিল, তাও যেন শেষ হয়ে আসতে লাগল শী-এনদের। ঝড়ের ঠাণ্ডা ঝাপটার মুখে নুয়ে পড়ে প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়তে লাগল মাঝে মাঝে।

সামনে কালো দিগন্তরেখা; বিশাল মেঘগুলো মাথা তুলতে লাগল নীল আকাশে, সুবিস্তৃত কারখানা-শহর থেকে ওঠা ধোঁয়ার মত। পিছনে সূর্যাস্তের আলো পড়ে সৈন্যদের দেখাতে লাগল ছায়ামূর্তির মত; ভেড়ার চামড়ার পাড়-দেওয়া কোট গায়ে তাদের, পরনে নীল উর্দি, চলেছে তেলচুকচুকে তেজী ঘোড়ার পিঠে।

একবার মাত্র জনসন কথা বললেন, বললেন: 'মূর্খের দল, মূর্খ, সব মূর্খ।'

কিছু পরেই ঘাঁটি গাড়ল ইণ্ডিয়ানরা। প্রায় অর্ধেক পুরুষ সৈন্যদের মুখোমুখি গুঁড়ি মেরে বসল বন্দুক নিয়ে; বাকি সবাই হাতে-হাতে সাহায্য করতে লাগল রাত্রিবাসের আয়োজনের ব্যাপারে। মমতাভরে শিশুদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে

আদরের পর্ব চলল একটানা ; সুদিনে সঞ্চিত কোন মূল্যবান সম্পত্তি পেলে যেমন ভাবখানা হয় ভিখিরির, ঠিক তেমনি। এসব অতি সহজেই দেখতে পেল সৈন্যরা, কারণ, ঘাঁটির হাত ছাব্বিশের মধ্যে এগিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানরা বাধা দিল না বন্দুক উঁচিয়ে। শিশুদের যে কি হাল হয়েছে, তাও দেখতে পেল সৈন্যরা—উঁচু উঁচু পেট বীভৎস কঙ্কাল, হাসে না, আধো-আধো কথা বলে না, এমন কি, আর্তনাদও করে না এ-শিশুরা—অর্ধ-উলঙ্গ বাপ-মায়ে যা দিতে পেরেছে, সেই সব ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ভয়াবহ প্রেত-শিশুর দল।

নারী আর যোদ্ধারা চারধারে ঘুরতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। শুকনো কাঠকুটো, শুকনো ঘাস অথবা জ্বালানির জন্য যা হোক একটা কিছু খুঁজতে শুরু করল তারা। জঞ্জালও পেল অল্প কিছু কিছু ; উষরতম জায়গাতেও খুব ভাল করে খুঁজলে মিলে যায় ও-জিনিস। তাই জড় করে করে ছোট ছোট আগুনের কুণ্ড জ্বালাল তারা সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে। খাবার নেই কিছুই ; ওই আগুনে রান্নার আয়োজন করতে দেখা গেল না কাউকে ; আগুনের ধারে-কাছেও গেল না কেউ। বরং শিশুগুলোকে আগুনের চারপাশে এনে উত্তুরে হাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের ঘিরে প্রাচীর গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল নিজেদের দেহ দিয়ে।

যতক্ষণ পারলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন জনসন, তারপর রসদ-বোঝাই একটা ঘোড়ার কাছে গিয়ে টেনে নামালেন দু বস্তা বিস্কুট। সেই বস্তা দুটো নিয়ে তিনি চললেন ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটির দিকে, এসে দাঁড়ালেন প্রায় পাহারাদারদের বন্দুকের মুখে। ওরা যে গুলি করতে পারে, ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাঁর উপর, কিংবা একটা কিছু করতে পারে—সেরকম কোন ভয় জাগল না তাঁর। ভয় তাঁর অন্য কিছুতে—ওরা যে এত কাছে রয়েছে, ভয় জাগল তাঁর তাতেই, ওরা টিকে আছে, এই সত্য থেকেই ভয় জেগে উঠল তাঁর। ওদের দুর্দশার ভয়াবহ আকর্ষণের প্রভাব এড়াতে না পেরে, ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বস্তা দুটো মাটিতে নামিয়ে রাখলেন তিনি। বস্তা দুটো খুলে বিস্কুট তুলে নিলেন কয়েকটা, কিছুক্ষণের জন্য তুলে ধরলেন উঁচু করে, তারপর ফেলে দিলেন পিছনে। অতি দ্রুত ঘনিয়ে আসতে লাগল অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে ইণ্ডিয়ানদের ন্যুব্জপৃষ্ঠ জরাজীর্ণ দেহে ফুটে উঠল করুণ মর্যাদার ভঙ্গিটুকু। ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো জুড়ে গেল একসঙ্গে, আর বালিমাখা পার্চমেণ্টের মত মুখগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘনায়মান অন্ধকারে।

পিছন ফিরতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেয়ে অন্যমনস্কের মত লাফিয়ে উঠলেন জনসন। ধাক্কা লেগেছে অ্যালেনের সঙ্গে, ক্ষমা চাইল সে ঃ 'মাপ করবেন, স্যর।'

—'ঠিক আছে লেফটেন্যাণ্ট।'

—'অদ্ভুত, অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে, তাই না স্যর?' কিছু একটা বলতে হয়, তাই বলল অ্যালেন।

—'আমার পক্ষে ঘোরতর বাস্তব।'

সৈন্যদের থেকে একটু আগে দাঁড়িয়ে রইলেন দু'জনে। বাতাসের ঝাপটার মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করলেন ইণ্ডিয়ানদের।

—'কি মনে হয়, ওরা খাবার নেবে?' জিজ্ঞাসা করলেন অ্যালেন।

—'মনে হচ্ছে নেবে।'

—'কি বলেন, স্যর, একটা জলের টিন রেখে আসব ওখানে?' ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল অ্যালেন।

—'পার তো যাও।'

তাড়াতাড়ি চলে গেল অ্যালেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল দুটো ভারি টিন কাঁধে ঝুলিয়ে, 'শুধু গিয়ে রেখে আসব এগুলো?'

—'ভয়ের কোন কারণ নেই।' মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন।

ততক্ষণে পুরোপুরি নেমে এল অন্ধকার। কালো মেঘের চূড়োগুলো ছড়িয়ে পড়ল সারা আকাশে, পশ্চিম দিগন্তে জেগে রইল শুধু উজ্জ্বলতার সূক্ষ্ম রেখাটুকু। কয়েক পা মাত্র যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যালেনের মূর্তি, দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল সে। বাতাসের আওয়াজ উঠছিল প্রায় গর্জনের মত, তাতেই ডুবে গেল তার পায়ের শব্দ। সে যখন ফিরে এল, চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন, রাত্রির অন্ধকার থেকে হঠাৎ যেন আবির্ভূত হল সে।

—'কে অ্যালেন?' বুঝতে পারলেন, তিনি ঘাবড়ে গেছেন, একটা হাত রাখলেন লেফটেন্যান্টের হাতে, 'সব ঠিক তো?'

—'ওরা নিয়েছে রুটিগুলো।' একগাল হেসে ফেলল অ্যালেন; উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে, ঠাণ্ডায় আর স্নায়বিক উত্তেজনায় সে কাঁপছিল। 'বড় অন্ধকার ছিল, ওরা আমাকে দেখেও ফেলল খুব তাড়াতাড়ি। বন্দুকের ঘোড়া আলগা করে দিল, শব্দও পেলোম তার।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে, 'কপাল ভাল, গুলি ওরা ছোঁড়েনি। জলটুকু রেখেই চলে এসেছি।'

—'আজকের রাতের কি হবে?' একটু পরেই প্রশ্ন করল সে।

—'ওদের চারপাশে শুয়ে থাকব আমরা।' জনসন বললেন ভেবে নিয়ে, 'মনে হয় না, বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে ওরা। শুধু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। প্রত্যেক তিনজনের একজনকে দু ঘণ্টা করে পাহারায় রাখবে।'

ঘাড় নাড়ল অ্যালেন, বলল, 'আজ রাতে বরফ পড়তে পারে।'

ঘুম ভেঙে যেতেই অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে কান পেতে শুনল অ্যালেন, তারপর কাঁধের উপর লেপটা চেপে ধরে এগুতে লাগল হাতে-পায়ে ভর দিয়ে। অন্ধকার বড় বেশি, এত বেশি যে, ঘড়ির কাঁটাটা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। দেশলাই জ্বালাতে চেষ্টা করল সে, বাতাসের চোটে নিভে গেল গোটাকয়েক কাঠি, একটা জ্বলে উঠতেই চোখে পড়ল ঘড়ির কাঁটা আর অক্ষরগুলো। দুটো বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

ঘুমন্ত মানুষগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ হাতড়ে চলল সে, দেখতে পেল একজনকে, জিজ্ঞাসা করল, 'কে, কে ওখানে ?'

—'লেফটেন্যাণ্ট নাকি ?'

লোকটা গোগার্টি। পাহারাদারদের একজন। ঠাণ্ডা সম্পর্কে বিড়বিড় করে কি একটা মন্তব্য করে সে গালাগাল দিতে লাগল ইণ্ডিয়ানদের।

—'ক্যাপ্টেন কোথায় ?'

কোথায় তা জানে না গোগার্টি। ফিস্‌ফিস্ শব্দ আর দাঁত-কড়মড়ি শুনে শুনে হোঁচট খেয়ে এগুতে এগুতে একজনের ঘাড়ের উপর পড়ল অ্যালেন। ঘুমন্ত মনুষটা জেগে উঠল বিড়বিড় করতে করতে।

—'ক্যাপ্টেন নাকি ?'

—'কি ব্যাপার ?' ক্লান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জনসন।

—'কিছু একটা ঘটছে ওখানে।'

—'ঘুমুতে যাও না কেন, অ্যালেন।'

—'শব্দটা হচ্ছে মাটি খোঁড়ার মত।'

—'বোকার মত কথা বোলো না। মাটি খুঁড়তে যাবে কেন ওরা ?'

—'তা তো জানি না।'

—'তাহলে ঘুমোও গিয়ে।'

—'কিন্তু মাটি খুঁড়তে যাবে কেন ওরা ?' প্রশ্ন করল অ্যালেন। সেখানেই শুয়ে পড়ল সে, 'মাটি খুঁড়তে যাবে কেন ওরা ?' এই প্রশ্নই নিজেকে বার বার করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

ভোর হল। শক্ত করে ছিপি-আঁটা বোতলের মত যেন চারধার। বরফ পড়া শুরু হয়নি তখনো, কিন্তু নুয়ে-পড়া গোটা আকাশে বিছিয়ে আছে ভারি মেঘের চাদর। অস্বস্তিকর ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডায় সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন জনসন, আরাম পেলেন টগবগে কড়া কফির গন্ধে। কয়লার আগুনে তৈরি হল ছোট-হাজরি—মোটা মোটা টুকরো করে কাটা শুয়োরের মাংস, চর্বি-মাখানো বিস্কুট আর কড়া কফি।

রান্নার আগুনের কাছে সরে এসে শী-এনদের দিকে তাকালেন তিনি। একবার কচলে নিলেন চোখ দুটো; এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাতে অ্যালেন কেন শুনতে পেয়েছিলেন মাটি খোঁড়ার শব্দ। জিনিসটা অসম্ভব হলেও এটা সুস্পষ্ট যে, ওই কঙ্কালসার মানুষগুলো সারারাত ধরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে উঁচু করেছে বুক সমান, রাইফেলের গুলি থেকে বাঁচাতে গর্ত খুঁড়েছে নারী আর শিশুদের জন্য। তারা যে করতে পেরেছে, তার প্রমাণ তাদের কাজ; গাদা করা রয়েছে সদ্য খোঁড়া মাটি; কিন্তু ভাবতে গেলে কাজটা নিশাতঙ্কের মত।

ছোট-হাজরি শেষ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সৈন্যেরা; ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটির চারধারে পাক দিয়ে এলেন জনসন, বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি অবস্থা

যখন সম্পূর্ণ প্রতিকূলে, তখন কেন যে ওই শ দেড়েক অনশনজীর্ণ বর্বর সারারাত ধরে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে তৈরি হতে গেল লড়াইয়ের জন্য। অ্যালেনের কাছে ফিরে এলে সে বলল, 'এখন আমি আগে কোনদিন দেখিনি, স্যর।'

—'আমিও না—'

—'আত্মসমর্পণ করাবার চেষ্টা করবেন নাকি আবার?'

—'তাই করব ভাবছি। যতক্ষণ দুর্গ থেকে সৈন্যরা না আসে, ততক্ষণ কিছু একটা করতে হবে আমাদের।' তারপর তিনি চলে গেলেন ওমাহার সেই ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে, তাকে সেই মাটির আড়ালের কাছে বলে কয়ে নিয়ে গিয়ে যা দু-একটা শী-এন ভাষা জানে কথা বলাতে হবে তাই দিয়ে। ছেলেটা কিন্তু যেতে চাইল না। আগুনের ধারে বসে হাত গরম করতে করতে সন্দেহভরে সে তাকাতে লাগল ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটির দিকে।

—'খালি হাতে ওখানে যেতে চাই নে, স্যর।' অভিযোগ করল সে, 'ওরা উন্মাদ। উন্মাদ না হলে কেউ ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বসে থাকতে পারে অমনভাবে!'

—'ভয়ের কোন-কিছু নেই।'

—'আমি কিছু জানি না স্যর। আমি যা বলি, তা ওরা বোঝে কিনা জানি না।'

ঘৃণাভরে তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর জনসন নিজে সঙ্গে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলে সে চলতে লাগল আস্তে আস্তে পা দুখানা টেনে টেনে। যাকে সে শী-এন ভাষা বলে জানে, সেই কণ্ঠ্য-বর্ণবহুল ভাষায় 'আত্মসমর্পণ কর' বলতে বলতে সে ক্রমশ এগুতে লাগল ইণ্ডিয়ানদের কাছাকাছি।

আওয়াজ উঠল একটা রাইফেলের; তাদের পায়ের কাছে মাটি ছিটকে উঠল একটা বুলেটের ঘায়ে। হুড়মুড় করে পিছিয়ে এল ছেলেটি। কিন্তু তিনি যা তাই হতে হবে জনসনকে, সিদ্ধান্ত নেবার কর্তা তিনি, জানার ভার তাঁরই। ছুটতে তিনি পারলেন না। ইণ্ডিয়ানদের দিকে পিছন দিয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি শান্তভাবে। পিছন থেকে বুলেট লাগার কম্পিত আশঙ্কা, সত্যে পরিণত না হলেও মৃত্যুর উপলব্ধি—তাঁর অতি-পীড়িত স্নায়ুর সমস্ত শক্তিটুকু ব্যয় হয়ে গেল এতেই। তাঁকে আড়াল দেবার জন্যে ছুটে আসছিল লেফটেন্যাণ্ট অ্যালেন আর জনকয়েক সৈন্য। তাদের কাছে যখন পৌঁছুলেন, তখন ঠাণ্ডা সত্ত্বেও তাঁর মুখ আর হাত দুখানা ভিজে উঠল ঘামে।

কোন কথা না বলে আগুনের কাছে গিয়ে এক কাপ কফি ঢেলে নিলেন ক্যাপ্টেন। ঢকঢক করে কয়েক চুমুক খেয়ে ফেললেন কফিটুকু, উষ্ণ তরল কফিতে গলায় ছ্যাঁকা লাগাতে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই আর। কয়লার আগুনে তাপ বেশি নেই; কাঠকুটো খুঁজতে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন জনসন। গনগনে আগুনের উপযুক্ত যথেষ্ট কাঠকুটো নিয়ে ফিরে এল তারা; আগুনের শিখা লকলক করে উঠতেই শুরু হল বরফ পড়া; বরফের টুকরোগুলো ছোট ছোট, শুকনো। গর্জন করে

ফিরতে লাগল বাতাস ; ঝাপটা লাগতে লাগল শান-দেওয়া ছুরির মত। বাতাসের ঝাপটায় বালির সঙ্গে বরফ মিশে একাকার হয়ে গেল বালিতে বরফে। সব-কিছু মিলিয়ে এক শাস্তি—যতই কেন সৈন্যদের গায়ে জামা-কাপড় থাকুক, আর তারা বসে থাকুক আগুনের কাছ ঘেঁষে।

ইণ্ডিয়ানদের কাছে কিন্তু এ অন্য ব্যাপার ; আর শাদা-মানুষেরা জানতেও পারল না তা, জানতেও চেষ্টা করল না তারা। মাঝে মাঝে তারা মুখ তুলতে লাগল, দেখতে লাগল নির্বাক হয়ে, ছেঁড়া ঝুলি-ঝুলি কাপড়ের সব পুঁটুলি, মাথাগুলো আড়াল দেবার চেষ্টা করছে হিমের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য।

সন্ধ্যার দিকে রবিনসন কেল্লা থেকে হাজির হল প্রথম দল, ক্যাপ্টেন ওয়েজেলসের অধীনে তিন নম্বর অশ্বারোহী দলের একটা কোম্পানি। তাঁর সঙ্গে আছে সার্জেন্ট ল্যাম্পি আর তিনজন স্যু-স্কাউট, তাদের তিনজন শী-এন ভাষা বুঝতেও পারে কিছুটা। জনসনকে তিনি জানালেন যে, দুটো কামান আর রসদ-বোঝাই তিনখানা গাড়ি এসে হাজির হবে সকালের কিছু আগেই।

কল্পনাপ্রবণ লোক নন ওয়েজেলস্। বরফ পড়লে তিনি আশ্রয় খোঁজেন, অথবা জামা গায়ে চড়ান, খিদে পেলেই তিনি খান। ঠাণ্ডা অথবা খিদের প্রভাব অন্যের উপর কেমন পড়ে, মনে-মনে এ ধরনের আত্মগত গবেষণা করতে তিনি অক্ষম। তিনি ছাড়া অন্য সবাই ভিন্ন জগতের জীব ; তাঁর স্বার্থপরতা আদিমস্তরের, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সে স্বার্থপরতা—সুচিন্তিত নয়, বরং প্রকৃতিগত। হুকুম যখন তিনি তামিল করে এলেন, তখন মানুষটি তিনি ভালই, কিন্তু অন্য কারুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার জটিলতা অথবা মানসিক গতিবিধি সম্পর্কে যখন বিবেচনা করতে বাধ্য হন, তখনই ইতস্তত করেন অনিশ্চয়তায়। তাঁর সমাধানে সব মানুষের জন্যই একই ছকের ব্যবস্থা ; একজন যে অপরজন থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র, এই চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। ফৌজি আদমি হিসাবে একটি ভাল গুণ আছে তাঁর, নিজের সম্পর্কে কখনো সন্দেহ পোষণ করেন না তিনি।

হয়ত একটু বেশি সহজভাবেই তিনি দেখলেন জিনিসটাকে। জনসনকে বললেন, 'সোজা ওখানে গিয়ে ঘেরাও করে ফেলব ওদের, গাড়িগুলো এসে পৌছলেই তুলে দেব আমরা।' জনসনের সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফ থেকে বরফের কুচিগুলো চাটতে লাগলেন তিনি, ধোঁয়ার নিশ্বাস বেরুতে লাগল নাক থেকে।

—'অত সহজে হবে না।'

—'আপনি তো বললেন, ওদের কোন তাকত নেই আর।'

—'বন্দুক আছে ওদের কাছে। ট্রিগার টিপতে কোন তাকতেরই দরকার লাগে না। আমার মনে হয়, যদি আরও কিছুক্ষণ আমরা ওদের ঘিরে বসে থাকি, ওরা বেরিয়ে আসবে নিজের থেকেই। এগিয়ে গেলেই লোক হারাতে হবে আমাদের।'

—'লোক না হারিয়ে লড়াই করা চলে না।' অত্যন্ত সাধারণভাবে বললেন

ওয়েজেলস্। 'এ ধরনের বরফ যদি পড়তেই থাকে, তাহলে দুর্গে ফিরে যেতে খুব দেরি হয়ে যাবে আমাদের।'

কাঁধ ঝাঁকালেন জনসন. 'মনে হয়. একবার কামানগুলো দেখতে পেলেই বেরিয়ে আসবে ওরা।'

—'হয়ত আসবে—'

—'আপনার স্যু-স্কাউটদের একজনকে নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখে আসি।' জনসন বললেন।

—'কোন লাভ নেই 'কুকুর-সেনা'দের সঙ্গে কথা বলে।'

—'চেষ্টা করে দেখি।'

'উদ্‌গ্রীব-মানুষ' যে স্যু-স্কাউটটির নাম, তাকে নিয়ে চলে গেলেন জনসন। সে যে ভয় পেয়েছে, তা গোপন করার কোন চেষ্টাই করল না। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জনসনকে বুঝিয়ে বলল, 'এক সময় শী-এন আর স্যু-দের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাকে ওরা খুন করতে পারে, কারণ সে ছিল বন্ধু লোক। জনসন শত্রু, সেজন্য তিনি অনেক নিরাপদ। শত্রু হওয়া অনেক সহজ ব্যাপার।'

—'কথা বল ওদের সঙ্গে।' জনসন বললেন, 'তুমি একটা কাপুরুষ ইণ্ডিয়ান, কথা বল ওদের সঙ্গে।'

বাতাসের ঝাপটার মুখে একটু জড়সড় হয়ে ক্যাপ্টেনর ধার ঘেঁষে দাঁড়াল 'উদ্‌গ্রীব-মানুষ'। রাইফেলের গর্তের কয়েক হাতের মধ্যে পৌঁছুতেই উঠে দাঁড়াল কয়েকজন ইণ্ডিয়ান, তাদের মধ্যে আছে সেই অতি-বৃদ্ধ লোকটা। বরফের ঝাপটার মুখে তারা দুলতে লাগল নলখাগড়ার মত।

—'ওদের বল, আমাদের সঙ্গে লড়াই করে কোন ফয়দা নেই।' জনসন বললেন, 'সৈন্যদের দিয়ে একেবারে ঘিরে ফেলেছি আমরা। পালানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যদি ওরা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে খেতে দেব ওদের, দুর্গে নিয়ে যাব, সেখানে আগুন পাবে, শীতের হাত থেকে বাঁচবে, ঘর আছে, থাকতে পারবে। কিন্তু যদি লড়াই করে, মরতে হবে।'

অস্থিরভাবে বুকের উপর হাত দুখানা আড়াআড়িভাবে রেখে বলতে শুরু করল স্কাউটটি, তার ঝঙ্কারময় কথাগুলো যেন কান্নায় ভেঙে-পড়া বাতাস আর বরফের ঝাপটারই একটা অংশ। আর উত্তর দিল সেই বৃদ্ধটিও, উত্তর দিল অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে, শান্তভাবে। তার মুমূর্ষু লোলচর্ম দেহটা যেন যুক্তি আর বুদ্ধির প্রতি মূর্তিমান অপমান; আওয়াজ বেরিয়ে এল ওই দিক থেকেই।

—'ওরা তো মরেই গেছে আগে, বলছে ওরা।' তর্জমা করে গেল স্যু-স্কাউটটা। 'দেশে চলেছে ওরা, দেশে চলেছে, দেশে চলেছে, ফিরে যাও তোমরা—' ওর ওই কথাগুলোর পিছনে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে কবিত্ব আর গতি, একটা আদিম ঝঙ্কারময় ভাষার সমস্ত জটিল সৌন্দর্যটুকু। 'মরে গেছে ওরা, তোমরা ফিরে যাও।'

—'নিকুচি করি তোমার, ওদের বুঝিয়ে দাও যে, বড় বড় কামান আসছে, ইয়া বড় বড়, উড়িয়ে দেবে ওদের ছাতু ছাতু করে।'

—'মরে গেছে ওরা, মরে গেছে, ফিরে যাও তোমরা।' কাঁধ ঝাঁকাল সু-স্কাউটটা।

ওয়েজেলস্‌ই তোড়জোড় করলে আক্রমণের। এক কোম্পানির অর্ধেক পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল কেবল একটা দিক থেকে, নিজেদের বন্দুকেরই আড়াআড়ি গুলির বিপদ রইল না তার ফলে। বন্দুক মুঠো করে ধরার জন্য হাতের দস্তানা খুলে নিতে হল সৈন্যদের, বরফের ভিতরেই দাঁড়িয়ে রইল তারা, হাতগুলো নীল হয়ে উঠল ঠাণ্ডায়। ওয়েজেলস্‌ হুইসিল বাজাতেই ছুটতে লাগল গুঁড়ি মেরে, বরফে আছাড় খেয়ে, বরফ-বৃষ্টির মোটা পর্দার ভিতর দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করতে করতে। এত ঘন বরফ পড়তে লাগল যে, কোন সময়েই তাদের চোখে পড়ল না শী-এনদের ট্রেঞ্চ; কিন্তু শাদা জালির ভিতর দিয়ে এগিয়ে-আসা নীল রঙের মূর্তিগুলো নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিল শী-এনরা। একঝাঁক রাইফেলের গুলির প্রচণ্ড ঝাপটায় ছিটকে পড়ল তারা; গালাগাল দিতে দিতে রক্তাক্ত দেহে তারা ছুটল পিছনে, যেখানে রয়েছেন ওয়েজেলস্‌।

তারা পিছিয়ে এল এইজন্য যে, বরফের উপর শুয়ে অদৃশ্য শত্রুকে বেছে বেছে গুলি করা অসম্ভব। তারা ফিরে আসতেই জনসনের কাছে স্বীকার করলেন ওয়েজেলস্‌, 'এতে হবে না। কামান না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

যা-হোক একটা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন ওয়েজেলস্‌; তাঁকে কিছু বলতে পারলেন না জনসন। আহত সৈন্যরা ওয়েজেলসের কাছে উর্দির মতই ফৌজের একটা অঙ্গ। একজনের ঊরুতে গুলি লেগেছিল, বোকার মত তাকে আরাম করে বসিয়ে দিলেন তিনি, জোড়া লাগিয়ে দিলেন একজনের ভাঙা হাত। হামাগুড়ি দিতে দিতে সৈন্যরা যখন মাথায় গুলি-লাগা তরুণ সৈনিক জেড হার্লেকে নিয়ে ফিরে এল, ওয়েজেলস্‌ তখন নিঃশব্দে সেটা টুকে নিলেন তাঁর নোটবইতে। যা ঘটেছে, তার জন্য কোন ঘৃণাও জাগল না তাঁর মনে।

শান্তভাবে তিনি বললেন, 'সকাল পর্যন্ত এখানে আমাদের আটকে রাখবে লালমুখো বেজন্মারা।' একটু চিন্তা করে তারপর বললেন, 'ঠাণ্ডায় জমে যাবে ওরা।'

বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেল মাঝরাতের দিকে। কিন্তু বাতাস বইতেই লাগল, বিরাট বরফের স্তূপ গড়ে উঠতে লাগল হাওয়ার দাপটে। মাঝরাতের একটু পরেই এসে হাজির হল গাড়িগুলো আর কামান দুটো। অপেক্ষা করে ছিলেন ওয়েজেলস্‌; ঘুমুতে যাবার আগে তিনি দেখে গেলেন বসানো হল কামান দুটোকে, নিশানা ঠিক করে রাখা হল গোলা পুরে।

সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলেন জনসন, দেখতে পেলেন ইতিমধ্যেই গোলন্দাজদের নিয়ে যেতে গিয়েছেন ওয়েজেলস্‌, ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটিটা ঘেরাও করে গোল হয়ে দাঁড়াবে সৈন্যরা, শী-এনদের উপর কামানের গোলা যখন পড়বে, তখন এগিয়ে যাবে

ধীরে ধীরে। আক্রমণ করতে হবে না সৈন্যদের, গোলা ফাটবার পর শুধু বন্দী করতে হবে 'কুকুর-সেনা'দের।

—'জায়গাটা নারী আর শিশুতে বোঝাই।' জনসন বললেন। 'চল্লিশ কি পঞ্চাশের বেশি পুরুষ নেই ওখানে।'

—'কিন্তু এই তো ওরা চায়।' কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়েজেলস্।

—'খাবার নেই ওদের। আর একদিন পরেই নিজের ইচ্ছাতেই বেরিয়ে আসবে ওরা।'

—'কর্নেলের হুকুম বন্দী করতে হবে ওদের।'

—'তিনি জানতেন না যে—'

—'নারী আর শিশু আছে, না? তিনি জানতেন। তিনি বলেছেন ওদের বন্দী করতে। সবচেয়ে নিরাপদ এ-ই। গোলা দিয়েই যদি ওদের বার করা যায়, যদি দরকার না থাকে—কেন তাহলে আরও লোকক্ষয় করব?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন জনসন।

ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটির চার পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সৈন্যরা। শান্ত, নিস্তব্ধ ঘাঁটি, ধূ-ধূ বিস্তৃত বরফের প্রান্তরে ছোট্ট একটা স্তূপের মত। বাতাস পড়ে গেল, শুধু ঝাপটা দিতে লাগল মাঝে মাঝে। সে ঝাপটাও অতি ক্ষীণ, কয়েক মুঠো কুঞ্চিত বরফ পাক খেয়ে উঠতে লাগল সেই ঝাপটার মুখে। ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটির ভিতরে যে গতিবিধি, তা একেবারে উদ্দেশ্যহীন. আপাদমস্তক শাদা একটা মূর্তি উঠল, ওখানে চলতে লাগল হোঁচট খেতে খেতে; ট্রেঞ্চ থেকে একটু আগে এগিয়ে এল একটা লোক, ফিরে গেল তারপর।

কামানের পাশে দাঁড়িয়ে দূরবীনের ভিতর দিয়ে ওয়েজেলস্ দেখতে লাগলেন সৈন্যদের। সৈন্যদের সঙ্গে রইলেন জনসন। সকলে যার যার জায়গায় না দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ওয়েজেলস্, তারপর নামিয়ে নিলেন তাঁর উঁচু করা হাতখানা। ধোঁয়া আর আগুন উগরে দিয়ে পিছনের দিকে সরে এল একটা কামান। শিস্ দিতে দিতে ঘাঁটির ঠিক পিছনে গিয়ে ফাটল গোলাটা, প্রভাত-সূর্যের আলোয় বরফ আর জঞ্জালগুলো ছিটকে উঠে ছড়িয়ে পড়ল একটা ফুলের মত।

ত্রুটি সংশোধন করে নিলেন গোলন্দাজ দলের লেফটেন্যাণ্ট। গর্জন করে উঠল অপর কামানটি, এবার তার গোলাটি ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গিয়ে পড়ল ঘাঁটির ঠিক মাঝখানে। আর, ছুটন্ত, হত-চকিত, নরমূর্তিতে জীবন্ত হয়ে উঠল ঘাঁটিটা, অতদূর থেকেও যেন তারা জানিয়ে দিল তাদের বেদনা, যন্ত্রণা, আর বিস্ময়।

ওয়েজেলস্ বললেন, 'চালাও।' আবার গর্জন করে উঠল একটা কামান। গোলাটা ফুলের মত ছিটকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে গেল রক্ত আর মাংস, আর ব্যর্থতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ মানুষের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা।

—'মনে হয় এই যথেষ্ট।' ওয়েজেলস্ বললেন।

প্রথমে বেরিয়ে এল সেই অতিবৃদ্ধ মানুষটি, মাথার উপরে হাত দুখানা তোলা, গোলা ফাটার সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে তার শান্ত সমাহিত স্পর্ধার চিহ্নটুকু। কাছে এগিয়ে এল সৈন্যদের ঘিরে-থাকা দলটি, কিন্তু একেবারে কাছে নয়। সু-স্কাউট 'উদ্‌গ্রীব-মানুষ'কে নিয়ে বৃদ্ধ সর্দারের দিকে এগিয়ে গেলেন জনসন।

তারপর এগিয়ে এল হতজীর্ণ, ঠাণ্ডায় নীল-হয়ে-ওঠা, উপবাসক্লিষ্ট, লম্বামত আরও দু'জন ইণ্ডিয়ান ; একসময় তারা যে কি ছিল আজ তা বলা কঠিন। বৃদ্ধকে তারা ধরে ধরে নিয়ে এল বরফের স্তূপের ভিতর দিয়ে। জনসনের মুখোমুখি বৃদ্ধটি দাঁড়ালে তারা দাঁড়াল বৃদ্ধের পিছনে। তাদের শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও তারা যা সহ্য করেছে তার এমন প্রবল এক আভাস জেগে উঠল জনসনের মনে যে নিচু গলায় প্রায় বিনীতের মতই তিনি বলে উঠলেন, 'কিছুই যখন আর করার থাকে না, তখন বীরপুরুষদেরও আত্ম-সমর্পণ করতে হয়।'

সু-স্কাউট তর্জমা করে দিলে ঘাড় নাড়ল বৃদ্ধ সর্দার। ঠাণ্ডায় ফুটিফাটা, চিমড়ে গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল বার বার।

—'ও বলছে, ওখানে ওই গোলার নিচে মেয়ে আর বালবাচ্চারা মরেছে।'

কিছু বলা কঠিন হয়ে উঠল জনসনের পক্ষে, শুধু বললেন, 'আমি দুঃখিত।'

—'ওরা যাবে আপনাদের সঙ্গে ; আর ফিরবে না ওরা দেশে।'

—'ওর নামটা জিজ্ঞেস কর।' ফিস্‌ফিস্ করে জনসন বললেন।

—''ভোঁতা-ছুরি'। উনি 'বুড়ো-কাক'—উনি 'বুনো শুয়োর'। ওঁরা খুব বড় সর্দার।'

—'খুব বড় সর্দার,' মাথা নাড়লেন জনসন, 'ওকে জিজ্ঞেস কর 'ক্ষুদে-নেকড়ে' আর বাদবাকি সবাই কোথায় ?'

—'ওরা দেশে চলে গেছে। আগেই তারা ভাগ হয়ে গেছে দুই দলে, যদি সুযোগ হয়, হয়ত একদল এড়িয়ে যাবে সৈন্যদের। একদল গেছে এদিকে, অন্যদল গেছে ওদিকে। ও এসেছে বালি-পাহাড়ের দিকে, কিন্তু জোয়ানদের নিয়ে চলে গেছে 'ক্ষুদে-নেকড়ে', চলে গেছে উত্তরে—উত্তরে—উত্তরের পথে—' বরফাবৃত উত্তর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সে, 'উত্তরে—হয়ত ওই সীমান্তের ওপারে।'

—'কানাডায় ?'

—'হয়ত ওই দিকেই, হয়ত পাউডার-নদীর দিকে।'

—'ওকে বল,' জনসন বললেন, 'বন্দুকগুলো আনতে হবে ওকে, সবগুলো বন্দুক ; আর তাহলেই খেতে দেব ওদের।'

বন্দুকগুলো গুনে দেখে ওয়েজেলস্ বললেন, 'মাত্র ত্রিশটা, পিস্তল নেই একটাও।'

—'হয়ত এই ওদের সব।'

—'এ আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই ওদের পিস্তল আছে।'

—'পিস্তল পছন্দ করে না ওরা।'

—'তবু নিশ্চয়ই ওদের কাছে পিস্তল আছে, দু-চারটে অন্তত। খানাতল্লাস করা উচিত মেয়েগুলোকে।'

—'মেয়েদের খানাতল্লাস?' শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জনসন।

—'ওরা ইণ্ডিয়ান।'

ওয়েজেলসের দিকে পিছন ফিরে চলে গেলেন জনসন। কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়েজেলস্, তাকিয়ে রইলেন বন্দুকগুলোর দিকে। কর্তৃত্ব যদি তাঁর একার হাতে থাকত, তাহলে তিনি খানাতল্লাস করাতেন মেয়েদের। কিন্তু জনসন থাকতে—

ও চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তিনি হুকুম দিলেন টিকিট মেরে বন্দুকগুলোকে বাক্সবন্দী করতে। তারপর যেখানে সশস্ত্র পাহারাদারদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে শী-এনদের খাওয়ানো হচ্ছে সেখানে চলে এলেন তিনি। উপবাস-ক্লিষ্ট, ঠাণ্ডায় জমা, গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে-থাকা, হতভাগ্য তামাটে চামড়ার মানুষগুলোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে বিশেষ মানসিক বৈলক্ষণ্য ঘটল না তাঁর। ওরা তাঁর থেকে আলাদা; ওরা এক ভিন্ন জগতের অধিবাসী। এমন কি ওদের বেদনাবোধটুকু তাঁর কাছে অপরিচিত, তাঁর থেকে পৃথক। ওই গাল-বসা, ড্যাবডেবে-চোখ শিশুগুলোকে যদি তিনি লক্ষ্য করেও থাকেন, তাহলে তিনি এই সিদ্ধান্তই করে নিয়েছেন যে ইণ্ডিয়ানদের শিশুরা ওই রকমই হয়ে থাকে, সত্যি এইটেই, এর বাইরে কিছুই নেই আর।

তাদের খাওয়া শেষ হলে হুকুম দিলেন তিনি গাড়িতে বোঝাই করতে; তারপর গোটা দলটা বরফের মধ্যে দিয়ে চলল রবিনসন কেল্লার দিকে।

নভেম্বর, ১৮৭৮—জানুয়ারী, ১৮৭৯

মুক্তি

‘ওরা জিতেছে—অথবা ওরা হেরেছে’, কার্ল শূর্জের পক্ষে এই কথাটা বলার ব্যাপার তো কলমের একটা খোঁচা মাত্র। তারপর সরকারের নামে নিজের নামটা সইয়ের ওয়াস্তা। সরকার তো এই—একটা বিল, একটা হুকুমনামা, একটা রসিদ। তারপর আত্মপ্রকাশ করবে অনেকগুলো শক্তি, বিরাট একটা দাবার ছকে ছুটোছুটি করাবে কতকগুলো ক্ষুদ্র মানুষকে। সরকার নিয়মতান্ত্রিক, সরকার গণতান্ত্রিক, কারণ, ভোট দিয়েছে জনসাধারণ। আর জনসাধারণ হেন করে, জনসাধারণ তেন করে—সর্বত্র এই ধরনের কথা ছাড়া একটা সভা, আলোচনা, অধিবেশন কি সম্মেলনও হতে পারে না। জনসাধারণ নির্বাচিত করে প্রেসিডেণ্ট, নির্বাচিত করে কংগ্রেস, প্রেসিডেণ্ট মনোনয়ন করেন মন্ত্রিসভা; কিন্তু কেউ নির্বাচিত করে না ‘লবি’, তবু কাজ হাতিয়ে নেয় তারাই। জনসাধারণ নির্বাচিত করেছিল গ্রাণ্টকে, কিন্তু ভাবতেও পারেনি, দুর্নীতির কথা। জনসাধারণ আছে কোথাও, কিন্তু কেউ তাদের খবর রাখে না, কেবল এক-একজনের সঙ্গে করমর্দন ঘটলেই এদের অস্তিত্ব জানা যায়। সরকার তো একটা কলাশাস্ত্র, একটা বিজ্ঞান, রুজি-রোজগারের একটা বৃত্তি—জনসাধারণ কখনো বোঝে না এ-সব।

তিনিই তো সরকার, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি তিনি, তিনি বৈজ্ঞানিক, বৃত্তি-জীবী। একদা তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ‘ব্যারিকেডে’র পিছনে। সম্প্রতি কোন এক বন্ধুকে বলছিলেন: ‘ ‘ব্যারিকেড’ জিনিসটা তরুণ বয়সের এক উদ্দাম বোকামি। যে জিনিস আমি ভুলতে চাই সকলে যদি সেটা মনে করে রাখে, তাহলে মেজাজ খিঁচড়ে যায় আমার।’ তিনি এতদূর এসে পৌছোননি যে বলবেন: ‘বিরক্তিকর ব্যাপার এই সংখ্যালঘুদের সমস্যাটা। আর, প্রতিটি সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংখ্যালঘিষ্ঠতার সৃষ্টি হয় বলেই গণতন্ত্র জিনিসটাই বিরক্তিকর আর বোকামি—’

যে হাজার মাইল ধরে পথের চিহ্ন আঁকা হয়েছে শী-এনদের রক্তে, সুদূর দক্ষিণে ওকলাহোমার ইণ্ডিয়ান এলাকায় সেই পথেই তাদের ফিরে যাবার নির্দেশনামায় সর্বশেষে সই করে তিনি বলতে পারতেন মনে মনে: ‘লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এদেশে ওদের সংখ্যা মাত্র একশো পঁয়তাল্লিশজন—’

অথবা বলতে পারতেন সম্ভবত ‘ব্যাপারটা ইতি হল এখানেই, আর ঘটবে না এমন কখনো।’ যদিও তিনি ভবিষ্যতের কিছুটা অনুমান করতে পারলেন, এমন ব্যাপার

ঘটবেই বার বার, ঘটবেই আবার ঘটবেই। সেক্ষেত্রে পথের চিহ্ন হাজার মাইল জুড়ে সবুজ তৃণ প্রান্তরে তিনশো আদিম অশ্বারোহীর চিহ্ন হবে না, সে চিহ্ন হবে অশ্রুজলে সিক্ত কালো কঠিন মাটির বুক জুড়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের পদচিহ্ন।

ডিসেম্বরের শেষদিকে রবিনসন কেল্লার পোস্ট-কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন ওয়েজেলস্ নির্দেশ পেলেন ওয়াশিংটনের। পশ্চিমে সৈন্যবাহিনীর সমর দপ্তরের নিত্য-পরিবর্তনশীল নীতির ফলে ভাগ হয়ে গেছে তিন নম্বর অশ্বারোহীবাহিনী, আলাদা করে নেওয়া হয়েছে কর্নেল কার্লটন আর রেজিমেণ্টের বৃহত্তর অংশকে। ঘাঁটিতে রয়েছে মাত্র তুটো পুরো কোম্পানি আর একটা রংরুটদের কোম্পানি। জনসন চলে গেছেন কার্লটনের সঙ্গে, ফলে সবচেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসার এখন ওয়েজেলস্, তাঁর নিচেই ক্যাপ্টেন পি. ডি. ক্রম। জর্জ বাক্সটার রংরুট কোম্পানির অধিনায়ক। ওয়েজেলসের কোম্পানির মহড়ার কর্তা হয়ে ঘাঁটিতে রয়ে গেল লেফটেন্যাণ্ট আর্থার অ্যালেন।

সর্বোচ্চ অফিসার হয়ে ওয়েজেলসের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল গভীর তৃপ্তিবোধ। পোস্ট-কমাণ্ডারের কাজ করে রেজিমেণ্টি 'কমিশনে'র আশা করতে পারবেন তিনি। উচ্চাশাই ওয়েজেলসের সত্তার প্রকৃতিগত অংশ। নিজের সম্পর্কে তাঁর বিশেষ সন্দেহ নেই এবং সেইদিনের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন, যেদিন নস্যাৎ করে দিতে পারবেন সমস্ত সন্দেহ সংশয়। তিনি বাস করেন এক নিয়ম-শৃঙ্খলার জগতে ; ফৌজকে ভালবাসেন তিনি, কারণ, তুনিয়াটাকে আরও বেশি শৃঙ্খলাময় করে তোলার ব্যাপারে হাত দেবার সুযোগ পাওয়া যায় ফৌজেই। ক্বচিৎ কখনো তাঁর যে মেজাজ বিগড়ায় তার অধিকাংশই ছোটখাট ব্যাপারে, উর্দি থেকে ঝুলে পড়া একটা বোতাম, তলোয়ারে মরচের দাগ কিংবা কুচকাওয়াজের সময় উর্দিতে ময়লার দাগ—এইসব নিয়ে। যে জিনিসটা যেমন আছে কল্পনাশক্তির অভাবে তাকে তিনি তেমনটিই ধরে নেন, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে তাকে নিখুঁতভাবেই পেতে চান তিনি।

তাঁরই ইচ্ছামত কর্নেল কার্লটন দেড়শো শী-এনকে রেখেছিলেন অ-ব্যবহৃত, ইঁতুর-বোঝাই, এক কাঠের তৈরি ব্যারাকে। ষাট ফুট লম্বা এই ব্যারাকটা গরম হয় মাত্র একটা পুরনো স্টোভে। বিদ্বেষবশত তিনি ওখানে ওদের রাখেননি, রেখেছেন এজন্যে যে কাঠের তৈরি পুরনো ব্যারাকটাই সবচেয়ে সুবিধেজনক, সবচেয়ে সহজ পাহারা দেওয়া। রবিনসন কেল্লা প্রতিরোধের উপযুক্ত তুর্গ নয়, গাছপালায় ঢাকা পাহাড়ি নদীর উপরে পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো কতকগুলো ব্যারাক আর জিনিসপত্রের গুদামের সমষ্টি। আত্মরক্ষার জন্য আছে কতকগুলো রাইফেল ছোঁড়ার জায়গা, কামানের পাটাতন, আর-একটা সুদৃঢ় ব্যারাক, 'ব্লক-হাউস' হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটাকে। ইণ্ডিয়ানদের চলাফেরার একটু স্বাধীনতা দিতে গেলেই সর্বক্ষণের জন্য পর পর পাহারার ব্যবস্থা করতে হত। এ-ধরনের ব্যবস্থায় কেবল দরজার কাছে একটামাত্র পাহারার প্রয়োজন।

ওয়েজেলসের উপর ভার দিয়ে রেজিমেণ্টের অধিকাংশকে নিয়ে কর্নেল কার্লটন চলে যাবার পর বন্দীদের সম্পর্কে নীতির কোনরকম পরিবর্তন হল না ক্যাপ্টেনের। চেষ্টাকৃত কারুণ্যের মতই চেষ্টাকৃত নির্মমতার স্থান তাঁর চরিত্রে কম। ইণ্ডিয়ানরা ইণ্ডিয়ানই, আর তিনি তাদের পাহারা দিচ্ছেন, কারণ এই মুহূর্তে তাদের সম্পর্কে আর কিছুই করার নেই। লম্বা ব্যারাকটায় ভয়াবহ ঠাণ্ডা, বিন্দুমাত্রও গরম হয় না আলোহীন লম্বা কাঠের বাড়ির ভিতরটা। শীত যত বাড়তে লাগল, তাপ নেমে এল শূন্যের কাছাকাছি, একটু উপরের দিকে থাকলেও প্রায়ই নেমে যেতে লাগল শূন্যের নিচে। কিন্তু বাড়তি কোন স্টোভও নেই ঘাঁটিতে; আর শুধু একদল বুনো বর্বরের আরাম বাড়ানোর জন্য স্টোভ চেয়ে পাঠানোর খেয়ালও হল না ওয়েজেলসের।

ভাষার ব্যবধানটাও আছে; বেয়াড়া জন্তুর মত নিঃশব্দে সহ্য করতে লাগল ইণ্ডিয়ানরা; গায়ে তাদের ছেঁড়া ঝুলিঝুলি কাপড়-চোপড়। আর, তারা কাপড়-চোপড় যদি চেয়েও থাকে, দেবার মত কিছু ছিলও না ওয়েজেলসের। সৈন্যদের জন্য মজুত কাপড়-চোপড় দিতে যাবেন না ওদের নিশ্চয়ই; ব্যবসার মালপত্র যা আছে, সেগুলো সম্পর্কে তাঁর ধারণা, ইণ্ডিয়ানদের গায়ে জামাকাপড় চড়ানোর জন্য অর্থব্যয়ের এক্তিয়ার তাঁর নেই। খাবারের টানাটানি খুবই। খাবার আনতে হয় ওগাল্লালা থেকে, গোটা রাস্তাটা গাড়ি কিংবা ঘোড়ার পিঠে করে। আর সবাইয়ের খাবারের বরাদ্দে যখন টান পড়ে ইণ্ডিয়ানদের বরাদ্দ তখন যায় একেবারেই বন্ধ হয়ে।

দয়া কিংবা পারস্পরিক সদ্ভাবের কোনই স্থান নেই শীতকালের ভয়াবহ একঘেয়ে কেল্লার জীবনে। ওয়েজেলস, সম্ভবত, অন্যান্য অফিসারদের চেয়ে ভালভাবেই মানিয়ে নিলেন এই জীবন। আসলে তিনি যা, তাই হয়েই রইলেন এখানে। হাজারটা ছোটখাট জিনিস দেখাশোনায় মেতে রইলেন তিনি। সরবরাহ ঠিক রাখা, যথেষ্ট খাবার-দাবার আনানোর ব্যবস্থা, ঘরবাড়ি সারানোর তদারকি, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, পাহাড়ের মত উঁচু বরফের স্তূপগুলো সরানো, ঘোড়াগুলোকে দৌড়ঝাঁপ করানো—কর্মক্ষম থাকতে হলে যেসব খোরাক তাঁর চাই, নিজের জন্য যে ধরনের জীবনটা বেছে নিয়েছেন তিনি, আঁটসাঁট নিখুঁত শৃঙ্খলাময় জীবন—যা তাঁর জগৎকে বেঁধে দিয়েছে সামরিক ছাঁচে, যা তাঁর জীবনকে দিয়েছে সীমা, দিয়েছে আকার আর মূর্তি, অন্যরকম যদি হত তাহলে কখনই মিলত না সে-সব জিনিস।

কিন্তু অন্যান্য অফিসারদের কাছে ছোট ছোট দিন আর সুদীর্ঘ রাতগুলো গড়িয়ে চলল নিদারুণ একঘেয়েভাবে। নারী নেই রবিনসন কেল্লায়, সঙ্গীত নেই, কোন বই নেই, বিরতিহীন পেনি-পোকার আর হুইস্ট খেলা ছাড়া কোন খোরাকই নেই আনন্দের। সৈন্যদের মধ্যে দিনের পর দিন জমে উঠতে লাগল এক মন-মরা, চাপা গুমট ভাব। অফিসারদের মধ্যে মারাত্মক কথা কাটাকাটি হতে লাগল তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে; রাগের মাথায় মেজাজ খারাপ করা, গুম হয়ে থাকা, সারাদিন সারা সপ্তাহব্যাপী চুপচাপ বসে থাকা, হামেশাই ঘুষোঘুষি, মারামারি করা—এ সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা

করার মত কাণ্ডজ্ঞান ছিল ওয়েজেলসের। বিদ্বেষ পুষে আর মনে মনে গুমরে গুমরে নিঃসঙ্গ ফৌজি ঘাঁটিতে খুনোখুনি ঘটতে দেখেছেন তিনি; আর এই নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যাপারটাকেই তিনি অন্য যে-কোন-কিছুর চেয়েই বেশি ভয় করেন।

জঙ্গলে কাঠ আনতে যাবার দলে যেতে চায় যে-সব অফিসার, তাদের দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু এর বাইরে ব্যর্থ হয় তাঁর কল্পনাশক্তি। খাবার ঘরে বসে নিজে তিনি এত কম কথা বলেন যে অন্যের কথাবার্তায় ফুর্তির না বিমর্ষের ভাব থাকে, তা খেয়ালই থাকে না তাঁর।

আর ইতিমধ্যে, সেই পাহারা-দেওয়া ঘরের ভিতরে আটক হয়েই রইল ইণ্ডিয়ানরা অশুভ, মুমূর্ষু, বাজে খরচ হিসেবে—একদিন তারাই ছিল আমেরিকার বিশাল তৃণ-সমুদ্রের সবচেয়ে গর্বিত যাযাবরের দল।

ওয়াশিংটনের নির্দেশ এল, ওয়েজেলস্ একে স্বাগত জানালেন। এতে প্রতিশ্রুতি আছে কিছু-একটা করার, অন্তত কোন-একটা পরিকল্পনা করার, সেই অনুযায়ী কাজ করার। খাবার ঘরে বসে এটা ঘোষণা করলেন ওয়েজেলস্।

—'ওরা ফিরে যাচ্ছে।' তিনি বললেন।

—'ফিরে যাচ্ছে?' বন্ধ হয়ে গেল কথাবার্তা; ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শুনেই চোখ তুলে তাকাল সবাই।

—'কুকুর-সেনারা', অনুমান করল একজন।

—'ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে, ভেবেই রেখেছিলাম আমি।' অ্যালেন বলে উঠল, 'প্রায় লজ্জাকর বলে মনে হয়।'

—'রাস্তা তো বহুদূর।' শিস্ দিয়ে উঠল একজন। এই শীত, এই ঘাঁটি, এই ক্লান্ত দিনের মিছিল—হাঁপিয়ে উঠেছে সবাই। শী-এনদের পাহারা দিয়ে সেই এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ভার পাবে, ফিরে যাবে সূর্যের ঝলমলে আলোতে—এই আশাই জাগল প্রত্যেকের মনে।

—'কে নিয়ে যাবে ওদের, কখন যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়েজেলস্। এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি তিনি; তাঁর নিজের দিক থেকে কাজটা হচ্ছে ঘাঁটির কমাণ্ডার হিসেবে রবিনসন কেল্লায় শীতটা কাটিয়ে যাওয়া, আর সেটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট। ক্রুম, অথবা এমন কি বাক্সটারও রংরুট কোম্পানির সাহায্যে রাস্তা ধরে ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে যেতে পারবে সংরক্ষিত এলাকায়, ওরা চলে যাবার পর আরও সহজ হয়ে উঠবে ঘাঁটির জীবনযাত্রা।

—'মনে হয়, এই সপ্তাহেই।' তিনি বললেন।

—'ওরা কিন্তু পছন্দ করবে না।'

—'না—'

—'আপনার কি মনে হয়, ওরা গোলমাল করবে?'

—'ওরা যাবে।' ওয়েজেলস্ বললেন, 'আর কি-ই বা করবার আছে ওদের।'

ইণ্ডিয়ান মা আর শ্বেতাঙ্গ বাপের দোঁ-আশলা শী-এন সন্তান জেমস্ রাওল্যাণ্ড। শী-এনদের ধরা পড়বার খবর পেয়ে সে ঘাঁটিতে এসেছিল পাইনরিজ থেকে, ভেবেছিল দো-ভাষী হিসাবে কাজ পেয়ে যাবে একটা। কার্লটন তাকে খোরাকি আর অর্ধেক মাইনেতে বহাল করেছিলেন। এবার তাকে ব্যারাকে গিয়ে 'ভোঁতা ছুরি' আর অন্যান্য সর্দারদের খবর দিতে পাঠালেন ওয়েজেলস্, তাঁর অফিসে আসার কথা বলতে বললেন আলোচনার জন্য। ক্রম আর বাক্সটারকে সঙ্গে থাকতে বললেন ওয়েজেলস্। তাঁর অফিসে বসে সিগার টানতে টানতে সর্দারদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনজনে।

অফিস-ঘরের জানালার সামনে কুচকাওয়াজের মাঠ, বরফে-ঢাকা মাঠের ওপিঠে স্পষ্ট দেখা যায় লম্বা ব্যারাক-বাড়িটা। তারও পিছনে বরফ-ঢাকা মাটি স্তরে স্তরে গিয়ে মিশেছে বেঁটে বেঁটে পাইন-ঝোপে, গাঢ় সবুজ রঙের অসমান ঢেউ গিয়ে লেগেছে পাহাড়ের গায়ে। ভারাক্রান্ত ধোঁয়াটে আকাশ, সূর্য হারিয়ে গেছে সময়ের সমুদ্রে। ডাকোটার পথহীন প্রান্তরে ঘনিয়ে আসছে ঝড়। বিষণ্নকণ্ঠে ক্রম বলল, 'আবার বরফ পড়বে।'

—'তাইত মনে হয়।' সিগারের গোড়াটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সায় দিলেন ওয়েজেলস্।

—'ধরুন যদি আমরা আটকে পড়ি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়েজেলস্। বললেন, 'খাঁটি হাভানাই ভালবাসি আমি।' তখনো তিনি সিগারটা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত।

—'আমি যদি যাই তাহলে কিছু ভাল সিগার পাঠিয়ে দেব।'

—'ভাবছি বাক্সটারকে পাঠাব।' ছাইয়ের একটা কুচি পরীক্ষা করতে করতে বললেন ওয়েজেলস্। উঠে পড়ল ক্রম, এগিয়ে গেল জানালার কাছে; মানুষটা লম্বা-চওড়া, লালচে রং, হালকা চুল। হাত দিয়ে কাঁচটা মুছতে লাগল সে, গোলাপি রঙের চামড়া আর পাক-দেওয়া চুলের বুনট করা হাতখানা। কাঁচটা পরিষ্কার করে ঘষে সে বলল ওয়েজেলস্কে, 'ওই আসছে ওরা।'

বাক্সটার বলল, 'বহুদূর এখান থেকে।' লোকটা একটু নিস্পৃহ গোছের, রোগামত, বয়স কম। ক্রমকে ছাড়িয়ে বাইরের বরফের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে, যেন হাজার মাইল শাদায়-মোড়া দূরত্বটুকু অনুমান করে নিতে লাগল মনে মনে।

—'ওদের তিনজন আসছে।' সে বলে উঠল, 'আমি বুঝে উঠতে পারি না কিসের জোরে টিকে আছে ওই বুড়োটা।'

—'নিজের ইচ্ছে না হলে মরে না ইণ্ডিয়ানারা।'

খুব বেশি আগ্রহ নেই ওয়েজেলসের। একবার মাত্র তাকালেন তিনি জীর্ণশীর্ণ সর্দার তিনজনের দিকে, বরফের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে ওরা রাওল্যাণ্ডের পিছনে

পিছনে, এপাশে ওপাশে একজন করে সশস্ত্র পাহারাদার ; তারপরেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে মনোযোগ দিলেন সিগারে।

—'যাই বল না কেন, ওদের শীত-বোধটা আমাদের মত নয়।' ভেবে চিন্তে বলল বাক্সটার। বৃদ্ধ-সর্দারের পায়ে জুতো, কিন্তু আর দু'জনের মধ্যে একজনের পা খালি। 'একেবারে জন্তু,' বলে উঠল সে।

—'তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যেতে পার তুমি।' ওয়েজেলস্ বললেন, 'যদি বরফে আটকে পড়ি, তাহলে কষ্টকর হবে কাজটা।'

মাংসল ঠাণ্ডা হাত দুখানা ঘষতে ঘষতে স্টোভের কাছাকাছি গিয়ে পিছন ফিরল ক্রম। লাথি মেরে দরজাটা খুলে দিল, আর একখানা কাঠ ফেলে দিল বাক্সটার। রসিয়ে রসিয়ে স্বাদগন্ধ উপভোগ করতে করতে শান্তভাবে সিগার টানতে লাগলেন ওয়েজেলস্। রাওল্যাণ্ড দরজায় ঘা মারতেই ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'চলে এস—সোজা চলে এস ভিতরে।' দরজা খুলে দিল বাক্সটার। পশমি টুপিটা নাড়াচাড়া করতে করতে রাওল্যাণ্ড অফিস-ঘরের ভিতরে ঢুকল অস্বস্তিভরে। তার পিছনে নড়ে চড়ে উঠল সর্দার তিনজন, উত্তাপের চোটে কুঁচকে গেল ভ্রূ দুটো, জল ভরে এল চোখে, একটু নিচু হয়ে গেল মাথা। অন্য দু'জনের চেয়ে একটু সামনে এগিয়ে গেল বৃদ্ধটি, কাঁধের উপর দিয়ে জড়ানো একখানা ঝুলিঝুলি কাঁথা, দুই হাত এক করে চেপে ধরে রইল তাই। অন্য দু'জন লম্বা, কঙ্কালসার ; একবারও দৃষ্টি সরিয়ে নিল না বৃদ্ধের দিক থেকে।

পাহারাদার দু'জন রইল বাইরে।

পায়ের উপর পা রেখে একটা দুলুনি-চেয়ারে বসে রইলেন ওয়েজেলস্। সিগারের নীল ধোঁয়ার মেঘ জমে উঠল ঘরের মধ্যে। সর্দাররা ঘরে ঢুকতেই মাথা নোয়ালেন, স্টোভটা দেখিয়ে বললেন, 'এগিয়ে যাও, গরম করে নাও শরীর।' তারপর রাওল্যাণ্ডকে বললেন, 'ওদের বল গা গরম করতে।'

সবাই ওরা নোংরা অপরিচ্ছন্ন, আর সচেতনও সে বিষয়ে ; পরিচ্ছন্ন জাতির মানসিকতা সম্পর্কে ওদের অস্বস্তি আছে।

ছেঁড়া ঝুলিঝুলি কাপড়েই গর্বটুকু ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করল ওরা, আর সেই গর্বেই স্টোভের কাছে গা গরম করতে গেল না, দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে, দেহের ভার রাখতে বারবার বদল করতে লাগল পা।

ওয়েজেলস্ উঠে সিগার দিতে গেলেন ওদের ; প্রত্যাখ্যান করল ওরা। তিনি বললেন, 'এটা আলোচনা সভা, তাই করমর্দন করব আমরা। করবে না?'

তর্জমা করে দিল রাওল্যাণ্ড ; বৃদ্ধ সর্দারের চোখ দুটো তখনো জলে ভরা, টলতে টলতে সে করমর্দন করল অফিসার তিনজনের সঙ্গে। একটুও নড়ল না অপর ইণ্ডিয়ান দু'জন, একবারের জন্যও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না বৃদ্ধের দিক থেকে। করুণা আর বেদনা মাখানো সে দৃষ্টিতে। কোনো কাঁথাই নেই তাদের গায়ে, পুরনো ছেঁড়া চামড়ার সার্টে আর পাজামায় সামান্যই ঢাকা পড়েছে তাদের দীর্ঘ শীর্ণ চেহারা।

দুলুনি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ওয়েজেলস্, চিন্তিত মুখে সিগারে মন দিলেন। সর্দারেরা অপেক্ষা করতে লাগল। কি করে শুরু করতে হবে বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। অনুভূতিপ্রবণ মানুষ না হওয়া সত্ত্বেও সর্দারদের দেখে প্রতিক্রিয়া শুরু হল তাঁর মনে। সমতলের সেই পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ল তাঁর; তখন তিনি দেখেছেন শী-এনদের, দেখেছেন তাদের পালক দিয়ে সাজানো ঘোড়ার আর মাথার মুকুটের, ঢাল আর বল্লমের নৃত্যপর বর্ণবিচিত্র জীবনের আর বন্যবর্বর অহঙ্কারের পরিপূর্ণ গৌরবের মধ্যে, যা চলে গেছে চিরকালের মত তার জন্য যে তিনি দুঃখিত; তা নয়, কিন্তু তাঁর পুরনো স্মৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হল একে। ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন, 'এখন থেকে বন্ধু হব আমরা—বন্ধু হব সবাই।' কথাটা শোনাল অর্থহীন, এমন কি তাঁর নিজের কানেও। 'বন্ধু হব আমরা,' আবার বললেন তিনি, তার পর অপেক্ষা করতে লাগলেন দো-ভাষীর জন্য।

বেদনাভরে উত্তর দিল বৃদ্ধ সর্দার; রাওল্যাণ্ড বলে গেল—'সেও চায় তাই, চায় বন্ধু হতে; খুবই বুড়ো হয়ে গেছে সে। তাকিয়ে দেখুন তার দিকে, বুঝতেন তাহলে, খুবই বুড়ো হয়েছে, শান্তিতে বাস করতে চায় সে, সে চায় এটুকুই। বলছে, সবাইকে নিয়ে শাদা-মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে বেরোয়নি সে, সে শুধু ফিরে যেতে চেয়েছিল দেশে, চেয়েছিল শান্তিতে বাস করতে।'

—'ঠিক ঠিক।' বিড়বিড় করে বললেন ওয়েজেলস্, তাকালেন বাক্সটারের দিকে। সিগার টানছে বাক্সটার, তার ভাবখানা উদ্ধত, তার যৌবন তার স্বাস্থ্য তার চামড়ার জৌলুসের জন্য সে গর্বিত। ওয়েজেলস্ তাকালেন ক্রমের দিকে, মনোযোগ দিয়ে সে দেখছে তার গোলাপি রঙের চওড়া হাতখানা।

—'ঠিক ঠিক।' ওয়েজেলস্ বললেন। 'করমর্দন করেছি আমরা, এখন হবে আলোচনা-সভার কথাবার্তা, এখন আমরা বন্ধু।' দো-ভাষী সত্ত্বেও, যাকে তিনি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কথোপকথনের সঠিক পদ্ধতি বলে জানেন, তা বাদ দিতে পারলেন না তিনি। 'বল ওদের, এখন হবে আলোচনা-সভার কথাবার্তা।' চেরা পাইন কাঠে ছাদটা তৈরি, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো, চেরা হয়েছে হাত-করাতে, দুমড়ে গিয়েছে কাঠ, পেরেক ঠোকা হয়েছে কাঁচা কাঠে। মনে মনে ওয়েজেলস্ ভাবলেন, গোঁজ ঠুকতে পারা যায় কাঁচা কাঠে, তাতে ঠিকও থাকে কাঠ, কিন্তু পেরেক ঠুকলে কাঠ দুমড়াবেই দুমড়াবে। 'বল ওকে,' শুরু করলেন তিনি—সর্দারদের দিকে ফিরে সরাসরি বলতে শুরু করলেন তিনি, 'এই যা হল, তা শুভ হয়নি, তোমাদের পক্ষেও না, মেয়েছেলে আর শিশুদের পক্ষেও না। এখন তো দেখলে পালালে কি পরিণাম হয়। আইন আছে একটা, তোমাকে সেই আইন মানতে হবে। আইন এসেছে ওয়াশিংটন থেকে, সেখানে আছেন মহান শ্বেতাঙ্গ-পিতা। তিনি হচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট, তিনি বলেন এটা কর, ওটা কর; যখনই তিনি কিছু বলেন তখনই তা হয়ে যায় আইন। তোমাদের মানতে হবে সেই আইন। এখন তিনি বলছেন, যেখান থেকে পালিয়ে

এসেছ তোমরা ফিরে যেতে হবে সেখানেই। তোমাদের ফিরে যেতে হবে ইণ্ডিয়ান এলাকায়, সেখানে গোলমাল না করে থাকতে হবে সংরক্ষিত এলাকায়। তোমাদের গাড়িতে করে নিয়ে যাব আমরা, সঙ্গে ফৌজ থাকবে তোমাদের রক্ষার জন্য, পথে খেতে দেব তোমাদের। আমরা তোমাদের কাউকে গ্রেপ্তার করব না, কিন্তু এলাকায় ফিরে গেলে তোমাদের মধ্যে দোষ করেছে যারা তাদের গ্রেপ্তার করবেন এজেন্ট, যথাযোগ্য বিচার করবেন তিনি।'

শেষটুকু পছন্দ হল না ক্রমের, সে ওয়েজেলসের দিকে তাকাল, সতর্ক করে দিতে চাইল চোখে চোখে। কিন্তু সূক্ষ্ম কোন-কিছুর ধার ধারেন না ওয়েজেলস্; ব্যাপারটা যা দেখেছেন তাই বলেছেন তিনি, আর বলেছেন এমন লোকদের, যাদের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগই নেই আর। সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি শুনতে লাগলেন রাওল্যাণ্ডের কথা, রাওল্যাণ্ড বলছে দ্রুত শী-এন ভাষায়। এটা যে একটা ভাষা তা কখনো কোনদিন মনেই হয়নি তাঁর। ইণ্ডিয়ানদের ভাষা সম্পর্কে কোন কৌতূহল নেই তাঁর। কুকুরের ঘেউ ঘেউ সম্পর্কে যেমন তাঁর ঔৎসুক্যের অভাব, তেমনি এদের সম্পর্কেও। অস্পষ্টভাবে, তিনি ঘৃণা করেন বিজাতীয় ভাষাকে, একে আরও বেশি, কারণ তাঁর নিজের দেশেরই ভাষা এটি; আর তাঁর অন্তরে অন্তরে সব সময়েই এই ধারণা যে এদেশে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ইণ্ডিয়ানরা। অন্য কোন এক জায়গা থেকে এসেছে ওরা, এদেশের মানুষ নয়।

—'ওরা দুঃখিত।' শুধু বলল রাওল্যাণ্ড।

—'ও আমাকে বলে লাভ নেই—ওরা কি বলল তাই আমাকে বল।'

—'আর শুধু যদি ফিরে যেতেই হয়,' বিচলিতভাবে পশমি টুপিটা নাড়াচাড়া করতে করতে রাওল্যাণ্ড বলল, 'খুবই কষ্টকর হবে তাহলে—ছেঁড়া ঝুলিঝুলি ওদের কাপড়-চোপড়। বুড়ো বলছে, কাপড়-চোপড় নেই, শুধু ছেঁড়া কাপড়ে, অতদূর ওরা যাবে কি করে? বুড়ো বলছে, ঠাণ্ডায় জমে যাবে বালবাচ্চারা।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়েজেলস্।

—'আর দক্ষিণে কি জুটবে ওদের কপালে?' কথাগুলোর ইংরেজি প্রতিশব্দ যোগাতে যোগাতে মুখভঙ্গি করে জোর দিয়ে বলে উঠল রাওল্যাণ্ড। শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের খুশি করতে চায় সে, তবু তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল পুরনো স্মৃতির ভিড়ে—যে ভাষায় কথা বলত তার মা, ঘোড়ার পিঠে চড়ে ইয়া লম্বা-চওড়া হাসি-হাসি মুখ যোদ্ধারা, তার মায়ের আত্মীয়েরা আসত দেখতে, দোকান থেকে কেনা মিষ্টি উপহার দিত তাকে, এক অনিশ্চিত সম্পর্ক, তার সঙ্গে আরও কিছু—যা চিরকালের জন্য হারাতে চাইত সে। নিজে সে শ্বেতাঙ্গ; নাম তার রাওল্যাণ্ড; 'বড়-ভালুক' অথবা 'চলন্ত-চাঁদ' কিংবা ওই ধরনের কিছু নয়।

সে বলল, 'দক্ষিণে তো উপোস করে, জ্বরে ভুগে শেষ হয়ে যাবে ওরা। ভয় পাচ্ছে ওরা—সামান্যই অবশিষ্ট আছে ওদের। ওরা চায় দল নিয়ে চলে যেতে।'

—'ফিরে যেতে হবে ওদের।' ওয়েজেলস্ বললেন।

অসহায়ের মত ওয়েজেলসের দিকে তাকাল বৃদ্ধটি। দোভাষীটা তত কাজের নয়; এমন এক বিপুল ব্যবধান রেখে গেল সে যার সেতুবন্ধন হবে না কোন সময়েই। তারই ভিতর দিয়ে হাতড়ে বেড়াল বুড়ো সর্দার, তারপর ফিরে গেল তার সঙ্গীদের আশ্রয়ে। তারা আলোচনা করল চাপা গলায়, সবচেয়ে লম্বা লোকটা ধীরে ধীরে চাপড়ে দিল বৃদ্ধের কাঁধ। আবার জলে ভরে উঠল বৃদ্ধ সর্দারের চোখ দুটো। রাওল্যাণ্ডকে সে যে-কথা বলল তাতে ফুটে উঠল পরিপূর্ণ বিমূঢ় ভাব।

—'ওরা তাহলে মরবে? প্রেসিডেণ্ট তাই চান?'

গোটা ব্যাপারটার রঙ্গমঞ্চসুলভ নাটকীয় কথাবার্তায় বিরক্ত বোধ করলেন ওয়েজেলস্। হঠাৎ উঠে পড়লেন তিনি, এগিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে দিয়ে। সিগারের মৃদু ঝাঁকানির সঙ্গে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে করে তিনি বললেন, 'ফিরে যেতেই হবে ওদের—মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই। চেষ্টা কর ওদের এই কথাই বুঝিয়ে দিতে।'

রাওল্যাণ্ড চেষ্টা করল ওদের বোঝাতে। সে কথা বলে চলল ওদের সঙ্গে, শুনতে লাগলেন অফিসার তিনজন। অবশেষে পিছন ফিরে মাথা নাড়ল সে।

—'ওরা ফিরে যাবে না।'

—'যাবে না মানে! বল ওদের।'

—'কোন লাভ হবে না।' জোর দিয়ে বলল রাওল্যাণ্ড, 'এখান থেকে কয়েক শো মাইলের মধ্যেই ওদের দেশ। ওখানে যদি না পৌঁছতে পারে, তাহলে ওরা এখানেই মরবে। ওরা বলছে, ওরা মরে গেছে অনেককাল আগেই; ওরা বলছে, কোন লোকের কাছ থেকে যখন তার ঘরবাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়, যখন তাকে জেলখানায় বন্দীর মত জীবন কাটাতে হয়, তখন সে তো মরেই গেল। ওরা বলছে, আপনারা সদাশয়, তাই আলোচনা-সভা ডেকেছেন ওদের সঙ্গে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট যদি চান, ওরা মরুক, তাহলে ওরা মরবে এখানেই।'

—'ফিরে যাবেই ওরা।' ভীষণ জোর দিয়ে বলে উঠলেন ওয়েজলস্। 'কয়েক-দিনের মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে যাবে সব-কিছু, তখন ফিরে যেতে হবে ওদের।'

কথাবার্তা হল আরও অনেক। আর রাওল্যাণ্ড ধাঁধা-লাগা শিশুর মত শব্দার্থ পরিবর্তন করে যেতে লাগল দুপক্ষের মাঝখানে। ঘুরে আসতে লাগল একই কথা, একই নিষ্ফল কথা। শতাব্দীর ব্যবধানের পরপারে তিনটি সর্দার হয়ে রইল তিনটি নিরবয়ব ছায়ামাত্র।

আবার দুলুনি-চেয়ারে চেপে বসলেন ওয়েজেলস্, সিগারের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে রাওল্যাণ্ডকে বলতে লাগলেন তিনি, 'বল ওদের, হুকুম হুকুমই, আইন আইনই, অমান্য করা যায় না কোনটাই। যদি গোলমাল না করে ওরা দক্ষিণে যেতে চায়, তাহলে সব-কিছুই ভাল হবে, আবার আমরা বন্ধু হব। তা না করা পর্যন্ত কোন বরাদ্দ পাবে না ওরা, জলও না, খাবারও না।'

রাওল্যাণ্ড জানিয়ে দিল হুকুমটা। ভাবলেশহীন, স্থির কঠিন মুখে রায় শুনল সর্দার তিনজন।

—'ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ওদের।' মাথা নাড়লেন ওয়েজেলস্।

ওরা চলে গেলে বাক্সটার বলল, 'আরও একটু চেষ্টা করে দেখতাম ক্যাপ্টেন।'

মাথা ঝাঁকালেন ওয়েজেলস্, 'ওদের শ্রদ্ধা পেতে চাও তুমি। হাজার মাইল দক্ষিণের পথটা অনেক দূরের।'

—'এ কথার সঙ্গে আমি একমত।' ক্রম মাথা নাড়ল, 'শুধু ওদের উপোস করিয়ে রাখাটা বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

—'বেশিদিন উপোস করে থাকবে না ওরা। পথে আসবে ঠিক।'

—'এই ধরনের ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্রী কেলেঙ্কারি হতে পারে যদি বাইরে জানাজানি হয়।'

—'কেন?'

—'উপোস করানোটা—ঠিক জানি না আমি। বিশ্রী কেলেঙ্কারি হতে পারে এতে।'

—'আমার হুকুম খুব সহজ সরল।' ওয়েজেলস্ বললেন।

—'জানাজানি হবে কি করে?' অবাক হয়ে গেল বাক্সটার। 'বাপ্‌রে, একটা খরগোসেরও পালাবার উপায় নেই এই নরককুণ্ড থেকে।'

ধীরে ধীরে একটা দিন, তারপর আরও একটা দিন, এমনি করে দিন কাটতে লাগল যতই, শী-এনদের বন্দী-দশা ততই যেন রবিনসন কেল্লাতে ফৌজি-মহলে চেপে বসতে লাগল কালো মেঘের মত। প্রথম দিনটা কাটল নিঃশব্দে বিনা কোলাহলে; সৈন্যদের মধ্যে মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল ওয়েজেলসের হুকুমের খবরটা, আর সারাদিন পুরনো ব্যারাক-বাড়িটায় নিবদ্ধ হয়ে রইল সব কটি চোখের দৃষ্টি। দরজার সামনে বাড়িয়ে দেওয়া হল পাহারার সংখ্যা, বাড়িটার চারপাশে একজনের পর আর-একজন টহলদার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল কাছাকাছি করে। তার মানে, প্রতিটি টহলদারের টহলের এলাকা হল ছোট, একজনের এলাকার মধ্যেই পড়ে গেল অপরজনের এলাকা, সৈন্য-ঘাঁটিতে এ ধরনের ব্যবস্থা হয় খুব কমই।

ফৌজি-মহলের লোকজনদের মনোভাবটা হল মিশ্র ধরনের; একটা বড় অংশ হয়ে রইল পুরোপুরি নিস্পৃহ। মনোগত অভিপ্রায় আর উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত জটিলতায় অভ্যস্ত না থাকার দরুন তারা এই সহজ দর্শন আঁকড়ে রইল যে, যারা মরে গেছে শুধু সেই সব ইণ্ডিয়ানই ছিল ভাল; শী-এনদের দমন করতে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট না হয়ে বরং তাদের বিদ্বেষ চালিত হল শী-এনদের দিকেই। অন্যেরা বিড়বিড় করতে লাগল এই বলে যে, মানুষকে না-খাইয়ে মারাটা অতি জঘন্য ব্যাপার, হলই বা ওরা ইণ্ডিয়ান। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাদের ছেলেপুলে আছে নিজেদের, আছে নিজেদের পরিবার, তাদের মনে হতে লাগল, উপোসের আর

তেষ্টার জ্বালা অনুভব করার ক্ষমতা লালমুখোদেরও আছে। যে ভাবেরই হোক না কেন, তাদের বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়াটা ভয়াবহ একঘেয়ে জীবনযাত্রায় একটা বৈচিত্র্যের খোরাক হয়ে উঠল; বিশাল বাড়িটা—তাদের মধ্যে যেন একটা ক্ষত। তারা গালাগাল করতে লাগল ওই বাড়িটাকে, তাকাতে লাগল ওরই দিকে, চেষ্টাও করতে লাগল ওকে উপেক্ষা করতে, মেজাজ চড়ে গেল সবার, গুম হয়ে গেল সবাই, হরদম শুরু হল ঝগড়াঝাঁটি, অতি তুচ্ছ কারণে খুনোখুনি।

ছুরি-মারামারি করে বসল জেমস্ লিস্‌বি আর ফ্রেড গ্রীন দু'জনে. ফলে বরফের উপর শুয়ে পড়ে রক্তবমি করতে লাগল গ্রীন। অ্যাঙ্গাস ম্যাককাল মেরে বসল তার সার্জেণ্টকে, ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে তাকে আটকে রাখা হল টহলদারদের কুঠরিতে, এসব তো ক্রোধের প্রকাশ্য অভিব্যক্তি। ভিতরে ভিতরে টিকে রইল নিরন্তর, নিঃশব্দ তুচ্ছতা। আর সব-কিছুর জন্যই ওয়েজেলসের সমাধান হল শৃঙ্খলাকে কঠোর থেকে কঠোরতর করে তোলা। সমতলের ফৌজি ঘাঁটির সার্জেণ্টরা কঠোর প্রকৃতির হয়ে থাকে, প্রায় উন্মত্ততার কোঠায় গিয়ে উঠল তাদের কঠোরতা। অমন যে ভালমানুষ সার্জেণ্ট ল্যান্সি, সামান্যমাত্র উত্তেজনায় সেও এলোপাতাড়ি হাতুড়ির মত চালাতে লাগল তার মুঠো-করা ঘুষি। মূর্তিমান অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল সার্জেণ্ট ও'টুল। ওয়েজেলসের নির্দেশে ফৌজি লোকজনের কাছে মদ বেচতে অস্বীকার করল ঘাঁটির দোকানদার; তাতে আরও খারাপ হয়ে উঠল সব-কিছু।

দ্বিতীয় দিনে তৃষ্ণার চিহ্ন স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। জানলার সার্সি থেকে বরফের প্রতিটি টুকরো পর্যন্ত আঁচড়ে তুলে নিল ওরা, দরজা খুলে ফেলে যতদূর হাতে পাওয়া যায় আঁজলা ভরে তুলে নিল পায়ে-মাড়ানো বরফ। দরজা থেকে এক পা বাইরে আসতে দেবে না বেয়নেট-উঁচানো পাহারাদাররা। লাসকাটা ঘরের মত গন্ধ উঠতে আরম্ভ করল ব্যারাক-বাড়ি থেকে।

গোঁ ধরে রইলেন ওয়েজেলস্, যে ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেছেন তাঁর মতে যুক্তি-সঙ্গত। অশান্তির উৎস ওই ইণ্ডিয়ানরা, কিন্তু তিনি ঘৃণা করেন না ওদের। দিনের মধ্যে তিনবার তিনি রাওল্যাণ্ডকে পাঠালেন ব্যারাকে, ওদের সঙ্গে কথা বলতে, ওদের ভুলটা বুঝিয়ে দিতে। প্রথম দিকটায় জ্বালানি ছিল ওদের স্টোভের, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তাও বন্ধ করে দিলেন তিনি। মধ্যপন্থার পক্ষপাতী তিনি কখনই নন।

ব্যারাকে যাতে না যেতে হয় দ্বিতীয় দিনে তারই প্রার্থনা জানাল রাওল্যাণ্ড:

—'বড় জঘন্য ও জায়গাটা।' বুঝিয়ে বলল সে। 'ঠিক যেন নরক—'

—'ভয় পাচ্ছ নাকি?' জিজ্ঞাসা করলেন ওয়েজেলস্।

—'না, তা নয়, শুধু—তাই বটে, বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে ওরা, মি. ক্যাপ্টেন। পাগল হয়ে গেছে। আর মনে হয়, বন্দুক আছে ওদের কাছে।'

—'পাগল হয়েছ তুমি।' ওয়েজেলস্ বলে উঠলেন, 'বন্দুক ওরা কোথায় পাবে?'

—'বলতে পারি না তা। আপনারা যখন বন্দী করেছিলেন, হয়ত খুলে রেখেছিল তখন কিছু কারবাইন, লুকিয়ে রেখেছিল মেয়েদের কাছে। হয়ত মেয়েদের কাছে লুকিয়ে রেখেছে কিছু পিস্তল। মনে হয়, অন্তত্পক্ষে পাঁচটা বন্দুক আছে ওদের কাছে।'

—'তুমি একটা পাগল।' ওয়েজেলস্ আবার বললেন জোর দিয়ে। 'তুমি একটা পাগল আর কাপুরুষ। আমার চোখে এমন কোন দোআঁশলা পড়েনি যে কাপুরুষ নয়।'

—'বেশ তাই হবে—আবার যাচ্ছি আমি।' অনিচ্ছাসত্ত্বে মাথা নাড়ল রাওল্যাণ্ড। 'আবার যাচ্ছি আমি। কিন্তু জায়গাটা একটা নরককুণ্ড। ওরা বাইরেও আসবে না, ফিরেও যাবে না, মরবে ওখানেই, এটা ধ্রুব-সত্য।'

শিশুদের যা হোক একটা কিছু করবার জন্য অনুনয়-বিনয় করল লেফটেন্যাণ্ট অ্যালেন। সে বলল, 'যখন ওদের বন্দী করি তখনই উপোস করছিল বালবাচ্চাগুলো। আপনার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন তর্ক তুলছি না, ক্যাপ্টেন। এখানকার কর্তা আপনি, এটা নির্ভর করছে আপনারই উপর।'

—'আমি তো খাওয়াতেই চাই ওদের সবাইকে।' ওয়েজেলস্ বললেন। 'এ তো ওদের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার।'

—'কতখানি ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের ক্ষমতা আছে শিশুদের?'

—'ইণ্ডিয়ানরা—' বলতে শুরু করলেন ওয়েজেলস্।

—'হায়রে ভগবান! ইণ্ডিয়ানরাও তো মানুষ, স্যর। ছোট ছোট শিশুদের উপোস করিয়ে রেখে ইণ্ডিয়ান অপবাদ দিয়ে পার পেতে পারেন না আপনি।'

—'তোমার নিজের চরকায় তেল দিলেই ভাল হবে মনে হয়, লেফটেন্যাণ্ট।' ওয়েজেলস্ বলে উঠলেন। কিন্তু প্রস্তাবটা একবার মাথায় ঢুকতেই এত বেশি ভাবিয়ে তুলল ওয়েজেলস্কে যে তিনি রাওল্যাণ্ডকে বলে দিলেন, ব্যারাক-বাড়ি থেকে খুশিমত বাইরে চলে আসতে পারে শিশুরা। 'ওদের বলবে, শিশুদের বাইরে পাঠিয়ে দিতে।' ওয়েজেলস্ বললেন। 'ওদের খাওয়াব, তত্ত্বাবধান করব আমরা।'

কিন্তু ব্যারাক থেকে পাংশুমুখে বেরিয়ে এল রাওল্যাণ্ড; ভিতরটা হয়ে আছে নরককুণ্ডের মত, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগল এই কথাই—'ঠিক যেন নরক।'

—'শিশুদের পাঠাবে না ওরা?'

—'ওরা বলল, একসঙ্গে মরবে ওরা। শুধু বসে বসে আমার মুখের দিকে তাকাল ওরা। হায় ভগবান, এত ঠাণ্ডা ভেতরে, ঠাণ্ডা যেন হিম। বসে আছে সবাই, প্রত্যেকের সঙ্গে জড়াজড়ি করে, তাতে ওম পাওয়া যায় যদি একটু। তাকিয়ে রইল শুধু আমার মুখের দিকে।'

থার্মোমিটারে তাপ শূন্যের ছয় ডিগ্রী নিচে।

—'আগামীকাল ঠিক পথে আসবে ওরা।' ওয়েজেলস্ বললেন।

কিন্তু পরদিন তারা গাইতে শুরু করে দিল মৃত্যু-সঙ্গীত। বিস্তৃত বাড়িটা যখন মানুষগুলোর দেহ আর আত্মাকে অশুভ স্তব্ধতার আবরণে আবৃত করে ফেলেছিল এক নিঃশব্দ স্মৃতিস্তম্ভের মত, তখনই তো যথেষ্ট অস্বস্তিকর ছিল সেটা। আর এখন সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল এক মৃত্যু-সঙ্গীত। ঘাঁটির প্রতিটি আনাচে-কানাচে হিমেল বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সেই সঙ্গীত। একটা বাঁশি ছিল ওদের ওখানে, মাঝে মাঝে মৃত্যু-সঙ্গীতের শোকমূর্ছনায় মিলতে লাগল নিচু পর্দা ধরা বাঁশির সুর। এ হচ্ছে স্থির, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো একটা জাতির সর্বশেষ আদিম শ্মশান-সঙ্গীত।

ফৌজি-মহলের মনোবল একটু একটু করে নষ্ট হতে লাগল এতে। ব্যারাক-বাড়ি থেকে দূরে দূরে রইল সৈন্যেরা, চেষ্টা করতে লাগল ওইদিকে না তাকাতে। কেউ হাসলেও সে হাসি জোর করে হাসা, মুখের বিকৃতি মাত্র; প্রাণখোলা হাসি হাসে না কেউ। আর যা সবচেয়ে অশান্তিকর, তা হচ্ছে এই যে, আর তত বেশি মারামারি নেই ওদের মধ্যে তিক্ত হয়ে উঠল, গুম হয়ে উঠল সবাই, কিন্তু এক ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তাদের জীবনযাত্রায়। উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল তারা, হয়ে উঠল সশঙ্ক, বিচলিত।

আর এমনকি ওয়েজেলস্ পর্যন্ত বুঝতে লাগলেন যে এই নির্জন, বিচ্ছিন্ন সৈন্যাবাসে অরাজকতার সৃষ্টি করতে শুধুমাত্র একটা স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট।

খেতে বসে কথাবার্তা বন্ধ করে দিল অফিসাররা। কেউ হয়ত বলে একটা কথা, অন্য কেউ উত্তর দেয়, তারপর হয়ত উত্তরই দেয় না আর কেউ। স্তব্ধতার সঙ্গে শূন্যে থমকে থাকে প্রশ্নটা, বসে বসে তারা শোনে তখন।

খেয়েই চলে তারা, অবশেষে একজন বলে, 'কেন যে ওই অলক্ষুনে মড়াকান্না থামায় না ওরা?'

—'কেন?'

কেউ উত্তর দেয়, 'মরছে জানতে না-পারলে ওরা গায় না ও ধরনের মৃত্যু-সঙ্গীত।'

—'মরুক গে, তুমি থাম।'

তবু তারা শোনে কান পেতে, তারপর জোর করে শুরু-করা কথাবার্তাগুলো শোনায় বোকা বোকা, অর্থহীন।

—'বরফ পড়বে।'

—'মনে হচ্ছে তাই।'

—'একটু উত্তুরে—'

—'তা বাপু জানি নে। এত ঠাণ্ডা দেখে মনে হচ্ছে বরফ পড়বে।'

—'তা বলতে পারি নে। এর চেয়েও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বরফ পড়তে দেখেছি আমি।'

—'এর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হতে পারে না।'

—'কি যা-তা বল।'

তাদের কথা কটিও ঢাকা পড়ে যায় তাদের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে। পুব-অঞ্চলের কথা আর বলেও না তারা; উচ্চারণও করে না নারী সম্পর্কে, তাদের পরিবার সম্পর্কে। ভাল-মন্দ যা খেয়েছে, ভাল নাটক যা দেখেছে, ভাল বই যা পড়েছে—বলে না তাদের সম্পর্কে, সুন্দর সুখোষ্ণ সভ্য-জগতের যে-সব জায়গার সঙ্গলাভ করেছে—তাদের সম্পর্কেও না।

এমনকি ওয়েজেলসের শ্লথ স্নায়ু পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে পড়ল। অপদার্থ হলেও ভারিক্কি নেতা হিসাবে আগে যেখানে তিনি ছিলেন ফৌজি-ঘাঁটির কেন্দ্রবিন্দু, এখন সেখানে অনিশ্চয়তা আর বিমূঢ়ভাবের চিহ্ন দেখাতে শুরু করলেন তিনি। দুদিন ধরে করুণ মৃত্যু-সঙ্গীত শুনে শুনে মরিয়া হয়ে উঠলেন। যেভাবেই হোক দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে। রাওল্যাণ্ডকে পাকড়াও করলেন তিনি, বললেন, 'আবার তোমাকে যেতে হবে ওখানে, বুঝতে পারলে?'

অসম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল সে।

—'যেতে তোমাকে হবেই, গোটা রাস্তাটা যদি লাথি মারতে মারতে নিয়ে যেতে হয়, সেও ভি আচ্ছা।'

—'জ্যান্ত ফিরতে পারব না আমি ওখান থেকে।' বিড়বিড় করে বলল রাওল্যাণ্ড।

—'নিকুচি করি হতভাগার। ঠিক জ্যান্ত ফিরে আসতে পারবে, বেটা হারামজাদা। ফৌজের মাইনে টানছ আর বরাদ্দ গিলছ, কিছুই করছ না কয়েক সপ্তাহ ধরে। এখনি ওখানে যেতে হবে তোমাকে, গিয়ে সর্দারদের নিয়ে আসতে হবে আলোচনার জন্যে।'

—'বন্দুক আছে ওদের কাছে?' প্রতিবাদ জানাল রাওল্যাণ্ড।

—'এক ব্যাটারি কামানও যদি থাকে, তাহলেও তোয়াক্কা করি না আমি। তোমাকে যেতে হবেই, গিয়ে নিয়ে আসতে হবে সর্দারদের।'

অবশেষে রাওল্যাণ্ড গেল সেই ব্যারাক-বাড়িতে। ওখানে কি দেখতে পেয়েছিল দো-ভাষী রাওল্যাণ্ড, পরে তা জানতে পেরেছিলেন ওয়েজেলস্। রাওল্যাণ্ড দেখতে পেয়েছিল, বরফের মত ঠাণ্ডা মেঝেতে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে ইণ্ডিয়ানরা, মুখে মৃত্যুর মুখোস আঁটা, ফোলা পেট, কাঠি-কাঠি হাত-পা শিশুদের, হাড়ের খাঁজে খাঁজে ঢুকে গেছে ইণ্ডিয়ান মেয়েদের দেহের অপূর্ব সুন্দর বর্তুল মাংসপেশী, বৃদ্ধ আর যুবক, স্ত্রী আর মা-বাপ, বোন আর ভাই, সব এক হয়ে গেছে হিম-কঠিন যন্ত্রণায়—এক সময় যারা ছিল একটা গর্বিত সুখী জাতি, তাদেরই লজ্জাজনক, নিবু-নিবু দীপশিখা।

রাওল্যাণ্ড বেরিয়ে এল তিনজন সর্দারকে নিয়ে। বৃদ্ধ সর্দার নয়, তার সঙ্গে ছিল যে দু'জন তারা, আর অন্য একজন। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেও তার সাফল্যে জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করে রাওল্যাণ্ড; আঙুলে গুনে যেতে লাগল সর্দারদের—'বুনো-শুয়োর', 'বুড়ো-কাক' আর 'শক্ত-বাঁহাত'—বোকার মত নাম হলেও বড় বড় সর্দার ওরা—ইণ্ডিয়ানদের নামের মত বোকা বোকা নাম দুনিয়ায় আর নেই, কিন্তু সর্দার ওরা বড় গোছের।

—'ওরা 'ভোঁতা-ছুরি'কে—সেই 'বুড়ো-সর্দার'কে আসতে দেবে না।' ওয়েজেলস্‌কে বলল রাওল্যাণ্ড। 'দলটার মাথা হচ্ছে সে, ঠিক বাপের মত। ওকে ওখানেই রাখতে চায় ওরা, যাতে মরবার সময় ওরই মুখের দিকে তাকিয়ে মরতে পারে।'

—'আলোচনা-সভা হবে বলনি তা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রাওল্যাণ্ড। 'এই সর্দাররা ফিরে যেতে পারবে বলে মনে করে না ওরা। প্রত্যেককে চুমু খেয়ে বিদায় নিয়ে এসেছে ওরা। ওদের এখানকার মনের অবস্থাটা এই।'

সেই পুরনো দুলুনি-চেয়ারে বসে সিগার টানতে টানতে তাঁর অফিসে সর্দারদের অভ্যর্থনা জানালেন ওয়েজেলস্‌। নিরপেক্ষ বিচারের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন মুখে আর কণ্ঠস্বরে। তিনটি মুমূর্ষু প্রেতমূর্তি দাঁড়াল তাঁর সামনে—কম্পিত-দেহে, ছেঁড়া ঝুলিঝুলি পোশাকেই টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করল তাদের অহঙ্কারটুকু, কিন্তু দেখতে এমন যে, জ্ঞানবুদ্ধিতে ঠিকানা মেলে না তার। ক্রম রইল সেখানে, রইল সৈন্য দুজনও। মৌরির আরকে ভেজানো রুমাল শুঁকতে লাগল ক্রম। সর্দারদের থেকে যতদূরে পারে দাঁড়িয়ে রইল রাওল্যাণ্ড।

সোজাসুজি কথা পাড়লেন ওয়েজেলস্‌, 'দেখলে তো গোঁয়ারতুমি করে কি লাভ হল তোমাদের। এখন তো বুঝলে আইন মানলে কত লাভ। তোমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা নেই আমার। লোকজনদের কাছে ফিরে গিয়ে বল ওদের বেরিয়ে আসতে, তৈরি হয়ে নাও দক্ষিণে যাবার জন্যে। তারপর খেতে দেব আমি তাদের।'

রাওল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বরে বেজে উঠল আতঙ্ক আর—বিস্ময়। 'দক্ষিণে ওরা যাবে না কিছুতেই, খুন করতে পারেন আপনি ওদের, কিন্তু ওই পর্যন্তই—' সে যেন চেষ্টা করল তার পূর্বপুরুষের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে নিতে, শাদা-মানুষেরা যাকে স্বাধীনতা বলে সেই ধোঁয়াটে জিনিসটার প্রতি এমন উন্মত্ত আকর্ষণ কিসে জন্মায় তাই যেন আবিষ্কারের চেষ্টা করল সে।

দাঁতের ফাঁকে সিগার চেপে সৈন্য দু'জনকে সহজভাবে হুকুম দিলেন ওয়েজেলস্‌, 'হাতকড়া পরাও বেজন্মা ইণ্ডিয়ানগুলোকে।'

তাঁর কথা বুঝতে না পেরে ইণ্ডিয়ানরা তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে,—আশা নেই, ঔৎসুক্য নেই, বিষণ্ণ অতি প্রাচীন গর্বটুকু ছাড়া কিছুই নেই তাদের। নড়ল না তারা একটুও।

—'বলে দাও, বন্দী করা হল ওদের।' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন ওয়েজেলস্‌।

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সর্দারদের সামনাসামনি বন্দুক উঁচিয়ে ধরল সৈন্য দু'জন। আঁতকে পিছিয়ে এল রাওল্যাণ্ড। পিস্তলের খাপটা আলগা করে দিল ক্রম।

বলতে শুরু করছিল রাওল্যাণ্ড, কিন্তু ইতিমধ্যেই সর্দাররা বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। ওদের একজন দৈত্যের মত দেখতে, অস্থিসার মুখে তার বিরাট একটা কাটার দাগ; পোশাকের ভিতর থেকে একটা ছুরি বার করে বসল সে। অন্য একজন সৈন্যদের

একজনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই বন্দুকের চোঙা দিয়ে মাথায় এক মারাত্মক ঘা কষিয়ে দিল সৈন্যটি। ইতিমধ্যে ছুরি হাতে ইণ্ডিয়ানটা নিজের ভাষায় চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল অপর সৈন্যটির ঘাড়ে। ঝাপটাঝাপটিতে ঘরের যা অবস্থা দাঁড়াল তাতে গুলি ছুঁড়তে ভয় পেয়ে পিছু হটল সৈন্যটি, হাত দিয়ে ছুরির আঘাতগুলো আটকাল সে, বিশ্রীভাবে কেটে গেল কয়েক জায়গায়। ইণ্ডিয়ানটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ক্রম, পিস্তলের লম্বা বাঁটটা দিয়ে ঘা মারল তার মাথায়। পিস্তল বার করে অন্য সর্দারটাকে লক্ষ্য করলেন ওয়েজেলস্, কিন্তু মাঝখানে পড়ে গেল ক্রম আর সৈন্য দু'জন। ক্রম যাকে ঘা মেরেছিল মাথা কেটে গেল তার, রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে গেল সে। অন্য সর্দারের দিকে টিপ করে গুলি ছুঁড়লেন ওয়েজেলস্।

নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল গুলিটা। বাজের আওয়াজের মত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল অফিস-ঘর, জাগিয়ে দিল ঘাঁটির সবাইকে। একজন সর্দারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ক্রম, ধাক্কা দিয়ে ক্রমকে সরিয়ে দিল সে, এক অমানুষিক বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল জানলা দিয়ে, কপাট, সার্সি সব-কিছু ভেঙেচুরে নিয়ে। বরফের উপর গড়াতে গড়াতে অবশেষে উঠে পড়ল পায়ের উপর ভর দিয়ে, তারপর এঁকেবেঁকে ছুটল ব্যারাকের দিকে। ভাঙা জানলার ভিতর দিয়ে ধড়টা এগিয়ে ইণ্ডিয়ানের দিকে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে চললেন ওয়েজেলস্; দূরত্বটা অনেক বেশি হয়ে পড়ল পিস্তলের পক্ষে, লোকটা ঘুরে ছুটল এঁকেবেঁকে।

সৈন্যরা যখন বন্দুক নিয়ে জানলার ধারে এসে পৌছল ততক্ষণে কাঠের ব্যারাক-বাড়ির আশ্রয় পেয়ে গেল ইণ্ডিয়ানটি, একটা সান্ত্রী তার পথ আগলাতে গেলে লম্বা পা ফেলে ঢুকে পড়ল খোলা দরজার ভিতর দিয়ে।

ততক্ষণে জেগে উঠেছে গোটা ঘাঁটিটা, সব জায়গা থেকে ছুটে আসতে লাগল সৈন্যরা। ক্রম বাইরে এল তাদের শান্ত করতে, আর পড়ে-থাকা সর্দারকে হাত কড়া পরাতে নির্দেশ দিলেন ওয়েজেলস্। মুখে কাটা-দাগওয়ালা ইণ্ডিয়ানটার জ্ঞান ফিরে এসেছিল সেই সময়েই। ছুরিখানার জন্য হাতটা বাড়াল সে, কিন্তু লাথি মেরে নাগালের বাইরে ছুঁড়ে দিলেন ওয়েজেলস্, পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন তার গায়ের উপর, হাতকড়া পরানো হল অপরজনকেও। আহত সৈন্যটি ছুরি-লাগা হাতখানা চেপে ধরে হোঁচট খেতে খেতে চলল দাওয়াইখানার দিকে।

এক প্রাচীরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন যেন ওয়েজেলস্, দুধারে বিস্তৃত সে প্রাচীর—শেষ নেই তার, চুড়ো দেখা যায় না উঁচুতে, এক অন্ধ, পীড়াদায়ক, দুঃসহ প্রাচীর। সেদিন সন্ধ্যায় যখন খাবার ঘরে গিয়ে বসলেন, সেখানেও মাথা তুলে দাঁড়াল সে-প্রাচীর। তার দিকে না তাকাবার চেষ্টা করলেও তিনি সেই প্রাচীরকেই দেখতে পেলেন সবার মুখের চেহারায়, দেখতে পেলেন সবার খাবার ধরন-ধারণে; আস্তে আস্তে, প্রতিটি গ্রাস চেখে চেখে, বড় বড় চোখে খাবারের দিকে তাকিয়ে, চাপা বিস্ময়ে আতঙ্কে

জল আর কফি ঢালতে ঢালতে খেতে লাগল সবাই—যেন কোন-কিছু চিবিয়ে খাওয়ার সঙ্গে, গলা ভেজানো কোন পানীয়ের সঙ্গে আগে কোনদিন পরিচিত নয় তারা, পরিচিত নয় এই সমস্ত খাবারের সঙ্গে—জমানো দুধে তৈরি এই হলদেটে কফি, এই মিষ্টান্ন, মাংস, এই আলু, রুটি—পরিচিত নয় কিছুর সঙ্গেই। টেবিলের ধার পর্যন্ত চারটে পাত্র বোঝাই জ্যাম, খাস্তা বিস্কুট আর সিগার।

বেশি খেতে পারল না কেউ। থালাতেই পড়ে রইল খাবার। রান্নাঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এসব, ফেলে দেওয়া হবে তারপর। লম্বা টেবিলের সামনে পিছনে নিজ নিজ রেজিমেণ্টের তকমা-আঁটা ক্যাপ্টেন, প্রথম লেফটেন্যাণ্ট, দ্বিতীয় লেফটেন্যাণ্ট—সবাই বসে রইল মাথা নিচু করে। অধিকাংশই তরুণ, কেউ কেউ আধবয়সীর কাছাকাছি। দেড়শো মানুষকে হত্যা করা, উপোস করিয়ে মারাটা যে কি বস্তু তা জানে না তাদের কেউ। জানতেও চেষ্টা করল না তাদের অধিকাংশই।

—'হতভাগা গানটা থামিয়েছে ওরা।' বলে উঠল একজন।

কথাটা শুনল সবাই। একটা সিগার ধরাল ক্রম। একটা মজার গল্প বলতে চেষ্টা করল একজন, শেষ পর্যন্ত বলে গেল চেষ্টা চরিত্র করে, তারপর আবার ডুবে গেল সবাই নিস্তব্ধতায়—তেমনি আগের মতই পীড়াদায়ক স্তব্ধতা।

কিন্তু টেবিল ছেড়ে উঠবার চেষ্টাও করল না কেউ।

বাক্সটার বলল, 'ভিতরে ব্যারিকেড করে আছে ওরা। দরজা খুলতে চেষ্টা করেছিল জেঙ্কিন।'

ঘাড় নাড়লেন ওয়েজেলস্।

ওদের যে খাওয়ানো উচিত, এ-কথাটা বলতে সাহস হল না কারুর। ওয়েজেলসের পক্ষে ওদের খাওয়ানোর অর্থ তাঁর নিজস্ব সত্তার একটা মৌলিক ভিত্তিকে—যার জোরে বেঁচে আছেন এমন একটা যুক্তিকে—পুরোপুরি ভেঙে চুরমার করা। অন্যদের চোখে ওয়েজেলসের পিছন থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল 'ওয়াশিংটনের নির্দেশ'গুলোর নির্বোধ আয়তন। বরফের প্রান্তরে হারিয়ে তখনো তারাই এক মরীচিকার প্রসারিত অঙ্গুলি, তাতেই বেঁচে আছে ওরা।

অ্যালেন মন্তব্য করল বিষণ্ণভাবে, 'মনে হচ্ছে, বন্দুক আছে ওদের কাছে। রাওল্যাণ্ডের এ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস।'

—'জনসন যদি আমাকে শুরুতেই ইণ্ডিয়ান মেয়েদের খানাতল্লাস করতে দিতেন—' ওয়েজেলস্ ভাবলেন। বললেন, 'বেশি বন্দুক থাকতে পারে না ওদের কাছে।'

সবাই ভাবল একদিন কি দুদিনের মধ্যেই মরতে শুরু করবে ওরা। কি আসবে যাবে বন্দুকে?

—'দো-আঁশলা ব্যাটা মিথ্যেবাদী।'

—'এত ভয় পেয়েছে যে মিথ্যে বলা সম্ভব নয়।'

পোকার খেলার প্রস্তাব করল একজন। উৎসাহ না থাকলেও হুইস্টের তাসের

চৌকো পাবার চেষ্টা করল ক্রম। একজন উঠে এগিয়ে গেল দরজা পর্যন্ত, দরজাটা খুলে একবার তাকাল থার্মোমিটারের দিকে। পারা নেমেছে চারের নিচে।

—'বড় ঠাণ্ডা।'

লক্ষ্যহীনভাবে তবুও ক্রম খেলে চলল হুইস্ট।

—'কালকেই যেতে হবে আমাদের ওখানে।' মনে জোর না পেলেও বললেন ওয়েজেলস্।

—'চারের নিচে।' অহেতুক বলে উঠল একজন।

—'লেস্টার আছে কেমন?' হাতে আঘাত লেগেছিল যার, তার কথা জিজ্ঞাসা করল অ্যালেন।

—'ভালই আছে—তবে বিশ্রী কোপ লেগেছে হাতে। ঘা বিষিয়ে না উঠলে ভাল হয়ে উঠবে।'

মেস ঘরের চারধারে ঘুরল তারা, ফিরে এল টেবিলের কাছে। 'হুইস্ট খেলা ছেড়ে দিল ক্রম। সেখানে বসে বসে তারা দেখতে লাগল টুকরোটাকরাগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে নিতে লাগল আর্দালী।

সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদ উঠল শাদা জোছনার পরিপূর্ণ গৌরবে। শীতের দমকায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে মেঘের দল। আকাশটা যেন হাজার হাজার তারা বসানো একখানা ঝুলন্ত থালার মত। চাঁদের আলো, আর বরফের গায়ে ঠিকরে পড়া তার প্রতিফলন এত জোরালো যে, রাত নটায় কুচকাওয়াজের মাঠের মাঝখানে বসে যে কেউ পড়তে পারে খবরের কাগজ, চোখের জোর লাগে না একটুও। পাহাড়ের বেষ্টনী আর বরফে ঢাকা পাইন গাছগুলো কেবল বাড়িয়ে তুলল দৃশ্যপটের সৌন্দর্য, ঘাঁটির ঘরগুলো যেন আলোকিত মল্লভূমিতে ইতস্তত ছুঁড়ে দেওয়া কাঠের চৌকো চৌকো টুকরোর মত।

গন্ধের এক জটিল জালে আটকে পড়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে রইল একটা বুনো নেকড়ে; খাবারের গন্ধ, মানুষের গন্ধ, পরিচিত পুরনো ইণ্ডিয়ানদের গায়ের গন্ধ, গন্ধের এই অনুভূতিগুলো জেগে রইল তার মগজের গভীর গর্তে। দুঃখে হতাশায় চিৎকার করে ডেকে উঠতে লাগল জ্বলন্ত চাঁদের দিকে মুখ করে। কেল্লার বাবুর্চি দুটো দো-আঁশলা কুকুর লেলিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত একটানা চিৎকার করে চলল নেকড়েটা, তারপর কেঁই কেঁই করতে করতে ফিরে গেল অন্ধকার পাইনের জঙ্গলে।

হিমশীতল আস্তাবলে নিজেদেরই নিশ্বাসের বাষ্পে আবৃত ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি করে ডেকে উঠল ভীতকণ্ঠে।

প্রহরীদের সংখ্যা অনেক, ব্যারাকের চারপাশে নিরবচ্ছিন্ন পাহারায় ব্যস্ত প্রহরীরা। দরজার সামনেকার প্রহরীরা, আস্তাবলের প্রহরীরা, আর যাদের কাজের জন্য বেরুতে হয়েছে ঠাণ্ডায়, তাদের সবাই নিশ্বাসের দীর্ঘ রেখা পিছনে পিছনে টেনে হাঁটতে লাগল দ্রুত-পায়ে ভয়ে ভয়ে।

কেল্লার দোকানদার সকাল সকাল দোকান বন্ধ করে মনঃসংযোগের চেষ্টা করতে লাগল ওমাহার একখানা সংবাদপত্রে।

নিজের নিজের ব্যারাকে বসে সৈন্যরা খেলতে লাগল তাস, কেউ-বা দিতে লাগল জুয়োর দান, কেউ-বা পড়তে লাগল দশ সেণ্ট দামের সস্তা নভেল, কেউ-বা ঘষে মেজে পরিষ্কার করে রাখতে লাগল জিনিসপত্র। করবার মত কিছুই নেই বলে অত সকালেই শুয়ে পড়ল কেউ কেউ।

দাঁতের ব্যথা হয়েছে সার্জেণ্ট ল্যান্সির, গাল দুটো ফুলে ঢোল, চোখ দুটো লাল। গত দু রাত ধরে চোখে ঘুম নেই তার।

সিগার টানতে টানতে ওয়েজেলস্ দেখতে লাগলেন পেনি আর বোতামের এক উত্তেজনাহীন খেলা। ঘাঁটিতে পেনির কমতি আছে, তাই তারা খেলছে নীল রঙের নশ্বরি চাক্তি দিয়ে। সে চাক্তিগুলোর বেশির ভাগই জড় হয়ে উঠতে লাগল ক্রমের দিকে। প্রত্যেক হাতে খেলতে লাগল ক্রম, জিততে লাগল সবার সঙ্গেই। চিঠি লিখতে বসল লেফটেন্যাণ্ট অ্যালেন তার মায়ের কাছে। প্রতিটি দিনের, চব্বিশ ঘণ্টার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিখতে লাগল অত্যন্ত মন দিয়ে, ফৌজি ইস্কুলে প্রথম যখন যোগ দেয়, তখন থেকেই এ অভ্যাস বজায় রেখেছে সে।

চিঠিখানা তার বিস্তারিত, ঘরোয়া ঢঙের। একটা মায়ের জীবন গড়ে ওঠে যাতে তারই হাজারটা ছোটখাট জিনিসে সমৃদ্ধ। ফ্লানেলের অন্তর্বাসটা পরেছে সে, পায়ে দিয়েছে দুজোড়া মোজা, সুতীর মোজাটা নিচে, গরমটা উপরে। শীত পড়েছে সত্যি, কিন্তু পুব অঞ্চলে যতখানি মনে হয়, ততখানি শীত এখানে নয়। এ ঠাণ্ডা শুকনো ঠাণ্ডা, খুব স্বাস্থ্যকর। একটু হেসে 'স্বাস্থ্যকর' কথাটার নিচে দাগ দিয়ে দিল সে। গত কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রথম হাসতে পারল সে। বরফ পড়বে মনে করছে সবাই, কিন্তু রাতটা এত পরিষ্কার, আকাশে উঠেছে অপূর্ব একটা গোটা চাঁদ। আর, মনে হয়, পূর্ণিমার চাঁদ দেখলেই বেরিয়ে আসে নেকড়েগুলো, চিৎকার জুড়ে দেয় চাঁদের আলো দেখে। না, না, এ নেকড়ে সাধারণ নেকড়ের মত নয়, বিপজ্জনকও নয় মোটেই, দেখতে এইটুকু, খেঁকশিয়ালের চেয়েও হয়ত বড় হবে না। ছিঁচকে চুরি আর আস্তাকুড়ের টিন উল্টে দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোন-কিছুই করতে পারে না তারা। ঠিক একটা লোমওয়ালা ছোট্ট কুকুর যেন। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কেও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ, সমতলে লড়াই আর হবে না কোনদিনই। ক্যাপ্টেন ক্রমের সঙ্গে মৌরি সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে তার। এতে ক্রমের অখণ্ড বিশ্বাস; উল্লেখযোগ্য এটা তার মায়ের দিক থেকে, কারণ মৌরি তাঁর খুব পছন্দ-সই, অ্যালেন যদিও বিশ্বাস করে না এটা সর্দির পক্ষে উপকারী। এখানে খুব সহজে সর্দি লাগে না, এখানকার হাওয়া এত শুকনো যে—।

পরদিনের রুটির জন্য ময়দা মাখা শেষ করে উনুনের পাশে কাঠের টবে সাজিয়ে, ভেজা কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে দিল বাবুর্চি। বাবুর্চি আর ওয়েজেলসের আর্দালির

আলোচনা চলল ফরাসিদের নিয়ে; ওদের কেউই পছন্দ করে না ফরাসিদের, অবশ্য কোনদিন কোন ফরাসির সঙ্গে আলাপও হয়নি ওদের কারুর। চীনে বাবুর্চিদের কাছ থেকে শুনে শুনে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছে ওরা। চীনে বাবুর্চিদের সঙ্গে পরিচয় আছে দু'জনেরই।

ব্যারাক-বাড়ির জেলখানার চারপাশে একটানা পাহারায় থাকা সান্ত্রীরা বাপান্ত করতে লাগল ঠাণ্ডার। পারা উঠছে, কি নামছে এই নিয়ে গবেষণা শুরু হল তাদের। একজন বলে বসল, পারা এখন অন্তত দশ ডিগ্রীরও নিচে। আরেকজন বলল, পাঁচের নিচে নামলে আবহাওয়ার পার্থক্য বুঝবার বোধশক্তিই নষ্ট হয়ে যায়। সে বলল, পাঁচের নিচে অথবা ত্রিশের নিচে—বোধশক্তির দিক থেকে দুটো একই। শুধুমাত্র একটা বিশেষ সীমার মধ্যেই মানুষের ঠাণ্ডা কি গরমের বোধটা খাপ খেয়ে থাকে—এই ধরনের একটা নিজস্ব ধারণা আছে তার, সে সীমাটা অবশ্য ভদ্রগোছের হওয়া চাই, বিশ্রী, হাড়-কাঁপানো হলে চলবে না। শেষের কথাটায় একমত হল সবাই।

এই হচ্ছে রবিনসন কেল্লায় সেদিনকার রাত নটার ঘটনা।

ইণ্ডিয়ানরা যে ব্যারাকে আটক আছে তার চারপাশে পাহারা দিতে দিতে একজন সান্ত্রী শুনতে পেল এক অদ্ভুত আওয়াজ। রাত তখন দশটা। পরে সে বলেছিল, পিস্তলের ঘোড়া তুলতে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমনি শব্দটা। রাতটা গভীর নিস্তব্ধ, সামান্যমাত্র শব্দ হলে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে স্বচ্ছ হিমেল বাতাসে। সান্ত্রীটির নাম জেফিসন, সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অপর সঙ্গীর জন্য। ব্যারাকে একটা জানলার ঠিক নিচে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে।

জানলাগুলো ভিতরে বন্ধ করা। ভাবি পাল্লাগুলো ভিতর থেকে ঝোলানো, ঘরের বাইরে না গিয়েও বন্ধ করা যায় পাল্লা। সমতল অঞ্চলে এটা অতি সাধারণ জিনিস, সত্যি বলতে কি, আমেরিকার সীমান্ত-অঞ্চলের বাড়িগুলো তৈরির গৌণ উদ্দেশ্যই হচ্ছে কেল্লা হিসাবে ব্যবহার করা। ওয়েজেলসের অফিস থেকে সর্দার 'শক্ত-বাঁ-হাত' পালিয়ে ব্যারাকে ঢোকার পরই দরজায় খিল এঁটে, জানলার পাল্লাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল ইণ্ডিয়ানরা, তারপর থেকে খোলেনি একবারও।

এবারে ব্যারাকের অত্যন্ত কাছে সরে কান পাতল জেফিসন আর তার সঙ্গী। সান্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল তাদের লক্ষ্য করে। জেফিসনের মনে হল, আবার সে শুনতে পেল সেই শব্দ, পিস্তলের ঘোড়া তোলার মত শব্দটা। আরও মনে হল ব্যারাকের ভিতর থেকে কাঠের দেওয়ালটা চেপে আছে অনেকগুলো লোক, বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে তাদের। জেফিসনের সঙ্গী লিউক পার্ডি জানলার ভাঙা সার্সি দিয়ে কারবাইনের বাঁটটা গলিয়ে চাপ দিল পাল্লাটায়। একটু ফাঁক হল পাল্লাটা, যেন খিল দেওয়া নেই জানলায়, কিন্তু চেপে ধরে রাখা হয়েছে ভিতর থেকে।

ব্যাপারটা ভাল মনে হল না জেকিন্সনের, বললও তাই। মন্তব্য করল, 'একটা মজার কোন ব্যাপার স্যাপার চলছে ভেতরে।'

কারবাইনের বাঁট দিয়ে জানলার বন্ধ পাল্লায় চাপটা দিয়েই চলল পাডি। বাড়িটার কোণের দিক থেকে একটা সান্ত্রী এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে চক্কর ভেঙে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যে দু'জন, তারা দরজার দিকে পিছন ফিরে লক্ষ্য করতে লাগল পার্ডি আর জেফিসনকে।

তারপর যা ঘটল তা এত আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে পরে কেউ বলতেই পারল না তার ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনী। এটা বেশ বোঝা গেল পরে, প্রত্যেক জানলার নিচে জড় করা জিন, পুরনো কাঁচা চামড়া আর জিনিসপত্র দিয়ে ধাপ তৈরি করেছিল ইণ্ডিয়ানরা। তারপর হঠাৎ একই সঙ্গে সশব্দে খুলে গেল সমস্ত পাল্লা, সমস্ত দরজা, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল জানলা আর সার্সিগুলো। আর, প্রতিটি ফাঁক দিয়ে ইণ্ডিয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল বরফের উপর। প্রায় অবিশ্বাস্য শক্তিতে জানলা দিয়ে আগে লাফিয়ে পড়ল পুরুষেরা, পিছনে নারী আর শিশুরা নামতে লাগল হামাগুড়ি দিয়ে। টেনে হিঁচড়ে পুরুষেরা সাহায্য করতে লাগল তাদের। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অন্তত প্রথম দশজনের হাতে রাইফেল আর পিস্তল; ব্যারাকের মধ্যে হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে তাই দিয়ে তৈরি করা অস্ত্রশস্ত্র অন্যদের হাতে—লোহার স্টোভের পায়া, মেঝে থেকে তুলে নেওয়া কাঠের তক্তা, লাঠি, মেঝের নিচের বরফ-জমা মাটি খুঁড়ে তোলা পাথরের টুকরো; বন্দী হবার সময় মেয়েরা লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল যে কয়েকখানা ছোরাছুরি তাই অনেকের হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল পার্ডি, বন্দুক ছুঁড়তে চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু তার মুখের উপরই গর্জে উঠল একটা পিস্তল, প্রাণহীন দেহে সে পড়ে রইল জানলার সামনে। প্রথম গুলিতেই একজন ইণ্ডিয়ানকে মেরে ফেলল জেফিসন, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে সে ছিটকে পড়ল অক্ষতভাবেই। তখন ব্যারাকের কাঠের দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে চালাতে লাগল গুলি। আর কেউ নিহত হল না সান্ত্রীদের মধ্যে; হয় তারা লাফিয়ে সরে গেল পথ থেকে নয়ত হকচকিয়ে বসে পড়ল ইণ্ডিয়ানদের 'ঢেউ'-এর মুখে।

লাফিয়ে পড়েই শাদা ধবধবে বিরাট কুচকাওয়াজের মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটল ইণ্ডিয়ানরা। কাহিল অবস্থায় যত জোরে সম্ভব তত জোরেই ছুটল ওরা, ছোট ছোট শিশু আর অশক্ত বৃদ্ধদের বয়ে নিয়ে চলল মেয়ে-পুরুষে। সহজাত সংস্কারের বশেই ওরা ছুটল গাছপালাঘেরা নদীর দিকে, আশ্রয় আর জল দুই-ই চাই তাদের।

প্রথম ঝাপটা গুলির আওয়াজেই জেগে উঠল ঘাঁটিটা। সবেমাত্র কোটের বোতাম খুলছিলেন ওয়েজেলস্, ঘুমুতে যাবেন তিনি—পিস্তলটা মুঠো করে ধরে ছুটলেন কুচকাওয়াজের মাঠের দিকে। তখন চলছিল পোকার খেলা। লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল অফিসাররা, তাদের পিছনে বারবার করে ঝরে পড়তে লাগল নীল রঙের মার্কারগুলো। শুধু বন্দুক আর একমুঠো কার্তুজ নেবার জন্য একটু থেমে তারা ছুটল

গরম অন্তর্বাসেই। কাপড়-চোপড় খুলে ঘুমুতে যাবার আগেকার বিভিন্ন অবস্থাতেই আর-সব সৈন্য নেমে পড়েছে ইতিমধ্যেই।

তাদের সামনেকার শাদা ধবধবে কুচকাওয়াজের বিস্তৃত মাঠটা যেন চাঁদের আলোয় ঝলমলে এক রঙ্গমঞ্চ, পলায়নপর শী-এনদের ছোট ছোট বিন্দু ফুটে উঠল তাতে। সৈন্যদের পক্ষে, অফিসারদের পক্ষে এই হচ্ছে মুক্তির মুহূর্ত, পরিপূর্ণ মুক্তি তাদের গুমরে-গুমরে-মরা ইণ্ডিয়ানদের উপস্থিতি থেকে, স্বাধীনতা বস্তুটির উপরে উন্মাদজনোচিত অদ্ভুত মূল্য আরোপ করে যারা—মুক্তি সেই অশুভ মানুষগুলোর প্রেতমূর্তির হাত থেকে।

গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল তারা। ক্রোধ—মুক্তির আস্বাদে এক দুর্বোধ্য অমানুষিক আক্রোশ শাদা ঝকঝকে চাঁদের আলোর মতই হিম-ক ন করে তুলল তাদের। সেইখানে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল তারা, বসিয়ে রাখা মাটির পায়রা দিয়ে চাঁদমারি করে যেমন করে লোকে। গুলি চালাতে চালাতে রাইফেলের গরম নলে ফোস্কা পড়ে গেল হাতে। আর শাদা বরফের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল কালো ইণ্ডিয়ানরা, চুপসে-যাওয়া বস্তাব মত পড়তে লাগল, গড়াতে লাগল এলোমেলো। আগাগোড়া বরফের উপর মৃতদেহের কালো কালো বিন্দু ফুটে উঠল পোল্‌কা-নাচের বিন্দুর মত। মেরেই চলল তারা কোন কিছু চিন্তা না করে, বিচার না করে, নির্মম নিষ্ঠুরভাবে। গুলি চালিয়ে দিতে লাগল দশ বছরের শিশুর বুকে, একটানা দীর্ঘ আশিটা বছর কাটিয়ে এসেছে যে প্রাচীন মানুষটি গুলি চালাতে লাগল তার বুকে। খুঁজে খুঁজে মারতে লাগল দৌড়ে-পালানো মেয়েদের; আহত মেয়েরা আর্তনাদ করে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে গেলে গুলি চালাতে লাগল তাদের দিকে। ঠাণ্ডার কথা ভুলে গিয়ে খালি পায়েই তারা ছুটল ইণ্ডিয়ানদের পিছনে; মাটিতে এলিয়ে-পড়ে-থাকা মূর্তিগুলোর যে কারুরই একটু জীবনের লক্ষণ দেখা গেল, থামতে লাগল তাদেরই উপর গুলি চালিয়ে দেবার জন্য।

শী-এনদের সম্মুখরক্ষীদল যাদের হাতে ছিল সামান্য কিছু রাইফেল আর পিস্তল —তারা ইতিমধ্যেই পৌঁছে যেতে পারল নদীর ধারে। সটান উপুড় হয়ে পড়ল তারা বরফের উপর, হাত দিয়ে, বন্দুক দিয়ে ভেঙে ফেলল পাতলা বরফের আস্তরণ। আওয়াজ করে রাইফেলের গুলি ছুটে আসতে লাগল তাদের পিছন থেকে, তা সত্ত্বেও জল খেতে লাগল তারা একটানা, একভাবে ঢকঢক করে। তারপর, হামাগুড়ি দিয়ে এগুল পাড়ের দিকে, চেষ্টা করতে লাগল সৈন্যদের আটকে রাখতে, আর ততক্ষণে হুড়োহুড়ি করে সবাই নামতে লাগল পাড় বেয়ে, পাগলের মত ছুটল জলের জন্য। সব-সুদ্ধ প্রায় জন পঞ্চাশেক গিয়ে পৌঁছতে পারল নদীর মধ্যে।

অর্ধ-উলঙ্গ সৈন্যদের ইণ্ডিয়ানদের দিকে চালিয়ে নিয়ে চললেন ওয়েজেলস্ আর ভ্রম। এক হাতে একটা খালি পিস্তল ঘোরাতে ঘোরাতে, আর-এক হাতে একখানা তলোয়ার নিয়ে পাগলের মত চিৎকার করে ওয়েজেলস্ ছুটলেন নদীর দিকে। তাঁর

আগুন-জ্বলা মনে অস্পষ্ট অনুভূতি—তাঁর প্রথমবারের কর্তৃত্বেই ব্যর্থ হয়েছেন তিনি শোচনীয়ভাবে, কয়েকজন বন্দীর দায়িত্ব পেয়ে তিনি তাদের সম্পর্কিত নির্দেশ পালনেই ব্যর্থ হননি শুধু, পালাতেও সক্ষম হয়েছে বন্দীরা। তাঁর শিক্ষা, তাঁর বংশ, বিদ্যা, সংযমের সূক্ষ্ম বোধগুলি ভেঙে চুরমার করে দিল সেই অনুভূতি। ভাগ্যবিড়ম্বিত, ক্রোধে ক্ষিপ্ত এক উন্মাদের মত হয়ে উঠলেন তিনি।

নদীর মধ্যে একটা শিশু-কোলে এক বৃদ্ধকে ধরে ফেললেন তাঁরা। তলোয়ারের একটা কোপেই বৃদ্ধকে দুখানা করে দিলেন ওয়েজেলস্। তাঁর কাছাকাছি একজন গুলি করল শিশুকে। নদীর মধ্যে এগিয়ে গেলেন তাঁরা; চাঁদের আলোয় দেখতে পেলেন দু'জন ইণ্ডিয়ানকে। হাতে শুধু ছুরি নিয়ে আটকাবার চেষ্টা করল তারা, যাতে এগিয়ে গেছে যারা, তারা পালাতে পারে সহজে। ওয়েজেলস্‌কে ছাড়িয়ে ছুটে এগিয়ে গেল সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। একজন ইণ্ডিয়ান পড়ে গেল, রক্তাক্ত দেহে অন্যজন কোন রকমে পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘোরাল তার ছুরিটা। তাকে ঝাঁঝরা করে দিল ক্রুম।

এক আহত 'কুকুর-সেনা'র দেখা পেল তারা, যেখানে সে শুয়ে পড়ে আছে, শরীরের চাপে বরফের আস্তরণ ভেঙে গেছে সেখানকার। মৃদু আর্তনাদে সে গাইছে তার মৃত্যু-সঙ্গীত। খালি পিস্তলেরই ঘোড়াটা টিপে দিলেন ওয়েজেলস্। মৃত্যু-পথ-যাত্রীর দেহে দশ-বারটা গুলি চালিয়ে দিল সৈন্যরা।

ছটা মেয়ে আর দুটো ছেলের একটা ছোট দলের সামনে এসে পড়ল তারা। এ ওর গায়ে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে বরফের উপর, এত দুর্বল যে সাধ্য নেই আর এক পা চলার। একটা মেয়ের কোলে একটা মরা শিশু। গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সৈন্যরা, ছুঁড়েই চলল যতক্ষণ না ছটি মেয়ে আর একটি ছেলে মরে ভাসতে লাগল রক্ত-গঙ্গায়। অপরটি কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে ঢুকল একটা ঝোপের মধ্যে। ওয়েজেলস্ আর সৈন্যরা তার পিছন পিছন ছুটে গিয়ে খুঁজে বার করল তাকে, একটা ফাঁকে আটকে গেছে সে হাত পঁচিশেক দূরে। একজন সৈন্য উঁচু করল তার বন্দুক, কিন্তু ঘা মেরে ফেলে দিলেন ওয়েজেলস্। বমি করতে শুরু করল অপর একজন।

ঝোপের ফাঁকে এগিয়ে গিয়ে ওয়েজেলস্ টেনে নিয়ে এলেন ছেলেটকে, শীর্ণ জীর্ণ এগার-বার বছরের ভীত-সন্ত্রস্ত এক প্রেতমূর্তি, সারা দেহ রক্তাক্ত; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে, গোঙাতে লাগল বায়ুগ্রস্তের মত।

বিকারের ঘোরটা কেটে গেল এবার, ধুয়ে মুছে শান্ত হল রক্তস্নান করে। হিমজর্জর, ক্লান্ত, পীড়িত হয়ে পড়ল রবিনসন কেল্লার সৈন্যরা। ছেলেটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে লাগল শান্ত করতে, তার সমস্ত ভয় দূর করতে। তারপর তুলে নিল তাকে, বয়ে নিয়ে ফিরে চলল কেল্লায়।

পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল ওয়েজেলসের, ঠাণ্ডায় জমে কাঁপতে কাঁপতে কুচকাওয়াজের মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটে চললেন তিনি। বহুক্ষণ আগে থেমে

গেলেও তাঁর কানে তখনো বাজতে লাগল গুলির শব্দ। ঘাঁটিতে এখন শুধু আহতদের আর্তনাদের শব্দ।

নির্বাক সৈন্যরা চারপাশ থেকে ইণ্ডিয়ানদের মৃতদেহ তুলে তুলে বয়ে নিয়ে চলল পুরনো ব্যারাক-বাড়িটায়, সেখানে দেয়ালের গায়ে গাদা করে রাখতে লাগল কাঠের বোঝার মত। অন্যেরা নিয়ে আসতে লাগল আহত শিশুদের, সাহায্য করতে লাগল মেয়েদের। কিন্তু মৃতের সংখ্যা যত বেশি, আহতের সংখ্যা তত নয়। দেয়ালের পাশে দশ-বারটা করে গাদা সাজাতে লাগল মৃতদেহের, কিন্তু তবুও যেন শেষ হয় না। আরও বেশি বেশি করে মৃতদেহ আসতে লাগল নদীর মধ্যে থেকে।

দাওয়াইখানায় এসে ঢুকলেন ওয়েজেলস্; ঘাঁটির ডাক্তার ক্ল্যাঙ্কি ভাঙা হাড়মাংস জোড়া লাগাতে চেষ্টা করছেন সেখানে। বেঁটে টাকমাথা ডাক্তার পাজামাটা চড়িয়েছেন অন্তর্বাসের উপর, চটি পায়েই কাজ করছেন তিনি, হাত আর জামাকাপড় রক্তমাখা, হাতের কাছেই এক বোতল হুইস্কি। যন্ত্রণায় কুঞ্চিত মুখে পড়ে আছে ইণ্ডিয়ানরা, পুরুষেরা বেশির ভাগই নিস্তব্ধ, বেদনায় আর এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের কথা মনে করে চিৎকার করছে শিশুরা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর্তনাদ করছে মেয়েরা।

—'মাতাল হয়ে লাভ হবে না কোন।' ওয়েজেলস্ বললেন।

—'মাতাল হয়ে?' তাঁর দিকে তাকালেন ডাক্তার, তারপর উপেক্ষা করলেন তিনি।

—'বলেছি তো, কোন লাভ হবে না মাতাল হয়ে।'

—'তোমার নিকুচি করি, ওয়েজেলস্।' ডাক্তার বলে উঠলেন।

—'মুখ সামলে কথা বল।'

অশ্লীল চোখা চোখা গালাগালের স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল ডাক্তারের মুখ থেকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন ওয়েজেলস্; তারপর চলে এলেন ওখান থেকে।

গাড়িটা ফিরে আসতে দেখলেন ওয়েজেলস্। ইণ্ডিয়ানদের পথের রেখা ধরে ধরে মৃতদেহগুলো তুলে আনতে নদীর মধ্যে পাঠানো হয়েছিল গাড়িখানা। হেঁটে এগিয়ে গেলেন তিনি, দেখতে লাগলেন, টেনে টেনে মাটিতে নামাতে লাগল ঠাণ্ডায় জমা মৃতদেহগুলো।

অফিসারদের মেস-ঘরে ঢুকে ওয়েজেলস্ দেখতে পেলেন লেফটেন্যান্ট অ্যালেনকে, হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে টেবিলের ধারে। কাঁদছিল সে।

—'এ কিন্তু ভাল নয়!' ওয়েজেলস্ বলে উঠলেন।

একটুও নড়ল না অ্যালেন।

—'দোহাই খিস্তর, মরদের মত হও।' চেঁচিয়ে উঠলেন ওয়েজেলস্, 'দোহাই খিস্তর! অফিসার তুমি, ইস্কুলের ছেলে নও! ওঠ, উঠে পড়।'

আস্তে আস্তে উঠল অ্যালেন, 'উঠছি স্যর—'

শান্ত গলায় ওয়েজেলস্ বললেন, 'কোয়ার্টারে যাও। ঘুমিয়ে পড় গিয়ে। বিশ্রাম কর রাতটা।'

—'যাচ্ছি স্যর।' ফিস্‌ফিস্ করে অ্যালেন বলল।

—'অনেক ঝরঝরে বোধ হবে সকালবেলায়।'

—'আচ্ছা, স্যর।'

টেবিলের ধারে বসে পড়লেন ওয়েজেলস্, সিগার ধরালেন একটা; বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে রইলেন শূন্যদৃষ্টিতে। ঠাণ্ডার মধ্যে থেকে এসে হাজির হল ক্রম, পা ঠুকতে ঠুকতে, দস্তানা খুলতে খুলতে, তার বিপুল শারীরিক শক্তির একটা কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে, তবু ওয়েজেলসের কাছে মনে হল ক্রম যেন ফুটো চুপসানো থলি একটা।

—'অ্যালেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।' কথাটা বলল ক্রম, আড়চোখে তাকাল ওয়েজেলসের দিকে, অপেক্ষা করল একটু। ওয়েজেলসের দেওয়া সিগারটা নিয়ে বসল গিয়ে টেবিলের ধারে।

—'হায় ভগবান!' বলে উঠল সে।

—'কতজন?' প্রশ্ন করলেন ওয়েজেলস্, প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিলেন হাওয়ায়; তবু বুঝতে পারলেন যে উত্তর পাওয়া যাবে প্রশ্নটার।

—'এখনো পর্যন্ত একষট্টিজন।' সহজকণ্ঠে উত্তর দিল ক্রম। 'আরও মৃতদেহ আনছে নদীর মধ্য থেকে। আর মনে হচ্ছে, আহতদেরও দু-চারজন মারা যাবে।'

—'একষট্টিজন।' ওয়েজেলস্ পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটার।

বোকার মত বসে বসে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল ক্রম।

—'ওরা ফিরে গেল না কিসের জন্যে।' বিড়বিড় করে বললেন ওয়েজেলস্।

সিগার টেনেই চলল ক্রম।

—'একষট্টিজন।' আবার বললেন ওয়েজেলস্, যেন এই সত্যটাকে খোদাই করে রাখতে চান মস্তিষ্কে।

—'ওদের বেশির ভাগই মেয়েছেলে।' জানিয়ে দিল ক্রম।

একটু পরেই বলে উঠলেন ওয়েজেলস্, 'পালিয়ে গেছে যে দলটা—ওদের কাছে বন্দুক আছে। সকালেই যেতে হবে ওদের সন্ধানে, ফিরিয়ে আনতে হবে।'

—'আমিও তাই ভাবছি—অবশ্য যখন খুঁজে পাব তখনও যদি ঠাণ্ডায় মরে জমে না গিয়ে থাকে।'

—'সে যাই হোক না কেন, সকালে যেতেই হবে আমাদের।'

—'আমিও তাই ভাবছি।'

—'তুমি বরং ঘাঁটিতে থাক।' ওয়েজেলস্ বললেন। 'বাক্সটারকে সঙ্গে নেব আমি।'

—'কিছু আসে যায় না তাতে।' কাঁধ ঝাঁকাল ক্রম।

চুপচাপ করে বসে সিগার টানতে লাগল ক্রম, অবশেষে বলল: 'শুতে চললেন ?'

—'পরে যাব—একটা রিপোর্ট লিখতে হবে।'

রিপোর্ট শেষ করে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে গেলেন ওয়েজেলস্, এক পাইট হুইস্কির বেশিটুকুই খেয়ে চেষ্টা করলেন ঘুমুতে। ভাল লাগল না তাতে। জামাকাপড় গায়েই শুয়ে রইলেন বিছানায়, তাঁর চোখের সামনে অন্ধকারে ফুটে উঠল অনেকগুলো ছবি, সংখ্যায় অনেক আর অতিমাত্রায় জীবন্ত। ভাল লাগল না তাতেও। চোখের সামনে থেকে ছবিগুলো সরিয়ে দিয়ে মাকিনোটা গায়ে চড়িয়ে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে এলেন তিনি। বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন ঠাণ্ডায়, ঘাম ঝরতে লাগল গা থেকে।

দেখতে পেলেন, মৃতদেহের আর-একটা বোঝা নিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে এল গাড়িটা। মাথা আর পা ধরে তুলিয়ে তুলিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে সৈন্যরা, তাই দেখতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নিজেই আবিষ্কার করলেন তিনি প্রশ্ন করে বসেছেন কখন যেন: 'কতজন ?

দাওয়াইখানার হলদে রঙের জানলাগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন তিনি। করুণ মৃত্যু-সঙ্গীতের স্মৃতি এর চাইতে বিশ্রী নয় মোটেই। কোন একটা কিছু করার ভয়ানক প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি, তা সে যে কোন ধরনেরই হোক না কেন।

দেখা হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট বাক্সটারের সঙ্গে। সে বলল, 'ঘুম আসছে না, স্যর, চেষ্টা করেছিলাম ঘুমুতে।'

—'ঘুম আসছে না—'

—'হেড-কোয়ার্টার থেকে কোন কিছু এসেছে নাকি ?'

—'এখনো তো আসেনি—বলতে পারছি না। রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিলাম এইমাত্র।'

—'খবরের কাগজগুলোর হাতে পড়বে কি ?'

—'মনে হয় পড়বে।' ওয়েজেলস্ বললেন। 'ওদের হাতে সব পড়ে।'

—'মনে হয়, আমারও নাম আপনাকে উল্লেখ করতে হয়েছে, স্যর ?'

ঘাড় নাড়লেন ওয়েজেলস্; মানুষের মনে যে অগণিত স্তরের ঠাসবুনুনি থাকে, জীবনে এই সর্বপ্রথম তা অনুভব করলেন তিনি। প্রমাণ করতে চাইলেন না তিনি। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বাক্সটারের নাম জড়িত হলে ঘটনার কি কি ফলাফল দেখা দিতে পারে তা আবিষ্কার করতে প্রায় ভয় পেয়ে গেলেন তিনি।

—'উল্লেখ আমাকে করতে হয়েছে।' তিনি বললেন।

ঘাড় নেড়েই চলল বাক্সটার; ভয়-পাওয়া শিশুর মত। ব্যারাক-বাড়িটা লাসকাটা ঘরের মত; তার দিকে যাতে দৃষ্টি না গিয়ে পড়ে, তারই চেষ্টা করতে লাগল সে।

—'আমাদের হতাহত কেমন হয়েছে ?' জিজ্ঞাসা করলেন ওয়েজেলস্। ক্ষতিটা

পূরণ করে নেবার উপায় আবিষ্কার করতে প্রায় উন্মত্তের মত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন তিনি। মৃতের পাল্লা ইতিমধ্যেই এত বেশি ভারি হয়ে উঠেছে যে, তাঁর দিকে মৃতের সংখ্যাধিক্যের পাল্লা বাড়িয়ে তোলার চেয়ে কমিয়ে দেবারই কাজ করবে।

—'একজন।' উত্তর দিল বাক্সটার।

—'একজন?'

—'একজন মাত্র, মরেছে ব্যারাকে, গুলি করেছিল বুকে।'

—'মাত্র একজন।' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন ওয়েজেলস্ অবিশ্বাসভরে।

—'ঘুমুতে পারলাম না আমি।' দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ে গেল বাক্সটারের। 'হায় ভগবান, এত ক্লান্ত যে ঘুমুতে পারছি নে আমি।'

—'আহত নিশ্চয়ই আছে।' জোর দিয়ে বললেন ওয়েজেলস্। শেষ শী-এন-এর মৃতদেহটাও নামিয়ে ফেলল সৈন্যরা। তিনি বললেন, 'আহত নিশ্চয়ই আছে, ওরা লড়াই করেছিল, বন্দুক ছিল ওদের কাছে।'

—'প্রায় জনাপাঁচেক, স্যর। স্মিথ আর এভেরেটের অবস্থা একটু খারাপ। প্রথমত দাওয়াইখানায় যেতেই চায়নি ওরা। রক্তমাখা শরীরেই ছুটেছিল নদীর মধ্যে—' বিস্তারিত বর্ণনা দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে চলল বাক্সটার।

—'হয়েছে, চুপ কর।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ওয়েজেলস্।

—'আমি দুঃখিত, স্যর।'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে—দুঃখিত আমিও।'

—'আমি ভেবেছিলাম—'

—'মনে করো না কিছু।' ওয়েজেলস্ বললেন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার জো নেই বাক্সটারের; ছটফটে, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সে। গায়ে ঠাণ্ডা বসেছে, অনুভব করলেন ওয়েজেলস্। বাক্সটারকে বললেন, 'ওদের পিছনে পিছনে এখনই বেরিয়ে পড়তে পারি আমরা।'

—'আমি ভেবেছিলাম, সকালের দিকে—'

—'এখনই বেরিয়ে পড়তে পারি।' ওয়েজেলস্ বলে উঠলেন।

খুব ভোরেই পথের রেখা ধরে নদীর মধ্যে দিয়ে পার হয়ে গেল ওয়েজেলসের কোম্পানি আর বাক্সটারের রংরুট-বাহিনী। একজন স্যু-স্কাউট আর রাওল্যাণ্ডকে নিয়ে আগে আগে ঘোড়ায় চেপে চললেন ওয়েজেলস্, পিছনে পিছনে বাক্সটার। হিমে জর্জর, অসুস্থ, নির্বাক সবাই; একটি কথাও না বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগিয়ে চলল সবাই।

কেল্লা থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এক 'কুকুর-সেনা'র দেখা পেল তারা, প্রায় অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে বরফে। তিন জায়গায় গুলি লেগেছিল তার, একটা গুলি মাথায়; এতদূর যে আসতে পেরেছে তা যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ওকে কবর

দিয়ে সকালের খাবার রান্নার জন্য থামল তারা, তারপর চলতে শুরু করল আবার।

এক জায়গায় তাদের চোখে পড়ল, পথের মূল রেখা থেকে অন্যদিকে চলে গিয়েছে তিন জোড়া রক্তমাখা পায়ের ছাপ ; সেই রেখা ধরে পাইন গাছের ভিতর দিয়ে মাইল তিনেক এগুতেই চাবুকের মত এসে লাগল একটা গুলি, অকর্মণ্য করে দিল সৈন্যদের একজনকে, হাতটা ভেঙে গেল তার। ঘোড়া থেকে নেমে প্রচণ্ড গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বুকে ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে চলল তারা। রাইফেলটাও গর্জন করে চলল একটানা, একইভাবে ; আর তারাও সেখানে ঝাড়া দু ঘণ্টা ধরে গুলি চালিয়ে গেল পাইন ঝোপটা লক্ষ্য করে।

অবশেষে স্তব্ধ হয়ে গেল রাইফেলটা ; সামনে গেল তারা বুকে ভর দিয়ে, আরও একটু কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগল সেখানে।

—'মনে হচ্ছে, গুলি নেই আর।' উঠে দাঁড়িয়ে ওয়েজেলস্ বললেন। সবাই এসে দাঁড়াল তাঁর পিছনে। মরে গেছে ইণ্ডিয়ানটি, প্রায় দশ-বারটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দেহটা। রাইফেলের উপরেই পড়ে আছে সে, তার পিছনে দুটো মেয়েছেলে, জমে শক্ত কাঠ হয়ে গেছে তারা। মেয়ে দুটো মরছে, এটা স্পষ্টত বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে থাকবার জন্যই মূল পথ থেকে অন্যদিকে এসেছিল ইণ্ডিয়ানটি।

তার গায়ের ক্ষতগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল একজন সার্জেণ্ট। ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, 'বাপ রে, কি কঠিন মৃত্যু ওদের।'

সেদিন রাতে তাঁবু ফেলল তারা, শুরু হল বরফ পড়া—হালকা, পালকের মত বরফ, বেশি নয়, কিন্তু শী-এনদের পথের রেখা মুছে যাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। সকালে সবাই ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, নদীর দুই ধারে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াগুলো, চেষ্টা করতে লাগল পথের রেখা খুঁজে বার করতে। কোন লাভই হল না সেদিন, পরদিনও তাই। তারপর শুরু হল বরফ গলা, উত্তর-পশ্চিমে শীতের মাঝামাঝি হঠাৎ শুরু হয় যে বরফ গলা। বরফ গলে দেখা দিল কাদাজল, নরম হয়ে গেল মাটি, মাটিতে ইঞ্চি কয়েক পুঁতে যেতে লাগল ঘোড়ার খুর। প্রথম গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপের সবটুকু আমেজ মাখানো সূর্য দেখা দিল আকাশে। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে তারা এসে পড়ল দিগন্তছোঁয়া তৃণ-প্রান্তরে, আর ওয়েজেলস্‌ও চললেন উইওমিঙ সীমান্তের দিকে।

সভ্যতার চিহ্ন চোখে পড়ল এক নিঃসঙ্গ রাঞ্চ-বাড়িতে। গরুবাছুরের খোঁয়াড়-ঘেরা বাড়িটা, নীলচে ধোঁয়ার রেখা উঠছে আকাশের দিকে। সভ্যতার যথেষ্ট চিহ্ন ; তাই দেখেই প্রায় এক আধ্যাত্মিক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল নীল উর্দিপরা সৈন্যরা। হাতে তাদের রক্তের দাগ ; তারা যেন দুর্বিনীত শিশুর দল, ফিরে চলছে ঘরে।

ঘর পর্যন্ত আগে আগে গিয়ে রাঞ্চ-মালিককে চিৎকার করে ডাকলেন ওয়েজেলস্।

হাসিমুখে একটা নোংরা গামছায় হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল লোকটা, তার পা ধরে টানাটানি করছে একটা শিশু।

—'কিগো, ভাল তো সিপাইরা।' মাথা নোয়াল লোকটা।

তার স্ত্রী বেরিয়ে এল হাতে একটা বালতি নিয়ে; মহিলাটি স্বাস্থ্যবতী, নীল দুটো চোখ, কুয়ো থেকে জল তুলতে লাগল।

—'বেড়ে দিনটা।' দাঁত বার করে হাসল রাঞ্চ-মালিক।

—'গ্রীষ্মকালের মত।' সায় দিলেন ওয়েজেলস্। বেশি কিছু বলতে ভরসা হল না।

—'এ বছরের মধ্যে এই প্রথম ভাল দিনটা। রবিনসন থেকে আসছেন, সিপাইজি?'

বোবার মত ঘাড় নাড়লেন ওয়েজেলস্।

—'পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া কেমন?'

—'ঠাণ্ডা।' ওয়েজেলস্ উত্তর দিলেন।

—'ঠিক, ঠিক, কিছু আগেও ঠাণ্ডা ছিল এখানে।'

—'কাছাকাছি ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পেয়েছ কি?' সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন ওয়েজেলস্। আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না তিনি; তাঁর মনে হল রাঞ্চ-মালিক, তার ছেলেপুলে, তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাগল হয়ে যাবেন তিনি।

—'আমার রাখাল-ছোঁড়াটা দেখতে পেয়েছিল কি একটা, দক্ষিণ থেকে আসছিল। সে যা বলছিল তাতে তো মনে হয়—'

—'ইণ্ডিয়ান?'

—'হয়ত তাই। দেখতে যে খুবসুরত তা বলেনি সে। আর মশাই, নেশাটেশাও সে করেনি। সে বলছিল—'

—'যেতে দাও ওসব,' কর্কশকণ্ঠে বাধা দিলেন ওয়েজেলস্। 'কতজন হবে?'

—'দাঁড়ান না মশায়, অমন করছেন কেন?' টেনে টেনে বলে চলল রাঞ্চ-মালিক। 'আমি তো বলিনি যে আমি দেখেছি। সেই ছোঁড়াটা—'

—'কতজন হবে ওরা?' খেঁকিয়ে উঠলেন ওয়েজেলস্।

—'বেশ, তাই হোক, সিপাইজি, আপনার কথাই থাক। প্রায় জনকুড়ি হবে, তার অনুমানে। হয়ত বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে।'

—'পায়ে হেঁটে?'

—'ঠিক বলেছেন, মশাই, পায়ে হেঁটে।'

নরম তৃণ-প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ঘোড়াগুলোকে ঠেলতে ঠেলতে তারা এগিয়ে চলল দক্ষিণমুখো। ধ্বংসের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে ধ্বংসই করতে হয় যাদের এমন ধরনের মানুষের স্থির কঠিন মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলল তারা। উইওমিঙ সীমান্ত অতিক্রম

দাঁড়াতেই বিস্মিত হয়ে গেলেন ওয়েজেলস্। দীর্ঘ, অস্থিসার, অর্ধনগ্ন প্রেতমূর্তিটা দুলতে লাগল ওয়েজেলসের দিকে তাকিয়ে, ঘৃণা নেই তার দৃষ্টিতে, দুঃখও নেই তাতে, শুধু বেদনাহত বিস্ময় তার চোখে। এ যেন প্রেতের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

রাওল্যাণ্ডকে তাঁর কি বলবার বলা হল না তা, 'কুকুর-সেনা'টার দীর্ঘনিশ্বাস মাখানো কথাগুলো তর্জমা করবার জন্য জিজ্ঞাসাও করলেন না তিনি। শুধু রাওল্যাণ্ড যখন তাঁর কাছে পৌছল তিনি ইতস্তত করলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আর এই সময়েই কাদা-ডোবার ভিতর থেকে ছুটে এল গুলি, ছটকে উঠল পায়ের কাছের কাদা।

পিছনে ছুটতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি, কিন্তু অপেক্ষমান সৈন্যরা এই গুলিকেই ধরে নিল আক্রমণের সঙ্কেত। ভিতর থেকে গুলি আসতে লাগল শব্দ করে, তা যেন তাঁর খেয়াল হল বলে মনে হল না; তিনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন ওদের জন্যে। ওদের সঙ্গে যাবার জন্যে যখন পাশ ফিরলেন, তখন বোধ হল, উষ্ণ, তীব্র একটা আঘাত লাগল তাঁর মাথায়। তারপরেই মুখ গুঁজে পড়ে গেলেন কাদায়, চেষ্টা করতে লাগলেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে।

পা দুটো ছড়িয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইলেন তিনি, তাঁর মাথার ক্ষতের পরিচর্যা করতে লাগল সবাই। ওদের আক্রমণ হটিয়ে দিল ইণ্ডিয়ানরা। তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল বাক্সটার। আঘাতটা গুরুতর কিনা, সেই কথাই জিজ্ঞাসা করল লেফটেন্যাণ্ট।

—'না, না। যিশুর দোহাই, লেফটেন্যাণ্ট, ফিরে যাও তোমার লোকজনের কাছে।'

—'আবার এগিয়ে যাব আমরা?'

—'দাঁড়াল কি ব্যাপারটা?'

—'আমরা হারিয়েছি দুজনকে—আহত হয়েছে সাতজন।'

—'গুলি চালিয়েই যাও।' ওয়েজেলস্ বললেন। 'নিচু করে গুলি চালাতে বল। মাটি নরম আছে।'

গুলি চলল সারাদিন ধরে অবিরল, অবিশ্রান্ত, কাদা-ডোবার চারপাশ একটা চক্র হয়ে উঠল ছিটকে-ওঠা কাদার। অপরাহ্ণ যখন দীর্ঘায়িত হয়ে এল, তখন ক্রমশই এগিয়ে যেতে লাগল সৈন্যরা গুঁড়ি মেরে মেরে। গুলি চালিয়েই গেল সর্বক্ষণ। কাদা-ডোবা থেকে একটু একটু করে কমে আসতে লাগল গুলির প্রত্যুত্তর, অবশেষে তাও থেমে গেল একেবারে।

সূর্য হেলে পড়ল পশ্চিমে, তবুও গুলি চালিয়ে গেল সৈন্যরা। তারপর সর্বশেষে বেজে উঠল বিউগিল। বন্ধ হল গুলি ছোঁড়া।

আর তারপর, অকস্মাৎ এক অবিশ্বাস্য, অপার্থিব নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে গেল তৃণ-প্রান্তর। অনেক উঁচু থেকে ডানায় ভর দিয়ে নামতে লাগল একটা বাজপাখি, নিচু হয়ে উড়ে গেল কাদা-ডোবার উপর দিয়ে, তারপর পাক খেয়ে উঠে গেল আকাশে।

কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। সূর্য নেমে এল দিকচক্রবালের কোল ঘেঁষে, হালকা পশমের মত একটা মেঘের টুকরো সূর্যের বুকে।

তারপর উঠে দাঁড়াল বাক্সটার। একে একে উঠতে লাগল সবাই, কোন সঙ্কেত না পাওয়া সত্ত্বেও অবশেষে একশো পঞ্চাশজনই এগিয়ে চলল কাদা-ডোবাটার দিকে মেপে মেপে পা ফেলে, উন্মুখ হয়ে, শক্ত মুঠোয় বন্দুক ধরে।

ঘেঁষাঘেঁষি করে চক্রাকারে সবাই দাঁড়াল একটা ধারে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল সেখানে, তারপর ঠেলাঠেলি করে ফিরে আসতে গিয়ে অকস্মাৎ আলগা হয়ে গেল চক্রটা।

দুপাশে দু'জন সৈন্যের গায়ে ভর দিয়ে এসে পৌছুলেন ওয়েজেলস্। তাঁকে পথ করে দেবার জন্য লোক সরে গেল চক্র থেকে। কাদা-ডোবার একটা ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, দেখতে লাগলেন বাইশটি পুরুষ আর নারার মৃতদেহ। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই একসময় ডুবে গেল সূর্য, উঠে এল একটা হিমশীতল ঝড়, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তৃণ-প্রান্তরের বুকে নেমে এল কোমলপ্রশান্ত রাত্রি।

জানুয়ারি, ১৮৭৯—এপ্রিল, ১৮৭৯

পথের শেষে

'নিউইয়র্ক হেরাল্ডে'র ১৮৭৯ সালের ১৮ই জানুয়ারি সংস্করণে স্বরাষ্ট্র বিভাগের মনোভাব পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করা হল সংক্ষিপ্তাকারে। সত্যি বলতে কি, একটিমাত্র বাক্যে জাতিকে জানিয়ে দেওয়া হল :

'এ ব্যাপারে সেক্রেটারি শূর্জ কোন কথা বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন।'

এত সহজে, এত সহজতম উপায়ে, এত সাদাসিধেভাবে ফিতে বাঁধা পড়ে রইল ঘটনাটা ধুলোয় ঢাকা ইতিহাসের নথিপত্রে ; এ ব্যাপারে কোন-কিছু বলতে অস্বীকার করলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি কার্ল শূর্জ—সেই কার্ল শূর্জ, যিনি জন্মেছেন জার্মানিতে, লড়াই করেছিলেন ১৮৪৮-এর বিপ্লবে—হাজার হাজার জার্মান যেমন আগে ও পরে পালিয়ে এসেছিল তেমনি পালিয়ে এসেছিলেন যিনি ; ভোরের আকাশে উজ্জ্বল মহিমান্বিত অক্ষরে যিনি ঝলমল করতে দেখেছিলেন 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে, আমেরিকা যখন ছিল প্রতিশ্রুতি আর আশার তরুণ দৈত্য, তখন যিনি এসেছিলেন আমেরিকায়, কথা বলেছিলেন তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে তাদেরই ভাষায় মুক্তির সংবাদ দিয়ে ; যিনি জানতেন আভিজাত্যহীন অ্যাবিকে, যিনি লড়াই করেছিলেন প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের পক্ষে, চিনতেন তাঁকে, বলতেন তিনি তাঁর বন্ধু ; যিনি ত্যাগ করেছিলেন স্পেনের রাষ্ট্রদুতের পদ, যাতে ফিরতে পারেন, লড়াই করতে পারেন ইউনিয়নকে বাঁচাবার জন্য, যিনি দেখেছিলেন গেটিসবার্গে রক্তের স্রোত বয়ে যেতে। সেই একই কার্ল শূর্জ তিনি ; তাঁকে যখন জানানো হল যে, তাঁর অফিসের পাশের ঘরটি বোঝাই হয়ে গেছে সাংবাদিকে, তখন বললেন, 'ফিরিয়ে দাও ওদের—'

বিবৃতি চাওয়া হল তাঁর কাছে :

—'কিছুই বিবৃতি দেবার নেই আমার।'

কিন্তু রবিনসন কেল্লার সংবাদ ?

—'কিছুই বলবার নেই আমার।'

তবু সরকারের মনোভাব ?

—'ফিরিয়ে দাও ওদের। কোন বিবৃতি দেবার নেই আমার।'

ক্যাপ্টেন ওয়েজেলসের পাঠানো রিপোর্টের নিজস্ব কপিটা বারবার পড়েছেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি ; পড়তে পড়তে এক সময় অর্থহীন হয়ে উঠেছে শব্দগুলো, হয়ে

উঠেছে নৃত্যপর অক্ষরের লাইন। পড়তে পড়তে একসময় ঠাহর করে উঠতে পারেননি অভ্যুত্থানের, বিপ্লবের, অবাধ্যতার অর্থ।

বসে রইলেন তিনি ডেস্কের পিছনে, এদিকে দুপুর গড়িয়ে গেল, সন্ধ্যা নেমে এল একসময়। অফিসের লম্বা জানলার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলেন পাতাবহীন গাছের ডালগুলো মিলিয়ে আসছে রাত্রির শীতল আলস্যে। আবার ঘরে ঢুকল তাঁর কেরানী, বলল, 'আর একজন সাংবাদিক বসে আছেন, স্যর।'

—'তোমাকে বলেছি না ফিরিয়ে দিতে সবাইকে?'

—'মি. জ্যাকসনকেও?'

—'দেখা হবে না তাঁর সঙ্গে।' কার্ল শূর্জ বললেন।

—'তিনি যাবেন না, বললেন অপেক্ষা করবেন। এইটে দিতে বললেন আপনাকে —বললেন, জেনারেল শেরম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছিল, এটা তারই প্রতিলিপি।'

ঘাড় নাড়লেন শূর্জ। 'বলে দাও, বসে থাকা বোকামি হবে ওঁর পক্ষে। বলবার মত কিছুই নেই আমার।'

—'তাই বলব ওঁকে।'

প্রতিলিপিটা পড়ে রইল সেক্রেটারির সামনে, অলস চোখে কিছুক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর চশমার কাচটা মুছে নিয়ে লাগিয়ে দিলেন নাকে। পড়তে শুরু করলেন। তারিখ রয়েছে, ওয়াশিংটন—১৬ই জানুয়ারি:

"আজ রাতে জেনারেল শেরম্যান বলেন যে, শী-এনদের মধ্যেকার সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যাহা 'হেরাল্ডে' প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে সমর-দপ্তর আর কোন সংবাদ রাখেন না। এইমাত্র রাত্রির আহার সমাপ্ত করিয়া হেনরি স্মৃতিবার্ষিকী কুচকাওয়াজে কংগ্রেসভবনে যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন।

"—'তাহলে জেনারেল, আপনি শী-এনদের হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত কাহিনীই পড়েছেন?' প্রশ্ন করেন আপনাদের সংবাদদাতা।

"—'হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড!' কয়েকবার কথাটা আবৃত্তি করেন শেরম্যান। 'একে কেন হত্যাকাণ্ড বলছেন আপনারা? একদল অবাধ্য, চতুর, বিশ্বাসঘাতক ইণ্ডিয়ান, কোন দয়ামায়া নেই আমাদের অফিসার আর সৈন্যদের জীবন সম্পর্কে, যেন কুকুরের সামিল তারা; ওরা চেষ্টা করছিল আমাদের সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে পালিয়ে যেতে, বলপ্রয়োগ করেছিল বিদ্রোহাত্মক কাজ হাসিল করতে। উচিত যা সেই ব্যবহারই করা হয়েছে ওদের সঙ্গে। এ ধরনের অপরাধ কোমল শব্দবিন্যাসে এড়িয়ে যাওয়াটা বোকামি মাত্র।'

"—'কিন্তু জেনারেল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন গুরুতর হয়ে উঠেছিল না কি, যার ফলে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছিল শী-এনরা?'

"—'এ প্রশ্নের উত্তর সোজা। নির্দেশ ছিল রবিনসন কেল্লা থেকে শী-এনদের

ইণ্ডিয়ান এলাকায় পাঠানোর। ওরা বাধা দিয়েছে তাতে, বিদ্রোহ করেছে, পালিয়ে গেছে অবশেষে। নির্দেশ যাতে প্রতিপালিত হয় তা দেখার ভার ছিল জেনারেল ক্রুকের উপর ; এই কর্তব্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কাঁধে। সামরিক বিভাগে অবাধ্যতা সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলার পক্ষে মারাত্মক। আমাদের নিজেদের জাতির মধ্যে কোন ক্ষেত্রেই যা করতে দিতে পারা যায় না, তা কি একদল ইণ্ডিয়ানকে করতে দেব আমরা? না, না, বাধা দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিল বদমাশগুলো, ফলাফল তার যাই হোক না কেন ; আর ইণ্ডিয়ানরা সংখ্যায় যতই হোক, ওদের হুমকিতে যেহেতু এই সরকার মাথা নত করতে রাজি নয়, সেই হেতু পরিস্থিতির জরুরী অবস্থায় যা প্রয়োজন, মোটামুটি সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়েছে।'

"—'তাহলে আপনি সন্দেহ করেন না যে ইণ্ডিয়ান এজেন্টের দিক থেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অসাধু পন্থা গ্রহণের মত কিছু একটা ঘটেছিল, যার ফলে উত্তেজনায় এ ধরনের কাজ করে ফেলেছে ওরা?'

"—'কিছুই হয়নি ও ধরনের। রবিনসন কেল্লা থেকে ইণ্ডিয়ান এলাকায় যাবার কথা ছিল ইণ্ডিয়ানদের ; নিয়ে যাবার ব্যাপারে ইণ্ডিয়ানরা ছিল ফৌজের তাঁবে। যাবার ইচ্ছা ছিল না ওদের, আর ওরা যাতে বিপজ্জনক না হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন ভাবা গিয়েছিল, তেমনভাবেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। সতর্কতা পুরোপুরি অবলম্বন করা হয়নি, তারই ফলে সামরিক নির্দেশ বজায় রাখতে গিয়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল ওদের সঙ্গে আমাদের সৈন্যদের।'"

সংক্ষিপ্তভাবেই শেষ হয়ে গেল সেটা। শূর্জ যেন দেখতে পেলেন শেরম্যানকে—কোটটা পরতে পরতে তৈরি হচ্ছেন তিনি ঘরের বাইরে যাবার জন্যে, সমস্ত দ্বন্দ্ব আর সন্দেহ ধুয়ে মুছে গেছে তাঁর মন থেকে। ধীরে ধীরে ঈর্ষার পরিবর্তে দেখা দিল বিস্ময়, তারপর ভয়। সেইখানে বসে তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপির অক্ষরগুলোর দিকে।

তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে তিনি ডাকলেন কেরানীকে। 'সেই সাংবাদিক, মি. জ্যাকসন, আছেন তিনি বাইরে?' জিজ্ঞাসা করলেন শূর্জ।

—'নড়ছেন না তিনি।'

—'তাহলে পাঠিয়ে দাও তাঁকে।'

জিজ্ঞাসু মুখে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন জ্যাকসন। লম্বাটে কুশ্রী মুখখানা ভাবলেশহীন, আওয়াজ উঠল তাঁর ঢিলেঢালা কাপড়-চোপড়ের। ব্যাপারটা অনুমান করে যতক্ষণ না তাঁকে বসতে বললেন সেক্রেটারি, দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

—'সিগার খান একটা।' সিগারের একটা বাক্স বার করে শূর্জ বললেন।

সিগার নিলেন জ্যাকসন, গোড়াটা দাঁতে কেটে সামনের দিকে ঝুঁকলেন শূর্জের হাতে-ধরা দেশলাইয়ের জন্য। একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, 'খাসা—সরকারি খরচায়?'

—'নিজের খরচায়।' হাসলেন শূর্জ।

—'ধন্যবাদ;' তখনো অপেক্ষা করতে লাগলেন জ্যাকসন।

—'বাইরে গিয়েছিলেন আপনি?' শূর্জ জিজ্ঞাসা করলেন। 'বেড়ানো আপনার সখ?'

—'দু-চোখের বিষ!'

—'তাই নাকি? যাই হোক, কেউ থাকবে ঘরে বসে, কেউ বেড়াবে বাইরে বাইরে। ভাল একটা সিগার টানা রেলগাড়িতে হাজার মাইল ঘোরার সমান, তাই না?'

—'তাই তো মনে হয়।' সায় দিলেন জ্যাকসন।

—'ও এলাকায় গিয়েছিলেন?' শূর্জ জিজ্ঞাসা করলেন।

—'গিয়েছিলাম—'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শূর্জ, 'সামান্য জিনিস নিয়ে খুব হৈ-চৈ করায় লাভ হবে না কিছুই। একটা ব্যাপার যখন শেষ হয়, তখন চুকেবুকে যায় সবই, তারপর ভুলতে হয় সেটা, তাই না?'

—'হয়ত তাই।' সায় দিলেন জ্যাকসন।

শূর্জ বললেন, 'এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে—'

—'ওরা আমাকে বলেছে, কিছুই বলবার নেই স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির।'

—'এ কিন্তু ছাপবেন না আপনি।' শূর্জ বললেন।

—'আমার মতে, ছাপাতেই হবে এটা।'

—'না, তা করবেন না।' জোর দিয়ে বললেন শূর্জ।

—'উইলিয়াম শেরম্যান সম্পর্কে যাই ভাবি না কেন,' আস্তে আস্তে জ্যাকসন বললেন, 'আমি জানি লোকটা খাঁটি। তিনি যা বিশ্বাস করেন তা ন্যায় হোক কি অন্যায় হোক, মানুষটা তিনি খাঁটি।'

তার দিকে তাকিয়ে রইলেন শূর্জ, ছোট ছোট চোখ দুটো কোঁচকানো ভাবলেশহীন, দাড়ির আড়ালে মুখোশ-আঁটা মুখখানা।

—'রবিনসন কেল্লায় যা ঘটেছে, সবাই তা ভুলে যাবে।' জ্যাকসন বললেন, 'হয়ত ছ'মাসের মধ্যেই, হয়ত ছ'সপ্তাহে। কিন্তু জনসাধারণ কি কখনো ভুলবে যে কার্ল শূর্জ বলেছিলেন, নীতি হিসাবে যা অন্যায়, কার্যক্ষেত্রে তা ন্যায় হতে পারে না।'

—'কি চান আপনি?' ফিস্‌ফিস্ করে বললেন শূর্জ।

—'এ ধরনের খোঁচা দেওয়ার জন্যে আমাকে অফিস থেকে বার করে দেওয়া উচিত আপনার।' রঙ্গের সুর জ্যাকসনের কথায়, প্রায় অপমানজনক।

—'কি চান আপনি?'

—'স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির মুখ থেকে একটা বিবৃতি আশা করেছিলাম আমি। এতে উন্নতি হতে পারত আমার।'

—'কিছুই বলবার নেই আমার।' বোকার মত বললেন শূর্জ।

যাবার জন্য উঠলেন জ্যাকসন। একটু দাঁড়ালেন দরজার কাছে গিয়ে। তারপর আড়চোখে তাকালেন সেক্রেটারির দিকে। 'মি. শূর্জ,' জ্যাকসন বললেন শান্তগলায়, 'ব্যাপারটা নিহত ইণ্ডিয়ানরা নয়—এসব আগেও দেখেছি আমরা। কিন্তু রবিনসন কেল্লার ওই যে কামানগুলো, ওগুলো শুধু ইণ্ডিয়ানদের দিকেই তাক করা নয়, তাক করা আপনার দিকে, তাক করা আমার দিকে।' তারপর বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কার্ল শূর্জ যখন কাগজ আর কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলেন, তখন সম্ভবত ঘণ্টাখানেক পার হয়েছে। ইণ্ডিয়ানদের একশো পঞ্চাশজন, দলের প্রায় অর্ধেক বেঁচে আছে এখনো, আছে উত্তরের কোন-এক জায়গায়। জেনারেল ক্রুককে শূর্জ লিখলেন যে ঢঙে, সেটা তাঁর পরাজয়। এ যেন ক্লান্ত করে দিয়ে গেল তাঁকে, বুড়িয়ে দিয়ে গেল, নুইয়ে দিয়ে গেল মাথা। তবু তিনি জানেন যে কম-বেশি অজ্ঞাত এক সামরিক নেতার কাছে পাঠানো, মনে রাখার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর তাঁর এই অজ্ঞাত নির্দেশ কিন্তু অকিঞ্চিৎকর নয় আমেরিকার প্রতি তাঁর কর্তব্যের দিক থেকে, অকিঞ্চিৎকর নয় মানুষ শূর্জের দিক থেকেও। কেরানীর হাতে সেটা দিয়ে তিনি বললেন, 'আজ রাতেই পাঠিয়ে দাও। এখন আমি বাড়ি চললাম।'

ধীরে ধীরে তিনি মিলিয়ে গেলেন রাত্রির অন্ধকারে। তিনি জানেন যে দফা শেষ হয়ে গেল সংবাদপত্রের শিরোনামার, ছ'সপ্তাহে, কি ছ'মাস পরে কেউ মনে রাখবে না একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছিল নেবরাস্কার রবিনসন কেল্লায়। শী-এন নামে একশো পঞ্চাশটি আদিম বর্বর সহজে ঘুমুতে পারবে এমন মাটিতে, বহুকাল ধরে যা ছিল তাদেরই নিজস্ব—এতেও আসবে যাবে না বেশি কিছুই।

মারের পক্ষে কিন্তু শেষ হল না পথের রেখার, জানুয়ারিতে যখন তিনি শুনলেন রবিনসন কেল্লার ঘটনা, তখনো না; তিন নম্বর অশ্বারোহীদল থেকে মনটানার কেওগ দুর্গে বদলি হয়ে এসে একজন লেফটেন্যান্ট যখন কাদা-ডোবার লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শীর বিস্তারিত বর্ণনা দিল ফেব্রুয়ারি মাসে, তখনো না। বর্ণনা হল অফিসারদের খাবার-ঘরে, মন দিয়ে শুনল সবাই, ওয়েজেলস্ যেভাবে নরম মাটির সুযোগ নিয়েছিলেন, তারিফ করল সবাই তার। বর্ণনা শেষ করে মারের দিকে ফিরল লেফটেন্যান্ট, বলল, 'আপনারও তো একটু গুঁতোগুঁতি হয়েছিল ওদের সঙ্গে। কড়া খদ্দের ওরা, তাই না?'

—'হ্যাঁ।'

মারের ভাবলেশহীন মুখে ফুটে উঠল শুধু নিস্পৃহ ভাব। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট, তারপর বলে চলল তার গল্প।

প্রায় নয় সপ্তাহ কেওগ কেল্লায় আছেন মারে। 'ক্ষুদে নেকড়ে'র দলটাকে দীর্ঘ পথ ব্যর্থ অনুসরণ করে এসে পড়েছিলেন ব্ল্যাকহিলসে। সেখানে এসে মিলিয়ে গেল পথের রেখা। সবুজ পর্বতশ্রেণীর বিশালতায় অসংখ্য উপত্যকা আর গভীর অরণ্যের কোন

এক জায়গায় রয়েছে ইণ্ডিয়ানরা। শীতের বরফ পড়ার আগে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় অসম্ভব ছিল ওদের খুঁজে বার করা। তারপর চার নম্বর অশ্বারোহী দলের দুটো কোম্পানির দক্ষিণে ফিরে যাবার হুকুম এল ইণ্ডিয়ান এলাকার কর্নেল মিজনারের কাছ থেকে। জেনারেল মাইলসের অধীনে বদলির জন্য ডেড-উড থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন মারে। মঞ্জুর হলে দল ছেড়ে একাই এসে পড়লেন মনটানার কেওগ কেল্লায়।

উইণ্টের কাছ থেকে তাঁর বিদায়-পর্বটা অদ্ভুত। খুব কম কথাই বলেছিলেন তিনি, মনে হয়েছিল যেন ওদের কাছ থেকে সরে যাবার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। অস্বস্তিভরে, থতমত খেয়ে উইণ্ট বলেছিলেন মামুলি কথাই।

—'ঠিক আছে,' হেসে বলেছিলেন মারে। 'আমি যা খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই হয়ত পেয়ে যাব ওখানে।'

তারপর একঘেয়ে দীর্ঘ নয়টি সপ্তাহ কাটালেন তিনি বরফঘেরা কেওগ কেল্লায়। গ্যারিসন অফিসারদের সঙ্গে বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না তাঁর। তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, একা থাকতে চান তিনি, তাঁর একমাত্র আগ্রহ ছিল শী-এনদের সংবাদ পাবার; পাহাড় ভেদ করে এসে পড়েছিল অস্পষ্ট জনরব, এক পশম-শিকারী শুনতে পেয়েছিল এক কথা, এক স্কাউট শুনতে পেয়েছিল আর-এক কথা, এক ফেলে-যাওয়া ঘাঁটির চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল একজন শিকারী; তারপর শেষে যখন খবর এল, খুঁজে বার করলেও উত্তরেই থাকতে পারবে শী-এনরা, তখন কমে গেল সেই আগ্রহটুকুও।

কেল্লায় বসে শী-এনদের সত্যিকারের খবর পাওয়া গেল সেই এপ্রিল মাসে। দুদল সৈন্য নিয়ে পাউডার নদীর দিকে টহল দিতে বেরিয়েছিলেন লেফটেন্যাণ্ট ডব্লিউ. পি. ক্লার্ক, তিনি একরকমের যোগাযোগ করে ফেললেন ওদের সঙ্গে। ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে 'ক্ষুদে-নেকড়ে'।

ওদের পিছনে পিছনে মারে যেভাবে ছুটেছিলেন তা স্মরণ করে জেনারেল মাইলস্ বললেন, 'এত শান্ত হয়ে গেল ওরা এভাবে, ব্যাপারটা অদ্ভুত ক্যাপ্টেন। তোমাকে এমনভাবে ছুটিয়ে মারার পর ব্যাপারটা যেন প্রায় হঠাৎ-ঝিমুনো গোছের হয়ে পড়ল।'

—'আমি জানি না।' মারে বললেন। 'ওরা দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিল, মনে হয়, এ ছাড়া আর-কিছুই ওরা চায়নি।'

—'অবশ্য,' যোগ করে দিলেন জেনারেল, 'মুক্তি আর স্বাধীনতা সম্পর্কে আদিম মানুষের ধারণা আমাদের মত নয়।'

—'হয়ত তাই।' সায় দিলেন মারে।

—'ভবিষ্যতে কি করবে তা ভেবেছ, ক্যাপ্টেন?'

মারে বললেন, 'না না, পরিষ্কার ভাবিনি কিছুই। ভাবছি আমার 'কমিশন' ছেড়ে দেব, একেবারেই ছেড়ে যাব সৈন্য-বিভাগ।'

—'পুরনো ফৌজি-লোক তুমি। কিছু যদি মনে না কর আমার কথায়—তুমি যে দলছুট হয়ে যাবে তাহলে?'

—'তাই হব সম্ভবত।' বললেন মারে।

—'তোমার জন্যে যদি কিছু করণীয় থাকে আমার, ক্যাপ্টেন, পদোন্নতির কোন সুপারিশের দিক থেকে—'

—'না, স্যর। ধন্যবাদ আপনাকে। অল্প-বিস্তর মনকে ঠিক করে ফেলেছি আমি।'

শী-এনদের দলটা—'ক্ষুদে-নেকড়ে'র পরিচালনায় একশো পঞ্চাশটি নারী, পুরুষ আর শিশু—অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল আগেই—সেই অক্টোবর মাসে, অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ক্যাপ্টেন মারের কাছ থেকে, জেনারেল ক্রুকের কাছ থেকে, গোটা দুনিয়ার কাছ থেকে; তারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল কার্ল শূর্জের কাছ থেকে, কার্ল শূর্জ—যাঁর লেখা অক্ষরগুলোর অর্থই হল তাদের স্বাধীনতা। তারা পালাতে লাগল উত্তরে আরও উত্তরে, অগভীর নদীতে হারিয়ে গেল তাদের পথের রেখা, বরফ পড়তে শুরু করল পথে; তারা আশীর্বাদ জানাল বরফকে, তাদের পিছনের পথের রেখা ঢেকে গেল শাদা বরফের চাদরে। অবশেষে তারা সামনে দেখতে পেল সবুজ পাহাড়ের সারি, চুড়ো-বিহীন কাঁধ তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীরের মত।

মাটির ভিতরে গর্ত করে খেঁকশিয়ালি ঢোকে যেমন করে, তেমনিভাবেই তারা ঢুকতে লাগল ব্ল্যাকহিল পাহাড়ে, গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে তারা খুঁজে বেড়াতে লাগল মনোমত জায়গাটি। অবশেষে খুঁজে পেল তারা—একটা বড়সড়, গাছপালায় ঢাকা উপত্যকা, উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, দুদিক বন্ধ, গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানে পেল আশ্রয়, পেল নিরাপত্তা, ঘোড়া চরবার ঘাস-জমি, মাংসল-ভল্লুক; যা ছিল তাদের নিজস্ব—সেখানেই আশ্রয় খুঁজে ফেরে হরিণের পাল, কানাডার বরফ-ঢাকা অনুর্বর অঞ্চল থেকে উড়ে আসে বুনো হাঁসের ঝাঁক, সেখানে খরগোস, কাঠ-বেড়ালি—সম্পদময়, ফলেফুলে ভরা যে জগৎ কামনা করেছিল তারা, তার সব-কিছুই পেল সেখানে।

জীবনযাত্রা শুরু হল সেখানে। দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস কাটতে লাগল যতই, যতই বরফ পড়ে পড়ে বিরাট স্তূপ গড়ে উঠতে লাগল তাদের 'টিপি'গুলোর চারপাশে, ততই অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল একটু একটু করে সেই একটানা ছোটার লড়াইয়ের স্মৃতি। এক বরফের প্রাচীর আর বরফের পাহাড় আশ্রয় দিয়ে রাখল তাদের। শিশুরা জন্মাল সেখানে, মানুষ হতে লাগল মায়ের বুকের দুধ খেয়ে খেয়ে। আর অন্যান্য শিশুরা বরফ দিয়ে খেলার সময় বরফের মিহি গুঁড়োগুলো ওড়াতে ওড়াতে ভুলেই গেল সেই লাল ধুলোর কথা—সেই লাল ধুলোও ছিল এই রকমই মিহি গুঁড়ো-গুঁড়ো। তারা ভুলে গেল অনাহারের কথা, ম্যালেরিয়ার কথা, ভুলে গেল সেই হামবড়া, অশুভ মানুষগুলোর কথা,—যারা প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিল সভ্যতার।

তবু ভুলতে পারা গেল না আর সবাইকে, কারণ বিয়ে-সাদির মধ্যে দিয়ে মূল দলের সেই তিনশোজনই ছিল একটা গোটা পরিবার। আর এখন, 'ক্ষুদে-নেকড়ে'র দলে ভাই দিন গুনতে লাগল বোনের জন্যে, মা-বাপ সন্তানের জন্যে, আর সন্তানেরা মা-বাপের জন্যে।

দিন গুনে চলল তারা, আর হুঁশিয়ার হয়ে ভাঁড়ারে তামাক মজুত রেখে ভুট্টার ডাঁটার পাইপ টানতে টানতে উদ্‌গ্রীব 'ক্ষুদে নেকড়ে' তাকিয়ে রইল আড়াল করে রাখা বরফের প্রাচীরের দিকে। বসন্ত আসবে, পথ খুলে যাবে পাহাড় আর বহির্জগতের মধ্যেকার, তখন আর একবার এগিয়ে আসবে তাদের ঘেরাও করা বিরাট জালটা। বাতাসে বসন্তের নিশ্বাসের প্রথম স্পর্শ পেতেই 'টিপি'গুলো তুলে নিয়ে এগিয়ে চলার তোড়জোড় করতে নির্দেশ দিল সে। কোথায়? তা সে জানে না। কিন্তু তার মনে জেগে রইল, উত্তরের কোন এক জায়গায় আছে তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই, আছে নিরাপত্তা,—হয়ত সেই আধা-রূপকথার জগতে, কানাডা যার নাম, 'বসা-ষাঁড়' আর তার স্যু-দলবল গিয়েছে যেখানে।

পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তারা এগিয়ে চলল উত্তরে, পাউডার নদীর পশ্চিম ধার দিয়ে। আর সেইখানেই পাউডার নদীর কাছে লেফটেন্যান্ট ক্লার্কের স্যু-স্কাউট 'লাল যুদ্ধের-মুকুটে'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদের। সেইখানেই এক স্যু-এর মুখে অনভ্যস্ত ভাঙা ভাঙা শী-এন ভাষায় 'ক্ষুদে-নেকড়ে' জানতে পারল কার্ল শূর্জের সিদ্ধান্ত।

এখানে যে কাহিনীটি বললাম, যতদূর নিশ্চয় করে বলা যায়, সেটি সত্যি। যদি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তাহলে এর অবিশ্বাস্যতা একমাত্র এ-কথায় দূর করা যেতে পারে যে, ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল। এ কাহিনীর সমস্ত বড় বড় চরিত্রই—একমাত্র ক্যাপ্টেন মারে ছাড়া—বেঁচে ছিলেন, আর এখানে যেমন বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি, তেমন তেমন অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

স্ট্রাথারস বার্টের 'পাউডার রিভার' পড়তে গিয়ে প্রথম আমি এই কাহিনীর হদিশ পাই। সেখানে একটি অনুচ্ছেদে এমন একটি ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, মানুষের সমগ্র ইতিহাসে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যা সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম—আর মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার এক মহাকাব্যও বটে। কাহিনীটি বিস্তারিত বলা কর্তব্য ভেবে আমি তথ্যসংগ্রহে মন দিয়েছিলাম।

এরই মধ্যে ষাট বছরেরও বেশি পুরনো হয়ে উঠেছে যে না-বলা কাহিনী, তা উদ্ধার করতে গিয়ে যা লাভ হওয়া স্বাভাবিক আমারও তাই লাভ হয়েছিল—আমি গিয়ে পড়েছিলাম তৈরি-করা মিথ্যা আর অসংলগ্নতার জটিলতায়। ঘটনাটির নাটকীয়তা এই সময়ে সংবাদপত্রকে ভাল খোরাক যুগিয়েছিল—তাতে বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তুলেছিল শুধু। ১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর 'নিউইয়র্ক হেরাল্ডে'র নিম্নলিখিত সংবাদটুকু তার বিশিষ্ট উদাহরণ :

"টোপেকা, কানসাস, ১৮ই সেপ্টেম্বর

"এই মর্মে জনরব যে ইণ্ডিয়ানরা ক্ষতিসাধন করিতেছে, এই যেমন, কানসাসের পশ্চিম সীমান্তে ডজ-কেল্লার ধারে-কাছের ঘরবাড়িতে আগুন লাগাইতেছে···আজ বৈকালে ডজ শহরের দুই-তিন মাইল পশ্চিমে দুই-তিনটি বাড়িতে আগুন লাগে, আর কয়েকদিন পূর্বে যে কয়েকজন শী-এন তাহাদের এলাকা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল—যাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া ছোট ছোট দলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে—তাহারাই তৃণপ্রান্তরে আগুন লাগাইতেছে, ইহাও অসম্ভব নহে···"

এই সংবাদপত্রেরই কয়েকদিন পরেকার খবর :

"টোপেকা, কানসাস, ২০শে সেপ্টেম্বর

"কানসাসে ইণ্ডিয়ান আতঙ্ক কমিয়া আসিতেছে। রাজ্যে একটিও শত্রুভাবাপন্ন ইণ্ডিয়ান নাই। নিহত বলিয়া যাহাদের নাম প্রচারিত হইয়াছিল সেই ব্যক্তিরাই ব্যাপারটি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে। আতঙ্ক কমিয়া আসিতেছে। ইণ্ডিয়ান এলাকার সীমানার কাছে অথবা সম্ভবত তাহার দক্ষিণে কিছু গরুবাছুর চুরি করা ছাড়া ইণ্ডিয়ানদের ধ্বংসলীলার নিদর্শন কিছুই চোখে পড়ে না।"

ওকলাহামার শী-এন সংরক্ষিত এলাকায় পথের রেখা ধরে শুরু করতে গিয়ে আমি অসুবিধার মুখে পড়েছিলাম, এই অসুবিধাই দেখা দিয়েছিল কাহিনীর বহু চরিত্রের সামনে—অসুবিধা ভাষার ব্যবধানের। উত্তরমুখে পলায়নের কাহিনী মনে আছে যে-সব অতিবৃদ্ধ ইণ্ডিয়ানের, ইংরেজিতে তাঁরা ভালভাবে ভাব প্রকাশ করতে কোনদিনই শেখেননি। এখনো তাঁরা তাঁদের সেই অদ্ভুত সঙ্গীতময় জটিল ভাষাতেই কথা বলেন। যত লোকের সংস্পর্শে এসেছি, তাঁদের কেউই কিন্তু ঝরঝরে তর্জমায় সাহায্য করতে পারেননি। যেমন, যখনই তাঁদের কাছে 'ভোঁতা-ছুরি'র কথা—যে বৃদ্ধ-সর্দার উত্তরে পালাবার সময় দলটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—উল্লেখ করেছি, আমি উল্লেখ করেছি স্থ-দের দেওয়া তার ইংরেজি নামে। শী-এন ভাষায় তার অন্যান্য নাম আছে। শী-এন থেকে ইংরেজিতে কোন কিছু যথাযথ তর্জমা যে অসম্ভব আমার এই ধারণাই হতে লাগল। ভাষাটা এত জটিল যে ইংরেজি ইস্কুলে পড়া তরুণ শী-এনরা বাপ-মায়ের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলতেও অক্ষম।

এ-সব সত্ত্বেও গোষ্ঠীর বৃদ্ধরা আমাকে সাহায্য করতে অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন, আর তাঁদের স্মৃতির বিশাল ভাণ্ডার থেকে আমি অনেক পেয়েছি যা কাজে লেগেছে। নরমানের ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার কাছেও আমি বিশেষ ঋণী, আমাকে সাহায্য করতে তাঁরা কোন কার্পণ্যই করেননি। আর তরুণ শী-এনদের কাছে আমি ঋণী, তাঁরা নিজস্ব থেমে থেমে বলা, পশ্চিমী কথার টানে নতুন করে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা।

জর্জ বার্ড গ্রিনেলের শী-এন ইণ্ডিয়ান সম্পর্কে নৃতত্ত্ব-গবেষণারও প্রচুর সাহায্য আমি নিয়েছি।

একটু একটু করে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। শত শত মাইলের ব্যবধানে যে লড়াই-গুলো হয়েছিল, সাধারণভাবে তাদের বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলে মনে করাটাই ইণ্ডিয়ানদের ছোট দলটার গৌরবের ব্যাপার। এই সময় খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছিল, ইয়েলোস্টোন নদীর ধারে জেনারেল মাইলসের কাছে যে দল আত্মসমর্পণ করেছিল, আর যারা কয়েক মাস আগে ওকলাহামা ছেড়ে এসেছিল—তারা একই দল। সদর-দপ্তর বা ইণ্ডিয়ান বিভাগ কেউই ব্যাপারগুলো প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখায়নি।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই, যে-স্বল্পসংখ্যক লোক শী-এনদের পক্ষ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিছু সীমান্ত পত্রিকার নির্ভীক, উগ্রভাষী সম্পাদক। পশ্চিমী পাঠকদের জন্য লিখলেও, তাঁরা যা বিশ্বাস করতেন তা ছাপবার মত সত্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা তাঁদের ছিল। ওমাহার (নেব্রাস্কা), 'ডেইলি হেরাল্ডে'র নিম্নলিখিত সম্পাদকীয়টি তার একটা ভাল দৃষ্টান্ত। এটি ছাপা হয়েছিল 'নিউইয়র্ক হেরাল্ডে'র কাহিনীর প্রতিবাদ হিসাবে, সেই কাহিনীতে বলা হয়েছিল, এলাকা ছেড়ে উত্তরে যাবার সময় ইণ্ডিয়ানদের যথেষ্ট জামাকাপড় ছিল, তাই তারা যে রবিনসন কেল্লায় অর্ধনগ্ন ছিল, একথা বলা নির্বুদ্ধিতা। বলা হয়েছিল, রবিনসন কেল্লা ভেঙে বেরিয়ে

যাওয়ার কারণ তাদের নিজেদের অপরাধের জন্য শাস্তির আশঙ্কা, আর এই শাস্তির ব্যাপারটা ঘটেছিল জেনারেল শেরম্যান ও ইণ্ডিয়ান বিভাগের কমিশনারের সহযোগে—জেনারেল শেরিডনের পরামর্শে।

১৮৭৯ সালে ১৭ই জানুয়ারি তারিখের ওমাহার সম্পাদকীয়টি এই :

"পূর্বের উল্লিখিত কাহিনী ('নিউইয়র্ক হেরাল্ডে'র কাহিনী) মিথ্যার ঠাসবুনানি। শেরম্যান বা শেরিডন যে বিবৃতি দিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা সত্য বা মিথ্যা ইহা না জানিয়াই আমরা আমাদের জ্ঞান অনুসারে বলিতে চাই যে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেই বিবৃতিটিও মিথ্যা। স্পষ্টতই বুঝা যায়, পূর্বে উল্লিখিত বিবৃতিটি ইণ্ডিয়ান দপ্তরে বসিয়া লেখা। সম্ভবত মি. হেইট নিজেই ইহার রচয়িতা। কমিশনার হেইট অথবা ওয়াশিংটনের অপর কেহ যদি নিম্নলিখিত অভিযোগ খণ্ডন করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা খুশি হইব :

"গত ২০শে অক্টোবর ক্যাপ্টেন জনসনের অধীনস্থ তিন নম্বর অশ্বারোহীর তিনটি কোম্পানির দ্বারা শী-এনরা উত্তর-পশ্চিম নেব্রাস্কার বালি-পাহাড়ের মধ্যে প্রচণ্ড বরফ-ঝড়ের ভিতরে পরিবেষ্টিত হয়। সরকারিভাবে তখন তাহাদের সংখ্যা বলা হয় ১৪৯ জন। তখন তাহারা বলে যে, তাহারা রবিনসনসন-ক্যাম্পে শান্তিপূর্ণভাবে থাকিবে, অথবা 'লাল-মেঘ'-এর দলের সহিত (উত্তরের সংরক্ষিত এলাকায়) বাস করিবে, কিন্তু ইণ্ডিয়ান এলাকার সংরক্ষিত অঞ্চলে ফিরিতে হইলে তাহার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিবে, সেখানে তাহাদের উপবাস করানো হইত। ১৯শে ডিসেম্বর তাহাদের কানসাসে স্থানান্তরিত করিবার নির্দেশ দিবার পূর্ব পর্যন্ত কমিশনার এ ব্যাপারে কিছুই করেন নাই। সেইদিন রবিনসন ক্যাম্পের ঠাণ্ডা ছিল শূন্যেরও ৩০ ডিগ্রি নিচে। ইহা কমিশনার নিশ্চয়ই জানিতেন। দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে চালু সংবাদগুলির মধ্যে ইহাই ছিল অন্যতম। নারী ও শিশুদের এমন কোন গাত্রাবরণ ছিল না যাহা ছেঁড়া চটের মত নহে। এখন তাহাদের গায়ে যাহা আছে, সেই একই জামাকাপড়ে তাহারা সংরক্ষিত এলাকা ছাড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারা এলাকা ছাড়িয়াছিল আগস্টে, আর এখন জানুয়ারি মাস ; তাছাড়া, ওয়াশিংটনেও যেমন, নেব্রাস্কাতেও তেমন, প্রায়ই জামাকাপড় ছিঁড়িয়া থাকে। যে ব্যক্তিটি টেলিগ্রাম পাইয়াছিল সে হয় নির্বোধ, নয় স্থিরমস্তিষ্ক শয়তান। ১৮৭৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর টেলিগ্রাম মারফত কমিশনারকে জানানো হয় যে, স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে ইণ্ডিয়ানদের যেন অবশ্য জামাকাপড় দেওয়া হয়। ১১ই জানুয়ারির পূর্বে তিনি সেই টেলিগ্রামের উত্তর দেন নাই—সেই দিনটিই জেল-ভাঙার দিন।

"শী-এন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়েই ইণ্ডিয়ান দপ্তর বাদবাকি ব্যাপারের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতেছে। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলঙ্ক। মি. হেইট যাহাই বলুন, আমরা শুনিতে প্রস্তুত। সু-দের সহিত কার্যকলাপে 'কূটনীতিজ্ঞ' হিসাবে তিনি এত বেশি অপদার্থতা প্রকাশ করিয়াছেন যে আমরা সবিনয়ে তাঁহাকে অভিমত জানাইতেছি,

কোন দপ্তরের প্রধান না হইয়া সাধারণ নাগরিক হিসাবে তিনি আরও বেশি সাফল্য লাভ করিতেও পারিতেন।

"শী-এন ব্যাপারের তদন্ত অবশ্যকর্তব্য। আমাদের মতে, এ ব্যাপারে জেনারেল ক্রুক কি জানেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য তাঁহাকে ওয়াশিংটনে যাইতে নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে ক্রুকের হাত কতখানি, তাহা যতই বেশি, যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হইবে, ততই তিনি মার্কিন জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইবেন। অপদার্থতার এই কলঙ্কময় ব্যাপারের জন্য কোন একজনকে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। যদি ক্রুককে লইয়াই শুরু হয়, তাহা হইলে নিচের তলাকার সত্য ঘটনাগুলি অন্য কোন পন্থা অপেক্ষা তাড়াতাড়ি বাহির করা যাইবে। আমরা এ ব্যাপারে সমস্ত কিছু জানিতে চাই—গত শরৎকালে যে গোলযোগ আমাদের কানে আসিয়াছে এবং যাহা এখনো আমাদের দেশবাসীকে আতঙ্কিত করিতেছে। আরও জানিতে চাই সেই 'লাল-মেঘ' এবং 'দাগানো-লেজ' স্যু-দের সহিত গোলযোগ সম্পর্কেও। সাংবাদিকতার সততা সহকারে আমরা বলিতে চাই, পূর্বে উল্লিখিত 'নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ডে'র টেলিগ্রামের শেষ অনুচ্ছেদের প্রত্যেকটি কথা মিথ্যা। জেনারেল ক্রুককে ওয়াশিংটনে পাঠানো হউক, এই ব্যাপার সম্পর্কিত সমস্ত নথিপত্র, টেলিগ্রাম এবং তাঁহার দপ্তরের অনুমোদন দেখাইতে বাধ্য করা হউক। তিনি যদি দোষী হন, তাহা হইলে তাঁহাকেই শাস্তি দেওয়া হউক, যদি না হন—আমরা জোর দিয়াই বলিতেছি যে তিনি দোষী নন—তাহা হইলে যিনি দুষ্কৃতিকারী তাঁহাকেই শাস্তি দেওয়া হউক।"

এই সম্পাদকীয়ের সঙ্গে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ডে'র প্রতিনিধি ও জেনারেল শেরম্যানের সাক্ষাৎকারের পার্থক্যটা বেশ মজার। আর এটাও মজার ব্যাপার, যার জন্য হেইটকে দোষ দেওয়া হয়েছিল, তা অনেকখানিই ছিল কার্ল শূর্জের হাতে।

এই তীব্র ক্ষোভ সত্ত্বেও সম্পাদকটি কিন্তু কেলেঙ্কারি-বিষয়ক ঐ বিতর্ককে জিইয়ে রাখতে পারেননি। কয়েক মাসের মধ্যেই সবাই ভুলে গিয়েছিল ব্যাপারটা। আর আজ যখন গোটা দুনিয়া স্বাধীনতার পথে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেছে সবে, তখনই মানুষ ওই ঘটনার সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছে জীবনে।